মুসলিম জাগরণে স্যার সৈয়দ আহমদ খান ও তাঁর সহকর্মীদের অবদান

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম,ফিল ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপিত

GIFT

গবেষক,
লিপি কোম
এম,ফিল গবেষক
উর্দু বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা-১০০০।

Dhaka University Library
425552
425552
ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

তত্ত্বাবধায়ক,
অধ্যাপক ড. কানিজ-ই-বাতুল
উর্দু বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

Dhaka University Institutional Repository

প্রত্যয়ন পত্র

লিপি বেগম কর্তৃক দাখিলকৃত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উর্দু ও ফার্সী বিভাগের গবেষক "মুসলিম জাগরণে স্যার সৈয়দ আহমদ খান ও তাঁর সহকর্মীদের অবদান" শীর্ষক গবেষণা অভিসন্দর্ভটি সম্পর্কে আমি প্রত্যয়ন করছি যে, এটি একটি মৌলিক গবেষণা কর্ম। আমার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধায়নে লিখিত হয়েছে। আমার জানা মতে ইতোপূর্বে কোথাও এবং কোন ভাষাতেই এ শিরোনামে এম,ফিল ডিগ্রী লাভের উদ্দেশ্যে কোন গবেষণা কর্ম সম্পাদিত হয়নি। আমি এ গবেষণা সন্দর্ভটি চূড়ান্ত কপি আদ্যন্ত পাঠ করেছি এবং এম, ফিল ডিগ্রী লাভের উদ্দেশ্যে দাখিল করার জন্য অনুমোদন করছি।

415552

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

4-11-07

অধ্যাপক ড. কানিজ-ই-বাতুল
তত্ত্বাবধায়ক
উর্দু বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা-১০০০।

Dhaka University Institutional Repository

ঘোষনা পত্র

আমি নিম্ন স্বাক্ষরকারী এই মর্মে ঘোষনা প্রদান করছি যে, "মুসলিম জাগরনে স্যার সৈয়দ আহমদ খান ও তাঁর সহকর্মীদের অবদান" শীর্ষক আমার এম, ফিল অভিসন্দর্ভের বিষয়বস্তু পূর্ন অথবা আংশিকভাবে কোথাও প্রকাশ করিনি। এটি আমার মৌলিক ও একক গবেষণা কর্ম।

Lipi Begum
4.11.07

লিপি বেগম
গবেষক
উর্দ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা-১০০০।

- 455552

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

"মুসলিম জাগরণে স্যার সৈয়দ আহমদ খান ও তাঁর সহকর্মীদের অবদান" শীর্ষক গবেষণা অভিসন্দর্ভটি রচনার জন্য আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উর্দু ও ফার্সী বিভাগ কর্তৃক ২০০১-২০০২ শিক্ষা বর্ষে রেজিষ্ট্রেশন প্রাপ্ত হই। আমি যথা সময়ে এম, ফিল প্রথম পর্ব পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হই। এই গবেষণা কর্মের তত্ত্বাবধায়ক হিসাবে আমার পরম শ্রদ্ধেয়া শিক্ষিকা অধ্যাপিকা ড. কানিজ-ই-বাতুল বিভাগীয় শত ব্যস্ততা থাকার পরও যে পর্যাপ্ত সময় আমার গবেষণা পত্র তৈরীর কাজ দেখা ও সময়োচিত উপদেশ প্রদানের জন্য ব্যয় করেছেন, সে জন্য তাঁর কাছে আন্তরিক কৃতজ্ঞ ও শ্রদ্ধা জানাই। গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করি বিভাগীয় শ্রদ্ধেয় শিক্ষিকা অধ্যাপক ড. উম্মে সালমা, ড. মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ, ড. জাফর আহমেদ ভুইঁয়া, আরো অনেকের প্রতি। তাঁরা আমাকে গবেষণার কাজে পরামর্শ ও উৎসাহ প্রদান করেন। এছাড়া বিভিন্ন বই পত্র সংগ্রহ করার ব্যাপারে যারা সার্বিক ভাবে সহযোগিতা করেছেন, তারা হলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছু কর্মকর্তা গবেষণার কাজে আমাকে সার্বিক সহযোগিতা করেছেন। তাদের কাছে কৃতজ্ঞাতার অন্ত নেই।

আরো অনেকের কাছে ঋণ রয়ে গেল। এছাড়া অভিসন্দর্ভটি অত্যন্ত যত্ন এবং ধর্য্য সহকারে কম্পিউটার কম্পোজ করার জন্য ইসলাম অনুবাদ কেন্দ্রকে ও আমার অশেষ ধন্যবাদ।

লিপি বেগম
শিক্ষাবর্ষঃ ২০০১-২০০২
রেজিষ্ট্রেশন নং- ৫৯
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

Dhaka University Institutional Repository

ঃ সূচী পত্র ঃ

	পৃষ্ঠা
# ভূমিকা	১ - ০৪
# প্রথম অধ্যায়	
* স্যার সৈয়দ আহমদ খান ও তৎকালীন ভারতীয় উপমহাদেশ।	১ - ১১
# দ্বিতীয় অধ্যায়	
* স্যার সৈয়দ আহমেদ খানের জীবন (জন্ম ও বংশ পরিচয়)।	১২ - ২৫
# তৃতীয় অধ্যায়	
* স্যার সৈয়দের সমাজ সম্পর্কে চিন্তাধারা।	২৬ - ৯৮
# চতুর্থ অধ্যায়	
* স্যার সৈয়দ আহমদ খানের রাজনৈতিক বিষয়ে চিন্তাধারা।	৯৯ - ১২৮
# পঞ্চম অধ্যায়	
* স্যার সৈয়দ আহমদ খানের সহকর্মীদের অবদান।	১২৯ - ১৫৯
# উপসংহার	১৬০ - ১৬২
# গ্রন্থপুঞ্জী	১৬৩-১৭২

Dhaka University Institutional Repository

ভূমিকা

মুসলিম জাগরণে যে সব ক্ষণজন্মা ব্যক্তিবর্গ সক্রিয় আন্তরিক ও কার্যকর ভূমিকা পালন করেন, তাঁদের মধ্যে স্যার সৈয়দ আহমদ খাঁনের নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। এ ছাড়া তাঁর একনিষ্ঠ সহকর্মীদের অবদান ও কম নয়। কেননা মুসলিম জাগরণের উন্মেষ পূর্বে তাঁদের কর্মকান্ডের গুরুত্ব ছিল অপরিসীম। সে সময় মুসলমানদের ধর্মীয়, রাজনৈতিক, শিক্ষা ও সামাজিক দিক ছিল এক অধঃপতনের যুগ। বৃটিশ উপনিবেশ, দেশের পরাধীনতা সর্বোপরি জাতীয় জীবনের গ্লানি নানাভাবে মুসলমানদের পরিবদ্ধ করে।

জাতির এই সংকটময় মুহূর্তে মুসলিম জাতির ভাগ্যাকাশে উদিত হয় স্যার সৈয়দ আহমদ খান ও তাঁর সহকর্মী নওয়াব মুহসিনুল মুলক, মাওলানা আলতাফ হোসাইন হালী, মৌলবী নযীর আহমদ, আল্লামা শিবলী নোমানী। এমনকি বাংলায় আবদুল লতিফ (১৮২৮-১৮৯৩), স্যার সলিমুল্লাহ, সৈয়দ আমীর আলী (১৮৪৯-১৯২৮) এর ন্যায় দূরদর্শী রাজনীতিকদের যদি উদয় না হতো, তবে আজ হয়তো উপমহাদেশের ইতিহাস অন্যরুপেই ধারণ করতো। কারণ এরা সবাই ছিল একই ভাবের ভাবুক।

আসলে মুসলিম জাতির আলোড়িত মনের অবিব্যক্তি ঘটে মুষ্টিমেয় ব্যক্তির চিন্তাধারা ও কর্মতৎপরতার মধ্য দিয়ে উনিশ শতকের দ্বিতীর্য়াধে। এরা আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞান তথা-পাশ্চাত্য শিক্ষা-লাভ এবং পরিবর্তিত সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতির সাথে মুসলিম জাতির মন-মেজাজকে খাপ খাইয়ে নেয়ার মাধ্যমে তাদের ভাগ্যোন্নয়নের জন্য মরিয়া হয়ে চেষ্টা করেন স্যার সৈয়দ আহমদ খান ও তাঁর একনিষ্ঠ সহকর্মীগণ।

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়ে স্যার সৈয়দ ও তৎকালীন ভারতীয় উপমহাদেশের অবস্থা, ভারতবর্ষের নামকরণ, ভারতের মুসলমানের সম্পর্ক, ভারতে মুসলমানদের আগমন, ভারতে মুসলিম অভ্যুদয়, ভারতে ইংরেজের আগমন, বিদ্রোহ, সিপাহী বিদ্রোহ, বিদ্রোহের পর মুসলমানদের অবস্থা ইত্যাদি বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা উপস্থাপন করা হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে স্যার সৈয়দের জীবন কথা শিরোনামে, তাঁর জন্ম, তারিখ, জন্মস্থান, বংশ পরম্পরা, শিক্ষা জীবন, কর্মজীবন, শেষ জীবন, ইন্তেকাল ও সমকালীন প্রতিক্রিয়া ইত্যাদি বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা উপস্থাপন করা হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়ে মুসলিম জাগরনে স্যার সৈয়দ আহমেদ খানের ভারতীয় মুসলমানদের সামাজিক ক্ষেত্রের বিভিন্ন দিক নিয়ে তাঁর চিন্তাধারার বিস্তারিত আলোচনা তুলে ধরা হয়েছে। সমাজ জীবনের প্রয়োজনীয়তা, সমাজে হিন্দু-মুসলিম সম্পর্ক স্থাপন, মুসলিম জাতীয় ঐক্য সৃষ্টি, সমাজে মুসলিম ও অমুসলিমের সম্পর্ক, পাশ্চাত্য সভ্যতা গ্রহন, পীরবাদ, কুপ্রথা, শিক্ষা সম্পর্কিত সমাজের নানা বিষয়ের সংস্কার ইত্যাদি। বর্তমানে যিনি উর্দু সাহিত্য চর্চার ক্ষেত্রে বিশেষ মর্যাদার অধিকারী তিনি হলেন আমার পরম শ্রদ্ধেয় শিক্ষক ড. মোহাম্মদ আবদুল্লাহ। তাঁর রচিত "স্যার সৈয়দ আহমদ খাঁর ধর্মীয় ও সামাজিক চিন্তাধারা" বইটি আমার এই অভিসন্দর্ভটি রচনার ক্ষেত্রে বিশেষ ভাবে সাহায্য যুগিয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায়ে মুসলিম জাগরণে স্যার সৈয়দের মুসলমানদের রাজনৈতিক দিক নিয়ে তাঁর চিন্তাধারা তুলে ধরা হয়েছে। এখানে তাঁর রাজনৈতিক কর্মতৎপরতা, কার্যবলীর ধারা, রাজনৈতিক স্বতন্ত্র্য, গনতন্ত্র, আযাদীর ধ্যান ধারণা পোষন, জাতীয়তাবাদ এবং তাঁর সমসাময়িক ব্যক্তি আবদুল লতিফ ও সৈয়দ আমীর আলী সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা উপস্থাপন করা হয়েছে।

পঞ্চম অধ্যায় মুসলিম জাগরণে স্যার সৈয়দের একনিষ্ঠ সহকর্মী হিসাবে মাওলানা আলতাফ হোসাইন হালীর অবদান, নওয়াব মুহসিনুল মুলকের অবদান, মাওলানা শিবলী নোমানীর কর্মতৎপরতা ও নযীর আহমদের কর্মকান্ডের সংক্ষিপ্তভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে।

মোটকথা ভারতীয় উপমহাদেশে মুঘল শাসনের পতন যুগে মুসলমানদের পতন যুগে যে স্থবিরতা, অধঃপতন ও লক্ষ্যহীনতা দেখা দেয়। এ সময় মুসলমানদের পূনজাগরণে যে কয়জন মুসলিম মনীষী অসামান্য অবদান রাখেন, তাঁদের মধ্যে স্যার সৈয়দ আহমেদ খান ও তাঁর সহকর্মীগন অন্যতম। তাঁদের এ অবদানের স্রোত ধারা কালের গন্ডি পেরিয়ে আজও পূর্ববৎ গতিময় বহমান। তাঁদের উপস্থাপিত চিন্তাধারা ও সংস্কার কার্যক্রমের বাস্তব রুপায়নে মুসলিম জাতি কুসংস্কার এবং অপবিশ্বাসের আবিলতা মুক্ত হয়ে সমাজ, রাষ্ট্র, শিক্ষা ও আর্ন্তজাতিক জীবনে সাফল্যের শীর্ষে আরোহন করতে পারে। এই অভিসন্দর্ভটি রচনায় তথ্য উপাত্তে সংগ্রহ করতে গিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক আমি কোন প্রকার আর্থিক সহযোগীতা পাইনি। লাইব্রেরী বলতে আমার অবলম্বন ছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরী, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, বাংলা একাডেমী, এশিয়াটিক সোসাইটি, আলিয়া মাদ্‌রাসা লাইব্রেরী থেকেও আমি কতকটা উপকৃত হয়েছি।

Dhaka University Institutional Repository

বিভিন্ন লাইব্রেরীতে উর্দুর যে সব মুল গ্রন্থের সন্ধান পেয়েছি সে গুলি আদ্যোপান্ত পাঠ করে বা জরুরী অংশের মর্ম অনুধাবন করে লেখক ও তাঁদের লেখা সম্পর্কে মোটামুটি একটা ধারনা গ্রহন করার পর অভিসন্দর্ভটি রচনায় সক্ষম হয়েছি। অভিসন্দর্ভটি রচনার কাজে যে সকল প্রতিষ্ঠান ও সুধীজন আমাকে বিভিন্ন ভাবে সাহায্য সহযোগীতা করেছেন তাদের প্রতি অমার আন্তরিক কৃজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

পরিশেষে আমার এই অভিসন্দর্ভ রচনার কাজে যিনি অসাধারন অবদান রেখেছেন এবং যার অকৃত্রিম ও আন্তরিকতা পথ নির্দেশনা ও সহযোগীতা না পেলে এই গবেষনা কর্ম সুচারু রুপে সম্পূর্ণ হতে পারতনা; তিনি হলেন আমার পরম শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক ড. কানিজ-ই-বাতুল।

লিপি বেগম
এম, ফিল গবেষক

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

স্যার সৈয়দ আহমদ খান ও তৎকালীন ভারতীয় উপমহাদেশ ঃ

ভারত হলো এশিয়া মহাদেশের মধ্যে একটি সর্ববৃহৎ অঞ্চল। তাই এখানকার প্রকৃতি, পরিবেশ, জাতি, ধর্ম ও ভাষা সকল দিক থেকেই বৈচিত্রময়। আর একারণে ঐতিহাসিকরা এদেশটিকে বিশ্বের প্রতিবিম্ব (Epitome of the world) বলে আখ্যায়িত করেছেন।[১]

পূর্বের যুগের ঐতিহাসিকগন এ বিশাল ভারতবর্ষের ইতিহাসকে ধর্ম ও জাতির ভিত্তিতে ভাগ করেছেন। কিন্তু আধুনিক কালের ঐতিহাসিকগন ভারতবর্ষকে হিন্দু যুগ, মুসলিম যুগ ও বৃটিশযুগে ভাগ করে থাকেন।[২]

ভারত বর্ষের নামকরণ ও এর গুরুত্ব ঃ

সাধারণত ভারত বর্ষের নাম করণ করা হয়েছে ভরত শব্দের থেকে। বর্ষ অর্থ দেশ অর্থাৎ ভারত বর্ষের অর্থ হলো ভরত রাজার দেশ।[৩] তবে মুসলিম ঐতিহাসিকগন ভারতকে "হিন্দুস্থান" নামে অভিহিত করেন বলেও জানা যায়। তাঁদের মতে হিন্দু শব্দটি সিন্ধু শব্দের বিকৃত উচ্চারণ।[৪] অবশ্য কোন কোন ঐতিহাসিক উল্লেখ্য করেন যে, তারা সমগ্র ভারতকে "ইন্ডাস" বা ইন্ডিয়া নামে আখ্যায়িত করতেন।[৫] বলাবাহুল্য বর্তমান ভারতের সংবিধানের প্রথম বাক্যটি হল India that is Bharat, will be Union of sates, যার নাম ইন্ডিয়া, তার নাম ভারত। যেমন ঃ যার নাম ইরান, তার নাম পারস্য। আবার, যার নাম আবিসিনিয়া তার নাম ইথিওপিয়া।[৬] সুতরাং বর্তমানে ভারতবর্ষ বলতে পাকিস্তান, বাংলাদেশ ও ভারত মিলে হিমালয়ের দক্ষিণে অবস্থিত সমুদ্র বেষ্টিত ভুখন্ডকে বুঝায়।[৭]

ভারতের সাথে মুসলমানদের সম্পর্ক ঃ

আধুনিক ইসলামি গবেষকদের মতে, ভারতবর্ষের আদি বাসিন্দা ছিলেন হযরত আদম (আঃ) ও হযরত নূহ (আঃ) এর অধঃস্তন বংশধর। এই প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআন শরীফ সহ সকল আসমানী কিতাব সমূহে হযরত আদম (আঃ) কে মানবকুলের পিতা বলে উল্লেখ করা হয়েছে। কারন তিনি ছিলেন প্রথম মানুষ ও প্রথম নবী। ঐতিহাসিকদের মতে, হযরত আদম (আঃ) সর্ব প্রথম ভারত উপমহাদেশে অবতরন করেন এবং পরে তিনি আরব উপদ্বীপে গিয়ে বসতি স্থাপন করেন।[৮]

Dhaka University Institutional Repository

এছাড়াও হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর যুগেও ভারত মুসলমানদের নিকট পরিচিত ছিল। ৬২৮ খ্রিষ্টাব্দে যখন হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) বর্হিবিশ্বে ইসলাম প্রচারের কাজে ব্যস্ত ছিলেন, সে সময় হিন্দু তথা ভারত সম্পর্কে আলোচনা হতো।[৯]

এরপর দেখা যায় যে, ভারতীয় উপমহাদেশের সাথে আরবদের যোগাযোগ ছিল বহু দিনের। প্রধানত ব্যবসায়ের মাধ্যমে এই যোগাযোগ স্থাপিত হয়।[১০]

ভারত বর্ষে মুসলমানদের আগমন ঃ

উল্লেখ্য এই বিশাল ভারত বর্ষে অসংখ্য জাতির বাস ছিল।[১১] ফলে ভারতবর্ষে মুসলমানদের আগমনের পূর্বে হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন, প্রভৃতি ধর্মালম্বীর জাতি একত্রে বসবাস করত। এতে করে ভারতে সামাজিক মূল্যবোধের কোন পরিবর্তন হয়নি। তাই মুসলমানদের আগমনের সাথে সামাজিক মূল্যবোধের পরিবর্তন ঘটতে থাকে।[১২] গোটা ভারতবাসী যখন ব্রাহ্মন্যবাদীদের বাড়াবাড়িতে অতিষ্টহয়ে উঠেছিল, তখন ভারতের নির্যাতিত মানুষ ইসলামের সুমহান আদর্শকে সাদরে আমন্ত্রন জানান।[১৩] আরব সাম্রাজ্যের শাসন কর্তা হাজ্জাজ বিন ইউসুফ ৬২০ খ্রীষ্টাব্দের শেষের দিকে ভারত বিজয়ের উদ্দেশ্যে ওবায়দুল্লাহ ও বোদাইলের নেতৃত্বে পর পর দুবার অভিযান পরিচালনা করেন। কিন্তু তারা সিন্দু রাজা দাহিরের নিকট উভয় সেনাপতি পরাজিত ও নিহত হন।[১৪]

অবশেষে হাজ্জাজ বিন ইউসুফ স্বীয় ভ্রাতুস্পুত্র মুহাম্মদ বিন কাশেমকে সিন্ধু অভিযানে প্রেরন করেন।[১৫] অতঃপর ১৭ বছরের এই তরুন সেনাপতি সিন্ধুর হিন্দু রাজা দাহিরকে পরাজিত করে দাইবল অধিকার করেন।[১৬] মুহাম্মদ বিন কাশেমের এই সিন্ধু বিজয়কে ঐতিহাসিকগণ ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ রোমাঞ্চ কর বিজয় বলে মন্তব্য করেন।[১৭]

ভারতে মুসলিম শক্তির অভ্যুদয় ঃ

সিন্ধু ও মুলতান বিজয়ের পর ভারতে মুসলমানদের দ্বিতীয় পর্যায়ে অভিযান শুরু হয় এবং সারা ভারতে মুসলমানদের আধিপত্য ও ইসলাম বিস্তারের শুভ সূচনা হয়।[১৮] আর এই অভিযানের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন গজনীর বীরযুদ্ধাগণ। যারা ইতিহাসে "গজনী বংশ" নামে পরিচিত।[১৯]

Dhaka University Institutional Repository

অতঃপর সর্বপ্রথম ভারতবর্ষে স্থায়ী মুসলিম সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন ঘুর রাজ্যের শাসন কর্তা মইজুদ্দিন মুহাম্মদ ইবন সাম। যিনি ভারতের ইতিহাসে "শিহাবউদ্দিন মুহাম্মদ ঘুরী" নামে পরিচিত।[২০] এরপর খিলজী বংশ, তুঘলক বংশ, "সৈয়দ বংশ" ও লোদী বংশ ভারতের শাষন ক্ষমতায় অধিষ্টিত হন। [২১] লোদী বংশের শেষ শাষক ইব্রাহীম লোদীর (১৫২৬খ্রীঃ) পতনের পর মোঘল সাম্রাজ্যের ভিত্তি স্থাপিত হয়। [২২]

মোঘল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠাতা জহীর উদ্দীন মুহাম্মদ বাবর হতে শুরু করে এ বংশের শাষকগণ ১৫০ বছর ধরে ভারত বর্ষের শাষন ক্ষমতায় অধিষ্টিত ছিলেন।[২৩] ভারতের শেষ মোগল সম্রাট বাহাদুর শাহ জাফর (১৮৩৭-১৮৫৭খ্রীঃ) সিপাহী বিদ্রোহে সম্পৃক্ত থাকার অপরাধে ইংরেজগন ১৮৬২ খ্রীঃ তাকে বার্মায় নির্বাসিত করে মোগল সাম্রাজ্যের অবসান ঘটান। এরপর থেকে সমগ্র ভারত বর্ষে ইংরেজদের শাষন প্রতিষ্ঠিত হয়।[২৪]

ভারত বর্ষে ইংরেজদের আগমন ঃ

ভারত বর্ষে মোঘল শাষনআমলে ইংরেজদের আগমন ঘটে।[২৫]বর্নিত আছে যে, ইংরেজদের মধ্যে সর্ব প্রথম ১৪৯৮ খ্রীষ্টাব্দে পর্তুগীজ নাবিক ভাস্কো-দা-গামা ভারতবর্ষে আসেন।[২৬] অতঃ র ইংরেজদের ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী নামক একটি বানিজ্যিক দল প্রথম রানী এলিজাবেথের অনুমতি নিয়ে ১৬০০ খ্রীষ্টাব্দে ভারতবর্ষের সাথে ব্যবসা বানিজ্য করতে থাকেন।[২৭] তৎকালীন মোঘল সম্রাট জাহাঙ্গীরের আমলে (১৬০৫-২৭খ্রীঃ) ১৬১৩ খ্রীঃ উক্ত কম্পানীকে সুরাটে বাণিজ্যিক কুঠি স্থাপনের অনুমতি প্রদান করলে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী সমস্ত ভারতে একচাটিয়া ব্যবসা করার সুযোগ পান।[২৮]

দিন দিন কোম্পনীর সময় শক্তির বৃদ্ধিতে তৎকালীন বাংলার নবাব সিরাজুদ্দৌলা শংকিত হয়ে পরেন এবং বাধ্য হয়ে ১৭৫৭ খ্রীঃ তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষনা করেন।[২৯] ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দের পলাশী যুদ্ধের পর সমগ্র ভারতবর্ষে ইংরেজদের আধিপত্য দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর হতে থাকে। ফলে বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা সহ সমগ্র ভারতে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর শাষন প্রতিষ্ঠিত হয়।[৩০]

Dhaka University Institutional Repository

বিদ্রোহ ঃ

বিদ্রোহের অর্থ হচ্ছে বিরুদ্ধে অভ্যুত্থান ও আরোপিত শাষন অগ্রাহ্য করা।[৩১] অর্থাৎ সরকারের আদেশ অমান্য করা অথবা নির্ভীক চিত্তে সরকারের আরোপিত বিধি নিষেধ অমান্য করাই হচ্ছে বিদ্রোহ।[৩২] কিন্তু তাই বলে বিদ্রোহ কেবল একটি কারনেই সংগঠিত হয় না, এর পিছনে অনেক গুলো কারন কাজ করে।[৩৩] ১৭৫৭ থেকে ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত উপমহাদেশে অনেক বিদ্রোহ সংগঠিত হয়েছিল। যার ফলে ভারতের সকল জাতির জীবন যাত্রা বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিল।[৩৪]

অনেকের মতে মুঘল সাম্রাজের পতনের যুগে মুসলমানদের মধ্যে আত্মশুদ্ধির আন্দোলন শুরু হয়েছিল। তখন থেকে মুসলিম সমাজে সামাজিক ও রাজনৈতিক সচেতনতা সৃষ্টি হয়। এ প্রসঙ্গে দিল্লীর শাহ ওলীউল্লাহর (রাঃ) (১৭০২/৩-১৭৬৩ খ্রীঃ) [৩৫] শান্তিপূর্ন সংস্কার আন্দোলন [৩৬] শাহ আব্দুল আজীজ (রাঃ) [৩৭] তাঁর শীষ্য শহীদ আহমদ বেরলভীর [৩৮] শিখ ও ইংরেজ বিরোধী স্বশস্ত্র সংগ্রাম বিশেষ ভাবে খ্যাত।[৩৯] পরবর্তীতে এই বিদ্রোহ সমগ্র ভারতে ছড়িয়ে পরে। ওহাবী আন্দোলন (১৮৩১ খ্রীঃ) [৪০] ফরায়েজী আন্দোলন [৪১] এবং ফকির সন্ন্যাসী বিদ্রোহ [৪২] ও সিপাহী বিদ্রোহ তার ধারাবাহিকতা মাত্র।

সিপাহী বিদ্রোহ ঃ

ভারতীয় উপমহাদেশের ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে বিদ্রোহের গুরুত্ব অপরিসীম। কেননা এ বিদ্রোহের পর মুসলমানদের হাজার বছরের অর্জিত ক্ষমতার সমাপ্তি ঘটে।[৪৩] প্রকৃত পক্ষে এ বিদ্রোহ ছিল বিদেশীশক্তির আধিপত্যের অবসান ঘটিয়ে মুসলমানদের মুক্তিলাভের এক মহান সংগ্রাম। এই সংগ্রাম পাঞ্জাব ছাড়া সমগ্র ভারতে সংগঠিত হয়েছিল।[৪৪] এই বিদ্রোহ নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে নানা মত রয়েছে। কেউ বলেন "এটা ছিল ধর্মান্ধ সিপাহী বিদ্রোহ" আবার কেউ বলেন, ক্ষয়িষ্ণু সামন্ততন্ত্রের শেষ অভ্যুত্থানের শেষ প্রচেষ্ট।[৪৫] বিদেশীয়দের রচিত ইতিহাসে সিপাহী বিদ্রোহ নামে অবিহিত ভারতবর্ষের স্বাধীনতায় প্রথম স্বশস্ত্র সংগ্রাম মুলতঃ ইংরেজদের স্বৈরাচার, কুশাষন, শোষন, হত্যা, অন্যায় ও অবিচারের বিরুদ্ধে বিক্ষুব্ধ জনমতের বহিঃপ্রকাশ ছাড়া আর কিছুই নায়।[৪৬]

Dhaka University Institutional Repository

এছড়া এ সময় সমগ্র ভারতে নানা ধরনের বিদ্রোহ দেখা দিয়েছিল। যার মধ্যে "চুয়াড় বিদ্রোহ" (১৭৭৯খ্রীঃ) "কোল বিদ্রোহ" (১৮৩১-৩২ খ্রীঃ) "কৃষক বিদ্রোহ, সাওতাল বিদ্রোহ" (১৮৫৪-৫৬) "বেরলীর বিদ্রোহ" (১৮১৬খ্রীঃ) এবং ভারতের "ওহাবী আন্দোলন" (১৮৩১ খ্রীঃ) বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। [৪৭]

অবশেষে লর্ড ক্যানিং* এই বিদ্রোহ দমনে নেতৃত্ব দেন। এতে তিনি সফলও হয়েছিলেন। শেষ মোঘল সম্রাট বাহাদুর শাহ জাফরকে এই বিদ্রোহের জন্য দায়ী করে, তৎকালীন বার্মার রাজধানী রেঙ্গুনে নির্বাসিত করা হয় এবং সেখানে তিনি ১৮৬২ খ্রীঃ ইন্তেকাল করেন। এভাবে ইংরেজ সৈন্যরা বিদ্রোহীদের পরাজিত করে, পুনরায় তাঁদের শক্তি বৃদ্ধিতে মনোনিবেশ করেন এবং বিদ্রোহের প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য তাঁরা মুসলিম নিধনে প্রবৃত্ত হন।

বিদ্রোহোত্তর মুসলমানদের অবস্থা ঃ

ইংরেজদের ধারনা ছিল যে, যদিও এই বিদ্রোহে ভারতের সব সম্প্রদায় অংশ গ্রহন করলেও মুসলমানেরা প্রধানত এর জন্য দায়ী। এ জন্য তাঁরা মুসলমানদের সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক সাংস্কৃতিক তথা সকল ক্ষেত্রে পঙ্গু করে দেওয়ার কৌশল অবলম্বন করে। ইতিহাস থেকে জানা যায় মুসলমানদের প্রতি বৃটিশদের এই প্রতিশোধমূলক নির্যাতন ৫০ বৎসর যাবৎ অব্যাহত ছিল।[৪৮] ফলে ভারতীয় মুসলমানগন ইংরেজদের চিরশত্রুতে পরিণত হয়। যার ফলশ্রুতিতে মুসলমানদের উপর অবর্ণনীয় নির্যাতন ও অত্যাচার চলতে থাকে।[৪৯]

তৎকালীন দিল্লীর অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে বিশিষ্ট গবেষক ও ঐতিহাসিক ড. এনামুল হক বলেন,

"দিল্লী অধিকৃত হওয়ার পর ইংরেজরা দিল্লীতে গনহত্যা, গৃহদাহ ও লুটতরাজ চালায়। যার ফলে দিল্লীর পুরাতন ঐতিহ্য ধুলিসাৎ হয়ে যায়" সে সময় অনেক মুসলমানদের পরিত্যক্ত সম্পত্তি পানির দামে নিলামে বিক্রি করে দেওয়া হয়েছিল। এর সব ক্রেতা ছিল হিন্দু।[৫০]

Dhaka University Institutional Repository

পলাশী যুদ্ধে বিজয়ী হওয়ার পর বৃটিশরা চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত আইন (১৭৯৩ খ্রীঃ) প্রণয়ন করে মুসলমানদের অর্থনৈতিক মেরুদন্ড ভেঙ্গে দেয়। এমনকি লাখেরাজের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে মুসলমানদের শিক্ষার প্রধান উৎস গুলো ধ্বংস করে দেওয়া হয়। উপরন্তু মুসলমানদের কে বিচার বিভাগ ও শাষন বিভাগ থেকে পদচ্যুত করে অন্য সম্প্রদায়ের লোক নিয়োগ করা হতো।[৫১]

অন্যদিকে মুসলমানগণ ইংরেজী শিক্ষাকে ধর্মীয় কুসংস্কার মনে করে ইংরেজী শিক্ষা থেকে বিমুখ হয়ে পড়ে। আর হিন্দু সম্প্রদায় ইংরেজী শিক্ষা অর্জন করে প্রভুত উন্নতি সাধন করতে থাকে। এই প্রসঙ্গে মুহাম্মদ আজিজুল হকের নিম্নের অঙ্কিত চিত্র থেকে এর প্রমান পাওয়া যায়।

	হিন্দু	মুসলমান	অন্যান্য	মোট
স্কুল	১,৪৯,৭৯৭	২৮,০৯৬	১৫,৪৮৯	১,৯৩,৩০২
কলেজ	১,১৯৯	৫২	৩৬	১২৮৭
মোট	১,৫০,৯১৬	২৮,৯৪৮	১৫,৫২৫	১,৯৪,৫৮৯

[৫২]

এ সময় বাস্তব শিক্ষার অভাবে ইসলামের মূল আদর্শ থেকে বিছিন্ন হয়ে মুসলমানগণ নানাবিধ কুসংস্কারে লিপ্ত হয়ে শিরক ও বেদআতে জড়িয়ে পরে। এমনকি রাজনীতিতেও মুসলমানগণ নিস্ক্রিয় হয়ে পড়ে। মোট কথা, শিক্ষা, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক দুরাবস্থা ইত্যাদি নানাবিধ কারনে মুসলমানদের চরম অবনতি নেমে আসে।[৫৩]

মুসলমানদের এই দুর্যোগপূর্ন মুর্হুতে স্যার সৈয়দ আহমদ খানের মত মহান মনীষীর আর্বিভাব অন্ধকারে আলোর বর্তিকা স্বরুপ। তিনি ইংরেজদের সাথে মুসলমানদের সম্পর্ক স্থাপন ও মুসলিম সমাজে আধুনিক শিক্ষা বিস্তারের মাধ্যমে ভারতীয় মুসলমানদেরকে রক্ষা করতে বিশেষ ভুমিকা পালন করেন।[৫৪] মোট কথা, সিপাহী বিদ্রোহ ও ওহাবী বিপ্লবের পরে স্যার সৈয়দ অহমদ খানই সর্বপ্রথম ইংরেজদের প্রতি আপোষমূলক মনোভাব পোষন করে মুসলমানদেরকে ইংরেজী শিক্ষায় অনুপ্রাণিত করেন।[৫৫]

Dhaka University Institutional Repository

উপরোক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায় যে, জীবনের অপর নাম সংগ্রাম। তাই মানুষ এবং মানুষের জীবনাদর্শের ইতিহাসে সংগ্রাম বা যুদ্ধ বিদ্রোহ একটি অতিস্বাভাবিক ঘটনা। প্রথম মহা যুদ্ধ আমাদের কাঁধ ধরে ঝাঁকিয়েছে, আমাদের কাঁটা ঘায়ে নুনের ছিটা দিয়েছে, তথাপি আমরা আমাদের আলোস্যের ঘুম ছেড়ে আড়মোড়া ভেঙ্গে জেগে উঠেনি। উল্টো অন্যের যাদু মন্ত্রের শিকার হয়ে হুশ-জ্ঞান সংহতি ও ঐক্যের যে ছিটে ফোটা অবশিষ্ট ছিল সে পুঁজিটুকু আমরা হারিয়ে বসেছি। ঠিক এমনি এক সংকটময় মুহূর্তে স্যার সৈয়দ আহমদ খাঁন মুসলিম জাতিকে এক নতুন দিকদর্শন প্রদান করেন।

Dhaka University Institutional Repository

টীকা ও তথ্য নির্দেশ

১। অতুল চন্দ্র রায় ও প্রণব কুমার চট্টোপাধ্যায়, ভারতের ইতিহাস, প্রাচীন যুগ: কলকাতা: মৌলিক লাইব্রেরী, ১৮/বি, শ্যামাচরন দে ষ্ট্রীট, ১৯৯৯, পৃ. ১৪, এ, কে,এম, শাহ নেওয়াজ, ভারত উপমাহাদেশের উতিহাস, প্রাচীন যুগ, ঢাকা: প্রতীক প্রকাশনা সংস্থা ১৯৯৯, পৃ. ২।

২। ড. নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ইতিহসা, ১ম খন্ড, কলকাতা: বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট: ১৯৭৪, পৃ. ২০৩।

৩। T.P. Sinha, Systematic History of India, Patna : Qaumi press, 1949, P. 2.

৪। সুরজিত দাস গুপ্ত : ভারত ও ইসলাম, কলিকাতা : সন্ধর প্রকাশনা, ১৩৮৩, পৃ.৩।

৫। সুরজিত দাস গুপ্ত : পূর্বোক্ত, পৃ. ৩।

৬। সুরজিত দাস গুপ্ত : পূর্বোক্ত, পৃ. ১।

৭। পূর্বোক্ত।

৮। ড. মুশতাক আহমদ, শায়খুল ইসলাম, সৈয়দ হোসাইন আহমদ মাদানী, বাংলাদেশ : ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ১ম সংস্করন, ২০০১, পৃ. ২৫।

৯। ড. মুশতাক আহমদ, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৯-২০।

১০। ড. আব্দুল করীম, ভারতীয় উপমহাদেশে মুসলিম শাসন, ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ১৯৬৯, পৃ. ১।

১১। ড. সৈয়দ মাহমুদুল হাসান, ইসলামের ইতিহাস, ঢাকা : গ্লোব লাইব্রেরী, ১৯৮৫, পৃ.৩

১২। ড. নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, পূর্বোক্ত, পৃ.২০৪

১৩। এ, কে, এম, আব্দুল আলীম, ভারতে মুসলিম রাজত্বের ইতিহাস, ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৬৯, পৃ:১১

১৪। হাসান আলী চৌধুরী, ভারতীয় উপমহাদেশের ইতিহাস, ১ম খন্ড, ঢাকা: আইডিয়াল লাইব্রেরী, ১ম সংস্করন, ১৯৯৩, পৃ.১১

১৫। সৈয়দ হাশেমী ফরিদাবাদী, তারিখ-এ-মুসলমাননে পাকিস্তান ওয়া ভারত, ১ম খন্ড, করাচী: আঞ্জুমান-এ-তারাক্কি, উর্দু পাবিস্তান, ১৯৫২, পৃ: ৭৭

১৬। দাইবল এর প্রকৃত নাম হচ্ছে দেওল মন্দির। এই মন্দিরটি দাইবল শহরের পাহাড়ে অবস্থিত ছিল। দ্রঃ সৈয়দ হাশেমী ফরিদাবাদী, পূর্বোক্ত, ১ম খন্ড, পৃ.৮০

Dhaka University Institutional Repository

১৭। অতুল চন্দ্রনায় ও প্রণব কুমার চট্টোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃ.১৩

১৮। এ, কে, এম আব্দুল আলীম, পূর্বোক্ত, পৃঃ ২০

১৯। ডঃ সৈয়দ মাহমুদুল হাসান, ইসলামের ইতিহাস, পৃঃ ৩৮

২০। ডঃ সৈয়দ মাহমুদুল হাসান, ইসলামের ইতিহাস, পৃঃ ৭০

২১। ডঃ সৈয়দ মাহমুদুল হাসান, ইসলামের ইতিহাস, পৃঃ ৩৮

২২। শেখ সৈয়দ লুৎফর রহমান, ইসলাম, রাষ্ট্র ও সমাজ, ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৭৭, পৃ. ১৫৯।

২৩। H. H Dodwell, The Cambridge History of India, Vol. IV, New Delhi: Chand and Co., 1963, P.P. 21-28

২৪। ডঃ সৈয়দ মাহমুদুল হাসান, ইসলামের ইতিহাস, পৃ. ১১৪-১১৫

২৫। The new Encyclopeadia Britanica, Vol 9, P. 393

২৬। ড. সৈয়দ মাহমুদুল হাসান, ভারতবর্ষের ইতিহাস, ২য় খন্ড, ১৯৯৪, পৃ. ৪৪৮

২৭। কে আলী, ভারতীয় উপমহাদেশের ইতিহাস, পৃ.৭

২৮। ড. সৈয়দ মাহমুদুল হাসান, ভারতবর্ষের ইতিহাস, ২য় খন্ড, পৃ. ৪৫৪, হাসান আলী চৌধুরী, ৩য় খন্ড, পৃ. ৪৫৯

২৯। হাসান আলী চৌধুরী, ৩য় খন্ড, পৃ. ৫০২

৩০। মাহমুদুল হাসান, ভারতবর্ষের ইতিহাস, ২য় খন্ড, পৃ. ৪৯৩, হাসান আলী চৌধুরী, পূর্বোক্ত, ৪৯৫

৩১। শৈলেন্দ্র বিশ্বাস, সংসদ বাঙ্গালা অভিধান, কলিকাতাঃ সাহিত্য সংসদ ৩২-এ আচার্য্য প্রফুল্ল চন্দ্র রোড, অষ্টম মুদ্রন, ১৯৯০, পৃঃ ৫০৩

৩২। স্যার সৈয়দ আহমদ খান, আসবাব এ বাগাওয়াত এ হিন্দু, দিল্লীঃ তাবাকায়ে উর্দু, উর্দু বাজার, ১৯৯৫, পৃ. ৭১

৩৩। পূর্বোক্ত, পৃ. ৭২

৩৪। অধ্যাপক আব্দুল গফুর (সম্পা), আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রাম, বাংলাদেশঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ১৯৮৭, পৃ. ৪১

৩৫। শাহ ওলী উল্লাহ ১৭০৩ খ্রীষ্টাব্দে এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্ম গ্রহন করেন। তিনি মুজাদ্দিদ-এ- আলফ-এ-সানী শেখ আহমদ সিরহিন্দীর বংশধর ছিলেন। তাঁর পিতা মহ সৈয়দ ওয়াজী উদ্দিন বাদশাহ আলমগীরের উপদেষ্টা ছিলেন। তাঁর পিতার নাম শাহ আব্দুর রহীম। দ্র. আব্দুল মওদুদ, মুসলিম মনীষা, ঢাকাঃ নওরোজ কিতাবি স্থান, ১৯৭০, পৃ. ১৫৬-২৬২

Dhaka University Institutional Repository

৩৬। ড. মুহাম্মদ এনাম-উল-হক, ভারতের মুসলমান ও স্বাধীনতার আন্দোলন, ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯৩, পৃ. ১

৩৭। শাহ আব্দুল আজিজ, শাহ ওলিউল্লাহর বড় ছেলে ছিলেন। তিনি বুদ্ধি সম্পন্ন ও ধর্মীয় আলেম ছিলেন। ফার্সী ভাষায় কবিতা লিখতেন। তিনি মোগল সাম্রাজ্যেব পরিবর্তে এমন একটি মুসলিম রাষ্ট্র গঠন করতে চেয়েছিলেন সেখানে জনগনের মধ্যে অর্থনৈতিক সাম্য প্রতিষ্ঠা হবে। তিনি ভারতকে "দারুল হারব" ঘোষনা করে ইংরেজদের বিরুদ্ধে জিহাদের ডাক দিয়েছিলেন। ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি মৃত্যুবরন করেন। দ্র. আকবর উদ্দীন, পথের দিশারী, ঢাকা: সাইনিং বুক একাডেমী, বাংলা বাজার, ১৯৬৬, পৃ. ১১-১৫

৩৮। Mahmud Hossain, A History of the freedom Movement, Vol: 1, PP: 493-507

৩৯। আকবর উদ্দিন, প্রাগুক্ত পৃ. ৩৮

৪০। উনবিংশ শতাব্দীতে এই উপমহাদেশে মুসলমানদের জাগরনে যে কয়টি আন্দোলন সংগঠিত হয়েছিল, তার মধ্যে তথা কথিত ওয়াহাবী আন্দোলন অন্যতম। এই অন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন আরবের মুহাম্মদ ইবলে আব্দুল ওয়াহাব (১৭০৩-৮৭ খ্রীঃ)। দ্র. ড. এনামুল হক, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩-৪, কে আলী, ভারতীয় উপমহাদেশের ইতিহাস, আধুনিক যুগ, পৃ. ১১০

৪১। ইহা মুসলামানদের একটি সংস্কার আন্দোলন। এই আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন বাংলাদেশের হাজী শরীয়ত উল্লাহ। তিনি মুসলিম সমাজের নানা কুসংস্কার দুর করার উদ্দেশ্যে এই আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন। দ্র. ড. এনাম উল হক, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩১-৩৮, ড. মোঃ আব্দুর রহীম, বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস, ঢাকা: আহম্মদ পাবলিশিং হাউজ, ১৯৮৯, পৃ.৮২-৮৬

৪২। সাধারনত আধ্যাতিক সাধনায় নিয়োজিত সাধকগনকে "ফকীর সন্ন্যাসী" বলা হত। ফকিরগন সুফী মতবাদের সহিত হিন্দুযোগীদের ভাবধারা গ্রহন করেন "ফকির সন্ন্যাসী" আন্দোলন নামে একটি সমিতি গঠন করেন। দ্র. ড. মুহাম্মদ আব্দুর রহীম, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৫-৭০

৪৩। রইছ আহমদ জাফরী, বাহাদুর জাফর আওর উনকা আহমদ, লাহোর: কিতাব মঞ্জিল, ১৯৬৯, পৃ. ৭৬

৪৪। অতুল চন্দ্র রায় ও প্রণব কুমার চট্টপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৭০

৪৫। পূর্বোক্ত, পৃ. ২৭০

৪৬। মোহাম্মদ ওয়ালী উল্লাহ, আমাদের মুক্তির সংগ্রাম বাংলা একাডেমী, ১৯৭৮, পৃ. ৮০

৪৭। অতুল চন্দ্র রায়, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৪৯, কে, আলী, ভারতীয় উপমহাদেশের ইতিহাস, আধুনিক যুগ, পৃ. ১২৬-১৩০

Dhaka University Institutional Repository

৪৮। কে, আলী, ভারতীয় উপমহাদেশের ইতিহাস, আধুনিক যুগ, পৃ. ১৩০

৪৯। পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩০

৫০। ড. মুহাম্মদ এনামুল-হক, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৯

৫১। ড. মুহাম্মদ এনামুল-হক, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৪

৫২। ড. মুহাম্মদ আব্দুর রহীম, পূর্বোক্ত, পৃ. ১১৪

৫৩। কে, আলী, ভারতীয় উপমহাদেশের ইতিহাস, পৃ. ১২৮

৫৪। কে, আলী, পাক ভারতের ইতিহাস, ঢাকা: আলী পাবলিকেশন, ১৯৬৯, পৃ. ৪৩১

৫৫। মুহাম্মদ আব্দুল হাই ও সৈয়দ আলী হাসান, বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৬৪, পৃ. ১৬

* লর্ড কানিং ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ভারতের গভর্নর জেনারেল পদে নিযুক্ত হন। তাঁর শাসন কালে ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের মহাবিদ্রোহ দমন। দ্র. অতুল চন্দ্র রায় ও প্রণব কুমার চট্টোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৬১

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়

স্যার সৈয়দ আহমদ খানের জীবন (জন্ম ও বংশ পরিচয়) ঃ

ক্ষয়িষ্ণু সামন্ততন্ত্রের আবহাওয়ায় বিলীয়মান মোঘল রাজশক্তির শেষ রশ্মিচ্ছার মুহূর্তে স্যার সৈয়দ আহমেদ জন্ম গ্রহন করেছিলেন।[১] স্যার সৈয়দ আহমদ খানের প্রকৃত নাম ছিল সৈয়দ আহমদ।[২] তিনি পিতা ও মাতা উভয়ের দিক থেকে হোছাইনী সৈয়দ এবং হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর ৩৭ তম বংশধর ছিলেন।[৩] তাঁর এই মানটি রেখেছিলেন তৎকালীন দিল্লীর বিখ্যাত দরবেশ হযরত শাহ গোলাম আলী (রঃ)।[৪] ইংরেজ সরকার কর্তৃক (১৮৮৮ খ্রীঃ) প্রদত্ত তাঁর "স্যার" উপাধী।[৫]

তিনি ৫ জিলহজ্জ, ১২৩২ হিজরী মোতাবেক, ১৭ অক্টোবর, ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে দিল্লীতে তাঁর মাতামহ (খাজা ফরিদ) এর বাড়ীতে জন্ম গ্রহন করেন।[৬] তাঁর পিতার নাম মীর মুত্তাকি এবং মাতার নাম আজীজুনেছা।[৭] তাঁর বংশের ৮ম ও শেষ ইমাম মুহাম্মদ তকীর নামানুসারে তাঁর পূর্ব পুরুষগন তকভী সৈয়দ নামে পরিচিত ছিলেন।[৮] সে সময় বনী উমাইয়া ও আব্বাসীয়দের অত্যাচারে ফাতেমী বংশের লোকজন মাতৃভূমি ত্যাগ করে দুর-দুরান্তের বিভিন্ন দেশে আশ্রয় গ্রহন করে ছিলেন, সে সময় স্যার সৈয়দের পূর্ব পূরুষগণ প্রথমে ইরান এবং পরে হেরাত নগরীতে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে থাকেন। অতঃপর সৈয়দ আহমদের জনৈক পূর্ব পুরুষ সম্রাট শাহজাহানের (১৬২৭-৫৮খ্রীঃ) শাষনামলে ভারতবর্ষে আগমন করেন এবং দ্বিতীয় আকবরের শাষনকাল পর্যন্ত শাষন পরিচালনার বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োজিত ছিলেন।[৯]

অতঃপর সৈয়দ আহমদ খানের পিতামহ সৈয়দ হাদী সম্রাট দ্বিতীয় আলমগীরের সময় (১৭৫৪-৫৯ খ্রীঃ) জওয়াদ আলী খান এবং মনসেবদার খেতাবে ভূষিত হন।[১০] পরবর্তীকালে সম্রাট শাহ আলম (১৭৫৯-১৮০৬খ্রীঃ) তাঁর কৃতিত্বপূর্ণ কাজের জন্য মুহাম্মদ হাদীকে জওয়াদুদ্দৌলা অতিরিক্ত খেতাব প্রদান করে শাহজানাবাদের পুলিশ বিভাগের পরিচালক হিসাবে নিযুক্ত করে ছিলেন।[১১] সৈয়দ হাদীর পুত্র অর্থাৎ সৈয়দ আহমদ খানের পিতা মীর মুত্তাকী একজন স্বাধীন চেতা ব্যক্তিত্ব ছিলেন।[১২] তিনি বিখ্যাত গোলাম আলী শাহ (রাঃ) এর শিষ্য ছিলেন।[১৩]

Dhaka University Institutional Repository

পিতার মত মীর মুত্তাকীর ও মোঘল সাম্রাজ্যে বিশেষ প্রতিপত্তি ছিল। সম্রাট আকবর তাঁর ব্যক্তিত্ব ও প্রতিভার জন্য তাকে অত্যন্ত শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখতেন। এ ছাড়া মীর মুত্তাকী অস্ত্রচালনা ও সাঁতার বেশ পটু ছিলেন।[১৪] সৈয়দ আহমদ খানও পিতার মত অস্ত্র চালানো ও সাঁতারে বেশ পারদর্শী ছিলেন।[১৫] পরবর্তীকালে সৈয়দ আহমদও মোঘল দরবার হতে তাঁর দাদার অনুরুপ খেতাবে ভুষিত হন এবং তাঁকে ১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দে আরিফে জং (সমর বিদ) খেতাবে ভুষিত করা হয়।[১৬]

সৈয়দ আহমদ খানের মাতা আজীজুন্নেছা বেগম সে সময়ের একজন সতী-সাধবী, এক অসাধারণ গুনবতী ও পরিমার্জিত মহিলা ছিলেন। মুলতঃ সৈয়দ আহমদ খান তাঁরই স্নেহ ও যত্নে লালিত পালিত হয়ে অগাধ পান্ডিত্যের অধিকারী হয়ে উঠেন। এ ছাড়াও তিনি খাজা ফরীদ উদ্দিনের স্নেহ ও ভালবাসার গুনে গুণান্বিত হয়েছিলেন।[১৭] সৈয়দ আহমদের মাতামহ খাজা ফরীদ উদ্দিন আহমদ সম্রাট দ্বিতীয় আকবরের (১৮০৬-৩৭) মন্ত্রী ছিলেন।[১৮] এবং বেশ কিছু দিন ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর দূত হিসাবে ভিন্ন দেশে দায়িত্ব পালন করেছিলেন।[১৯]

সৈয়দ আহমদ খানের বংশ তালিকা

মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ (সাঃ)

০১. হযরত ফাতেমা যাহুরা (রঃ)	০২. হযরত ইমাম হোসাইন (রঃ)
০৩. ইমাম জয়নুল আবেদীন	০৪. ইমাম মুহাম্মদ বাকের
০৫. ইমাম জাফর সাদেব	০৬. ইমাম মুসা কাজেম
০৭. ইমাম আলী মুসা রেজা	০৮. ইমাম মুহাম্মদ তক্বী
০৯. সৈয়দ মুসা মুবাক্কা	১০. সৈয়দ আব্দুল্লাহ আহমদ
১১. সৈয়দ মুহাম্মদ আরাজ	১২. সৈয়দ মুহাম্মদ আহমদ
১৩. সৈয়দ আহমদ	১৪. সৈয়দ মুসা

Dhaka University Institutional Repository

১৫. সৈয়দ আহামদ

১৬. সৈয়দ মুহাম্মদ

১৭. সৈয়দ আলী

১৮. সৈয়দ জাফর

১৯. সৈয়দ মুহাম্মদ

২০. সৈয়দ ঈশা

২১. সৈয়দ আবুল ফাতাহ

২২. সৈয়দ আলী

২৩. সৈয়দ ইয়ার হোসেইন

২৪. সৈয়দ কাজেম উদ্দিন হোসাইন

২৫. সৈয়দ জাফর

২৬. সৈয়দ বাকের

২৭. সৈয়দ মুসা

২৮. সৈয়দ শরফুদ্দীন হোসাইন

২৯. সৈয়দ ইব্রাহীম

৩০. সৈয়দ হাফেজ আহমদ

৩১. সৈয়দ আজীজ

৩২. সৈয়দ মুহাম্মদ দোস্ত

৩৩. সৈয়দ বোরহান

৩৪. সৈয়দ মুহাম্মদ ইমাদ

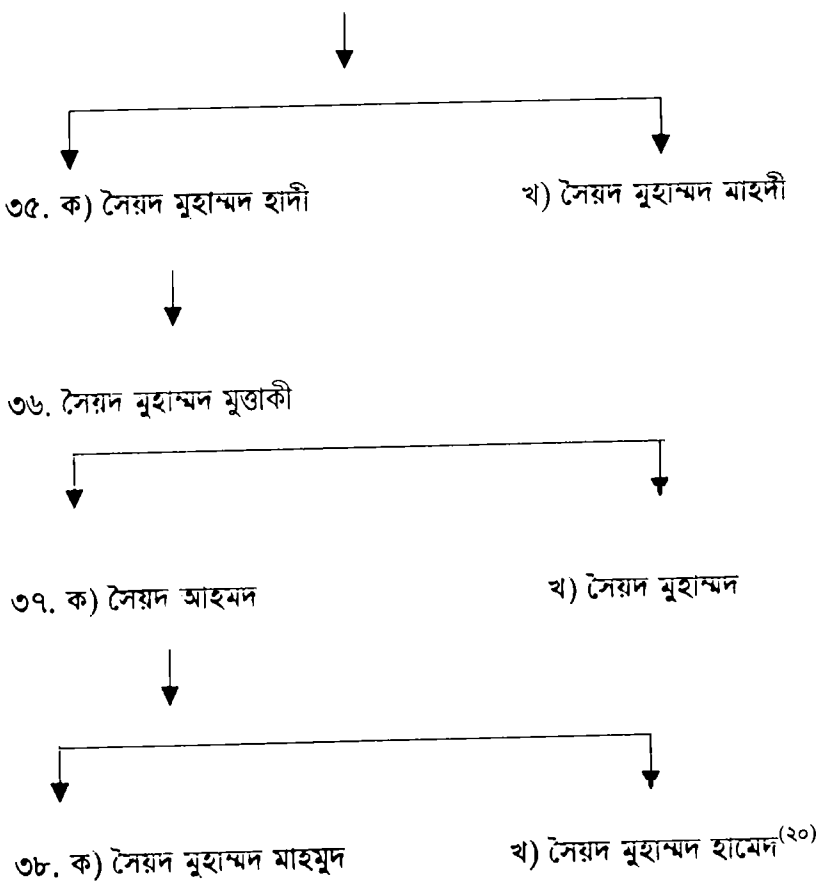

Dhaka University Institutional Repository

সৈয়দ আহমদ খানের শিক্ষা জীবন ঃ

সৈয়দ আহমদ খানের শিক্ষা জীবন শুরু হয় তৎকালীন বিখ্যাত হযরত শাহ গোলাম আলীর (রহঃ) নিকট, "বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম" পাঠ নেওয়ার মাধ্যমে।[২১] অতঃপর সে যুগের নীতি অনুযায়ী প্রথমে কোরআন পাঠ করতে থাকেন।[২২] কোরআন শরীফ পাঠ শেষে তিনি স্থানীয় একটি মকতবে ভর্তি হন।[২৩] এখানে তিনি আরবী ও ফারসি ভাষা শিক্ষা লাভ করেন।[২৪] এরপর মাতুল বংশের ঐতিহ্যপূর্ণ শিক্ষা অংকশাস্ত্রের প্রতি আগ্রহী হয়ে উঠেন এবং মামার নিকট থেকে অংকের কয়েকটি সাধারণ পাঠ্যবই ও জ্যামিতির কয়েকটি অধ্যায় পাঠ করেন।[২৫]

অতঃপর তাঁর পারিবারিক চিকিৎসক হাকীম গোলাম হায়দার খানের নিকট চিকিৎসা বিদ্যার উপর জ্ঞানার্জন লাভ করেন।[২৬] এভাবে ১৯ বছর বয়সে তাঁর প্রাতিষ্ঠানিক পড়ালেখা শেষ হলেও তিনি নিজ উদ্যোগে জ্ঞান চর্চায় লিপ্ত ছিলেন।[২৭]

যখন স্যার সৈয়দ আহমদ খান প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা জীবন সমাপ্ত করেন, তখন মোঘল শাষনের শেষ সময় ছিল। ফলে দেশের সামাজিক অবস্থা ছিল বিপদগামী। তবে সে সময়ে দিল্লীতে জ্ঞান চর্চার বড় বড় দুটি কেন্দ্র ছিল। এর মধ্যে একটি হলো মওলানা শাহ আব্দুল আজীজের প্রতিষ্ঠিত মাদ্রাসা-ই-রহীমীয়া, অন্যটি হলো মির্জা মজহার*, জানেজানানের শিষ্য ও তাঁর খলিফা হযরত শাহ গোলাম আলীর খানকাহ। তবে সৈয়দ আহমদ উভয় প্রতিষ্ঠানে যাতায়াত করতেন বলে তিনি উভয় প্রতিষ্ঠান দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন।[২৮]

মোটকথা স্যার সৈয়দ আহমদ খানের শিক্ষা জীবন নানার বাড়ীতে নানা খাজা ফরীদ উদ্দিনের তত্ত্বাবধানে সমাপ্ত হয়। সৈয়দ আহমদ নানার কাছ থেকে প্রাতিষ্ঠানিক জ্ঞান লাভ করা ছাড়াও সে সময়কার রাজনৈতিক প্রজ্ঞা, প্রশাসনিক ও সামাজিক অবস্থায় বাস্তব জ্ঞান অর্জন করেন। কর্ম জীবনে প্রবেশ করার পরও তিনি জ্ঞান চর্চা অব্যাহত রাখেন।[২৯]

Dhaka University Institutional Repository

সৈয়দ আহমদ খানের কর্ম জীবন ঃ

১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দে স্যার সৈয়দ আহমেদের পিতার মৃত্য হলে মাত্র ২২ বছর বয়সেই তিনি পারিবারিক দায়িত্ব কাধেঁ নিয়ে ইংরেজ সরকারের অধীনে কাজ করার সিদ্ধান্ত নেন।[৩০] অবশেষে সৈয়দ আহমদ তাঁর খালুর সহযোগিতায় দিল্লীর সদর আমীন কোর্টে অপরাধ বিভাগে সেরেস্তাদার পদে চকুরী গ্রহন করেন।[৩১]

অতঃপর ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দে মিঃ রবার্ট হিমিল্টন সৈয়দ আহমদকে আগ্রার নায়েবে মুনশীর শূণ্য পদে নিয়োগ দান করেন।[৩২] ইতোমধ্যে তিনি আইন, অর্থ ও দিওয়ানী আদালতের বিধি সম্পর্কে যথেষ্ট জ্ঞান অর্জন করেন এবং ১৮৪১ খ্রীষ্টাব্দে মঈনপুরের মুনশেফ পদে নিযুক্ত হন। ১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দে মঈনপুর থেকে বদলী হয়ে ফতেহপুর সিক্রিতে চলে আসেন।[৩৩]

এখানে তিনি চার বছর অতিবাহিত করেন (১৮৪৬-১৮৫০ খ্রীঃ)।[৩৪] সে সময়ে সৈয়দ আহমদ ফতেহপুরের হাকীম আহসানুল্লাহখান বাহাদুর শাহ জাফরের নায়েব হিসাবে ফতেহপুরে কাজ করেন।[৩৫] সৈয়দ আহমদ খানের বড় ভাই সৈয়দ মুহাম্মদ ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দে মৃত্যু বরণ করলে তিনি দিল্লীতে বদলী হয়ে চলে যান। এখানে তিনি (১৮৪৬-১৮৫৩ খ্রীঃ) পর্যন্ত অবস্থান করে এর মধ্যে ১৮৫০-১৮৫৩ খ্রীঃ পর্যন্ত তিনি অস্থায়ী "সদর-ই আমিন" হয়ে দুবার রোহটক বদলী হন।[৩৬] অতঃপর ১৮৫৫ খ্রীঃ সাব জজ হয়ে সৈয়দ আহমদ বিজনৌরে বদলী হন।[৩৭] আর এখানে অবস্থান কালে ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের সিপাহী বিদ্রোহ আরম্ভ হয়।[৩৮]

বিদ্রোহের সময় স্যার সৈয়দ আহমদ খানের অবদান ঃ

বিদ্রোহ এবং বিপ্লবের পার্থক্য আছে। বিপ্লব মানে শুধু শাসকের পরিবর্তনই নয়, সরকার ব্যবস্থা, সমাজ, অর্থনীতি সর্বক্ষেত্রে সামগ্রিক পরিবর্তনই বিপ্লব। অন্যদিকে কোন সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ এরমানে এনয় যে, সামগ্রিক সমাজ ব্যবস্থার পরিবর্তন। এ প্রেক্ষিতে, ১৮৫৭ সালে ভারতীয় সিপাহীরা ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে যে বিদ্রোহ করেছিল তাকে আমি ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহ হিসাবে আখ্যায়িত করব।[৩৯]

Dhaka University Institutional Repository

বিদ্রোহের সময় সৈয়দ আহমদ বিজনৌরে কর্মরত ছিলেন।[৪০] ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে ৯মে সর্বপ্রথম মীরাঠের একদল সিপাহী ইনফিলডের কার্তুজ।[৪১] ব্যবহার করতে অস্বীকার করলে সিপাহী বিদ্রোহের সূচনা হয়।[৪২] এরপর ১০ম সেনাবাহিনীর তিনটি রেজিমেন্ট প্রকাশ্যে বিদ্রোহ ঘোষনা করে দিল্লী অভিমুখে রওনা হয়ে দিল্লী অধিকার করে ১১ই মে ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে।[৪৩]

বিদ্রোহ শুরু হওয়ার দুদিন পর ১২ মে ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে বিজনৌরে ইংরেজ বিরোধী অভিযান শুরু হয়। অর্থাৎ বিজনৌরে বিদ্রোহ ছড়িয়ে পরে। ঐ সময় বিজনৌরে ২০জন ইউরোপীয়ান সপরিবারে অবস্থান করতেন।[৪৪] নবাব মাহমুদ তখন বিজনৌরে ইংরেজ বিরোধী আন্দোলনের নেতৃত্বে ছিলেন এবং ইংরেজদেরকে হত্যা করার হুমকি দিতে থাকেন।[৪৫] এমতাবস্থায় স্যার সৈয়দ আহমদ খান এই বিশজন ইংরেজ অফিসার ও তাঁদের পরিবারের জীবন বাচাঁতে এগিয়ে আসেন।[৪৬]

অতঃপর তিনি নিজে একাই অস্ত্র হাতে সারা রাত ইংরেজ কুঠি পাহারা দেন।[৪৭] অতঃপর নবাব মাহমুদ খান সৈয়দ আহমদ খানের পরামর্শে সেই রাতে ইংরেজদেরকে হত্যা করা থেকে বিরত থাকেন। এভাবে স্যার সৈয়দ আহমদ বিদ্রোহের সময় বহু ইংরেজ অফিসার ও তাঁদের পরিবারকে প্রাণে রক্ষা করেছিলেন।[৪৮]

উত্তর প্রদেশের লেফটেন্যান্ট গভর্ণর জন ষ্ট্রেচীর (Johon Straey) বক্তব্য থেকে স্যার সৈয়দ আহমদ খানের কৃতিত্বের স্বীকৃতি পাওয়া যায়। তিনি বলেছিলেন No man ever gave nobler proofs of conspicous courge and loyalty to the British Government than were given by him in 1857. No language that I could use would be worthly of the devotion he shouwed. [৪৯]

ইংরেজজাতি বিজনৌর থেকে চলে যাওয়ার পর এলাকাটি নবাব মাহমুদের হস্তগত হয় এবং পরে সেখানে হিন্দু মুসলিম দাঙ্গা হাঙ্গামা শুরু হলে সৈয়দ আহমদ খান মীরাটে চলে যান।[৫০]

Dhaka University Institutional Repository

বিদ্রোহের পর ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে স্যার সৈয়দ আহমদ খানকে "সদরুসদুর" অর্থাৎ জেলা আদালতের হাকিম হিসাবে পদোন্নতি দিয়ে মুরাদাবাদে নিয়োগ করা হয়। এখানে অবস্থান কালে ১৮৫৯ খ্রীঃ বৃটিশ সরকার কর্তৃক বিদ্রোহীদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করণ সংক্রান্ত বিশেষ কমিশনের সদস্য হিসাবে তিনি অতিরিক্ত দায়িত্ব প্রাপ্ত হন। এই কমিশনে তিনি প্রায় ২ বছর দায়িত্ব পালন করেন।[৫২]

মুরাদাবাদে থাকা অবস্থায় তিনি সেখানে ১৮৫৯ খ্রীঃ একটি ফার্সি মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। পরবর্তীতে মুরাদাবাদে "তহসীলী মাদরাসা" প্রতিষ্ঠিত হয়।[৫৩] এই সময়ে তাঁর Views of eduction (শিক্ষা সম্পর্কিত অভিমত) নামে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। যা ইংরেজী ও উর্দু উভয় ভাষায় প্রকাশিত হয়।[৫৪]

মুরাদাবাদে থাকাকালীন সময়ে অর্থাৎ ১৮৬১ খ্রীঃ তাঁর স্ত্রী পারছা বেগম এর মৃত্যু হয়।[৫৫] এরপর তিনি ১৮৬২ খ্রীৎ ১২ই মে গাজীপুরে বদলী হন।[৫৬] এখানে এসে তিনি উর্দু ভাষায় বিভিন্ন গ্রন্থ অনুবাদের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন।[৫৭] এছাড়াও এখানে থাকা অবস্থায় ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে "Scientific Society" নামে সংস্থা গঠন করেন। এই সংস্থাটির সদর দপ্তর আলীগড়ে স্থানান্তরিত করেন। পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রতি তাঁর অনুরাগ দেখে তৎকালীন ভারতের ভাইসরয় তাঁকে ১৮৬৬ খ্রীঃ একটি স্বর্ণ পদক ও একসেট বই উপহার দেন।[৫৮]

১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে স্যার সৈয়দ আহমদ Small Course Court এর জজ হিসাবে বেনারসে বদলী হন। পরে ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর দুই পুত্রকে সাথে নিয়ে ইংল্যান্ডে গমন করেন। ইংল্যান্ড থেকে ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে দেশে ফিরে পুনরায় চাকুরীতে যোগদান করে একটানা পঁয়ত্রিশ বছর সরকারী চাকুরী করার পর ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে জুলাই মাসে চাকুরী থেকে অবসর গ্রহন করেন।[৫৯]

অবসর গ্রহনের পর স্যার সৈয়দ ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দের ৮ জানুয়ারী ভারতের ভাইসরয় লর্ড লিটনকে দিয়ে মোহামেডান এ্যাংলো ওরিয়েন্টাল কলেজের ভিত্তি স্থাপন করান।[৬০] পরবর্তীতে এটি আলীগড় কলেজ নামে পরিচিত হয়ে মুসলমানদের সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও শিক্ষা কার্যক্রমের কেন্দ্র বিন্দুতে পরিণত হয়। এ ছাড়াও এটিকে কেন্দ্র করে মুসলমানদের মধ্যে আধুনিক ভাবধারার উন্মেষ ঘটে।

Dhaka University Institutional Repository

পরবর্তীকালে আধুনিক ভাবধারা জনগণের মধ্যে সম্প্রসারিত করার জন্য তিনি ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে "মোহামেডান এডুকেশন্যাল কনফারেন্স" নামে আরো একটি সমিতি গঠন করেন।[৬১] ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড ডাফরিন স্যার সৈয়দ আহমদকে পাবলিক সার্ভিস কমিশনের সদস্য হিসাবে নিয়োগ দান করেন। পরের বৎসরই (১৮৮৮খ্রীঃ) তাঁকে Knight commander of the star of India, বা "ভারতের নক্ষত্র" (নাইট) উপাধিতে ভুষিত করা হয়।[৬২] এর পর থেকে তিনি স্যার সৈয়দ আহমদ খান নামে পরিচিতি লাভ করেন।[৬৩]

১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হলে সৈয়দ আহমদ মুসলমানদের জাতীয় কংগ্রেসে যোগদান থেকে বিরত রাখার উদ্দেশ্য ১৮৮৮ খ্রীঃ ইউনাইটেড ইন্ডিনিয়ান প্যাট্রিয়াটিক এ্যাশোসিয়েশন নামে একটি সংগঠন স্থাপন করেন। যার লক্ষ্য ছিল দেশে শান্তি শৃংখলা রক্ষার জন্য সরকারকে সাহায্য করা এবং মুলমানাদেরকে কংগ্রেস হতে দুরে রাখা।[৬৪] এরপর সৈয়দ আহমদ ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে উত্তর ভারতে "মোহামেডান এ্যাংলো ওরিয়েন্টাল ডিসেন্স এ্যাশোসিয়েশন" নামে অন্য একটি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। যা মুসলমান ও বৃটিশদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল।[৬৫]

সৈয়দ আহমদ খানের মৃত্যু ঃ

অবশেষে আধুনিক মুসলিম ভারতের অন্যতম জনক স্যার সৈয়দ আহমদ ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে ২৪ মার্চ অসুস্থ্য হয়ে পড়েন। অতঃপর তিন দিন মৃত্যুর সাথে লড়াই করে ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে ২৭ মার্চ রাত দশটায় তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন (ইন্নালিল্লাহি.....ইলাহে রাজেউন)[৬৬]

এই মহান ব্যক্তির মৃত্যুতে মুসলমান ও অমুসলমান নির্বিশেষে যেভাবে শোক ও দুঃখ প্রকাশ করেছিল, দেশ-বিদেশে যেভাবে তাঁর মৃত্যুর প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছিল তাঁর উপমা খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। প্রায়-দুশো টেলিগ্রাম এসেছিল শোক বাণী বহন করে সৈয়দ মাহমুদের নিকট, কেবল, হিন্দুস্থানের প্রতিবেশী দেশগুলো থেকেই। বিশেষ করে লন্ডন টাইমস, ইয়ং ষ্টার্ন্ডাড, পলমল গেজেট, পিপলস, লাইটার, ইয়ং নিউজ প্রভৃতি এ সম্পর্কে বিশেষ প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। এই সব পত্রিকায় তাঁর মৃত্যুকে এ্যাংলো ইন্ডিয়ান ও মুসলমান উভয়ের জন্য অপুরনীয় ক্ষতি বলেও আখ্যায়িত এবং সকলের সাধারণ শোক বলে গ্রহন করা হয়।[৬৭]

Dhaka University Institutional Repository

১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে ২৯ মার্চ সংখ্যা "পাইওনিয়ায়" স্যার সৈয়দ আহমদের মৃত্যুর ঘটনা উল্লেখ করে বলা হয় যে, স্যার সৈয়দ আহমদ ছিলেন একজন দূরদর্শী সংগঠক। তাই তাঁর মৃত্যুর সঙ্গে কল্যাণময়ী ও প্রবল শক্তিশালী রাজনৈতিক শক্তির বিলুপ্তি ঘটে।[৬৮]

অবশেষে এই মহান ব্যক্তির জানাজার পর জাতির অনির্বান দীপ্ত শিখা ও আশা আকাংখার মুর্ত প্রতীককে চিরনিদ্রায় শায়িত করা হয় মাদরাসাতুল উলুমের মসজিদের উত্তর পার্শ্বে।

বলা বাহুল্য যে, আল্লাহর রহমতে বিংশ শতাব্দিতে জাতীয় জীবনের পূর্বাচলে উদিত হয় স্যার সৈয়দের মত একজন নবীন আলোর ব্যক্তি। যিনি স্বাধীকার ও আযাদরি পথ বেয়ে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে বিশ্বের দরবারের বিপদ গামী মুসলমান জাতির জন্য।

Dhaka University Institutional Repository

টিকা ও তথ্য নির্দেশ

১। আনিসুজ্জামান, মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য, ঢাকাঃ লেখক সংঘ প্রকাশনী, বর্ধমান হাউস, ১৯৬৪, পৃ. ৬৭, (সম্পা), বাংলা পিওয়া ১০ম খন্ড, ঢাকাঃ বাংলাদেশ সোসাইটি, ২০০৩, পৃ. ২৬৪।)

২। সৈয়দ শব্দটি আরবী এর শাব্দিক অর্থ হলো ইমাম, নেতা, সরকার, পরিচালক ইত্যাদি। পারিভাষিক অর্থে হযরত ফাতেমা (রাঃ) এর বংশধর তথা হযরত ইমাম হুসাইন ও ইমাম হাসান (রাঃ) এর বংশীয় সম্ভ্রান্ত মুসলমানদেরকে সৈয়দ বলা হয়। স্যার সৈয়দ নিজেকে সৈয়দ বংশীয় বলে দাবী করতেন। দ্র. অধ্যাপক ডঃ মিলন দত্ত ও অধ্যাপক অমলেন্দু মুখোপাধ্যায়, শব্দ সঞ্চয়িতা, কলকাতাঃ নিউ সেন্ট্রাল বুক এজেন্সী প্রাঃ লিঃ ১৯৯৫, পৃ. ৮১০, সিরাজুল ইসলাম।

৩। G.F.I. Graham, The life and work of Sayed Ahmed Khan, Delhi: Idarah-I-Adabiyal-I-Qaasin Jain Street, 1974) P.1; Ram Babu Sakse-an, A History of Urdu Literture, Laknu: Ram Narain Lal Pub, 1940, P.-269.

৪। শেখ মোহাম্মদ ইকরাম, আব-এ কাউসার, দিল্লী, অদবী দুনিয়া, ১৯৯১, পৃ. ৭৯

৫। সৈয়দ হাশেমী ফরীদাবাদী, তারিখ-এ মুসলমানানে পাকিস্তান ওয়া ভারত, ১ম খন্ড, করাচী: আনজুমান-এ তারাক্কি-এ উর্দু পাকিস্তান, ১৯৫২, পৃ. ৪৬০।

৬। ফররুখ শিয়ারের উপদেষ্টা মোহেদী কুলি খান এই বিশাল বাড়ীটি নির্মান করেছিলেন। পরে স্যার সৈয়দ আহমেদ খানের মাতামহ খাজা ফরিদ উদ্দিন আহমদ বাড়ীটি ক্রয় করেছিলেন। এখনো বাড়ীটি "খাজা হাভেলী" বা "খাজা ফরিদের বাড়ী হিসেবে পরিচিত। দ্র. নাজির হোসেন, কিংবদন্তির ঢাকা, ঢাকাঃ প্যারাডাইস প্রিন্টার্স, ১৯৯৫, পৃ. ২২৭।

৭। কেউ কেউ বলেন স্যার সৈয়দের পিতার প্রকৃত নাম মীর তকি আহমদ খান। তিনি অত্যন্ত খোদাভীরু লোক ছিলেন। কথিত আছে যে, যখন দ্বিতীয় আকবর শাহ তাঁর উপদেষ্টা হিসাবে তাঁকে নিয়োগ দিতে চাইলেন তখন তিনি সেই প্রস্তাব সাথে সাথে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। দ্রঃ Firoz Uddin, Urdu Encyclopaedia (Lahore: Firoz Sons; 1968) P.-456.

৮। ইসমাইল পানি পথি; মাকালত-এ-স্যার সৈয়দ, লাহোর মজলিশে তারাক্কি এ আদব; ১৯৬৫, ১১তম খন্ড, পৃ: ৬৩৬।

৯। আলতাফ হোসাইন হালী, হায়াত-এ-জাবীদ, ১ম খন্ড, পৃ: ৭৭: ড. মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ, স্যার সৈয়দ আহমদ খানের ধর্মীয় ও সামাজিক চিন্তাধারা, বাংলাদেশ : ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ১৯৮২, পৃ. ৫৯।

Dhaka University Institutional Repository

১০। Mahmud Hossain, A History of the freedom movement, Vol, 11. Karachi: Historical Society, 1957, P. 451.

১১। হামেদ হাসান কাদেরী, দাস্তান এ তারীখ-উর্দু, আগ্রাহ: লক্ষী নারায়ণ আগ্রাওয়াল, ১৯৪১, পৃ. ২৭০

১২। Mahmud Hossain, Ibid, Vol. 11, PP. 451-452

১৩। হযরত মাওলানা শাহ গোলাম পাঞ্জাবের পটীইয়ালা জেলার অতালা গ্রামের অধিবাসী। তাঁর প্রকৃত নাম আব্দুল্লাহ। উপনাম গোলাম আলী তাঁর পিতাও একজন বিখ্যাত দরবেশ ছিলেন। জঙ্গলে গিয়ে তিনি আল্লাহর ইবাদতে মাশগুল থাকতেন। তিনি বিখ্যাত আধ্যাত্মিক উর্দু কবি ও সাহিত্যিক মির্জা মাজহার জানে জানানের মুরীদ ও খলিফা ছিলেন। ১২৪৩ খ্রীঃ তিনি মৃত্যু বরণ করেন। দ্রঃ আলতাফ হোসাইন হালী পূর্বোক্ত, ১ম খন্ড, পৃ-৭৯

১৪। আলতাফ হোসাইন হালী প্রাগুক্ত, ১ম খন্ড পৃ- ৭৯

১৫। পূর্বোক্ত, পৃ- ৭৯

১৬। আলতাফ হোসাইন হালী, পূর্বোক্ত, ১ম খন্ড, পৃ- নাজির হোসেন, পূর্বোক্ত, পৃ- ২২৭

১৭। আলতাফ হোসেইন হালী, পূর্বোক্ত, ১ম খন্ড. পৃ-৯১

১৮। Mahmud Hossain, Ibid, Vol, 11, P-451

১৯। ইসলামী বিশ্বকোষ, ৩য় খন্ড, বাংলাদেশ ইসলামিক ফাউন্ডেশন, পৃ- ২০১-২০৫

২০। Sayed Ahmed Khan Bahador C.S.I., Series of Essay on the life of Mohammad, (Essay on the pedigree of Mohammad), Delhi: Idarahi-1, Adabiyat-1, 2009, Qasimian Street 1981, PP.8-9

২১। আলতাফ হোসাইন হালী, ১ম খন্ড, পৃ: ১০২-১০৩

২২। Mahmud Hossain, Ibid, Vol.11, P-451-453

২৩। আলতাফ হোসাইন হালী, পূর্বোক্ত, ১ম খন্ড, হায়াত এ জাবীদ, পৃ: ১০৩

২৪। আলতাফ হোসাইন হালী, পূর্বোক্ত, ১ম খন্ড, পৃ: ১০৪

২৫। স্যার সৈয়দ আহমদ খান, সীরাত-এ-ফরীদীয়্যাহ, লাহোর : সিন সাগর একাডেমী, ১৯৬৪, পৃ: ১৪,

২৬। আহমদ সাঈদ, হুসুলে পাকিস্তান, লাহোর এডুকেশন্যাল ইম-পারিয়াম, ১৯৮৫, পৃ: ১৬

Dhaka University Institutional Repository

২৭। আলতাফ হোসাইন হালী, পূর্বোক্ত, ১ম খন্ড, পৃঃ ১০৪

২৮। সৈয়দ হাশেমী ফরিদাবাদী, পূর্বোক্ত, ১ম খন্ড, পৃঃ ৪৬০

২৯। শেখ মুহাম্মদ একরাম, মওজ এ কাওছার, দিল্লি, আদবী দুনিয়া, ১৯৯১, পৃঃ ৮১

৩০। আলতাফ হোসাইন হালী, পূর্বোক্ত, ১ম খন্ড, পৃঃ ১০৯

৩১। Haroon Khan Sherwani, Studies in Muslim political through and Administration (...)P-216.

৩২। Haroon Khan Sherwani, Ibid, P-216.

৩৩। ড. মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ, স্যার সৈয়দ আহমদ খানের ধর্মীয় ও সামাজিক চিন্তাধারা, বাংলাদেশঃ ইসলামী ফাউন্ডেশন, পৃ : ৬৬

৩৪। আলতাফ হোসাইন হালী, পূর্বোক্ত, ১ম খন্ড, পৃঃ ১১১-১১২

৩৫। Haroon Khan Sherwani, Ibid, PO-216

৩৬। আলতাফ হোসাইন হালী, পূর্বোক্ত, ১ম খন্ড, পৃঃ ১১৩

৩৭। ইশতিয়াক হোসেন কুরাইশী, বাবর - এ- আজীম পাক ওয়াহিন্দ - কী - মীল্লাত- এ- ইসলআমিয়া, করাচী, করাচী ইউনিভার্সিটি, ১৯৬৭, পৃঃ ৩০৭

৩৮। আনিসুজ্জামান, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৬৬

৩৯। ড. মুনতাসির উদ্দিন খাঁন মামুন, পি, এইচ, ডি, থিসিস, পূর্ব বঙ্গে সমাজ জীবনে কয়েকটি দিক একটি ঐতিহাসিক পর্যালোচনা (১৯৫৭-১৯০৫), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, পৃঃ ২০

৪০। আলতাফ হোসাইন হালী, পূর্বোক্ত, ১ম খন্ড, পৃঃ ১২৮

৪১। ইহা ইংরেজ সরকার কর্তৃক প্রদত্ত ভারতীয় সৈন্যদের ব্যবহারে এক প্রকার বন্দুক। বন্দুকের কার্তুজ তৈলাক্ত ছিল। জনরব ছিল যে, গরু ও শুকরের চর্বি দ্বারা এই কর্তুজ তৈলাক্ত করা হয়েছে। দ্র. কে, আলী, পাক ভারতের মুসলমানদের ইতিহাস, ঢাকা, আলী পাবলিকেশন্স, ১৯৬৯, পৃঃ ১২৪-১২৫

৪২। ড. মুহাম্মদ আব্দুর রহীম, বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস (ঢাকা; আহমদ পাবলিশিং হাউস, (১৯৮৯) পৃঃ ১০২

৪৩। পূর্বোক্ত, পৃঃ ১০২

৪৪। G.F.I. Graham Ibid, P-20

Dhaka University Institutional Repository

৪৫। সৈয়দ ইকবাল আজীম, সাতসেতারে, ঢাকা: ফারুকুশ পাবলিকেষন্স, তা. বি:, পৃ: ৮-৯

৪৬। আলতাফ হোসাইন হালী, পূর্বোক্ত, ১ম খন্ড. পৃ: ১২৯

৪৭। পূর্বোক্ত, পৃ: ১৩০

৪৮। পূর্বোক্ত।

৪৯। G.F.I. Graham Ibid, P-19

৫০। Ibid, P-26

৫১। হুদরুহু ছুদূর দিল্লীর মুসলিম সম্রাটগণের শাসন কালের রাজকর্মচারীর উপাধি। দ্র. গোলাম সাকলাইন, বাংলায় মরছিয়া সাহিত্যে, ঢাকা ; পাকিস্তান বুক কর্পোরেশন, ১৯৬৯, পৃ: ৫৬০

৫২। ড. মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ, মুসলিম জাগরণে কয়েকজন কবি সাহিত্যিক, বাংলাদেশ ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ১৯৮০, পৃ: ৮

৫৩। আলতাফ হোসাইন হালী, পূর্বোক্ত, ১ম খন্ড, পৃ: ১৪২-১৪৩

৫৪। পূর্বোক্ত, পৃ: ১৪৩

৫৫। আতিক আহমদ সিদ্দীকি, স্যার সৈয়দ বায-এ-ইয়াফত, আলীগড়: স্যার সৈয়দ একাডেমী, ১৯৯০, পৃ: ৭৬

৫৬। ড. মুহাম্মদ এনামুল হক, পূর্বোক্ত:, পৃ: ৬৮

৫৭। G.F.I. Graham Ibid, P-70]

৫৮। এই গ্রন্থের উপর ভাইসরয় নিজের হাতে লিখেছিলেন: " To Moulvi Sayed Ahmed Buhadoor, Principal Sudder Ameen of Allygurh in recognition of his conspicuo us services in the diffusion of knowledge and general enlightmert among his country men, Agra 20th November 1886; N.B. G.F.I. Grahan ibid. P-95

৫৯। আলতাফ হোসাইন হালী, পূর্বোক্ত, ১ম খন্ড, পৃ: ২২২

৬০। ড. মুহাম্মদ এনাম-উল-হক, পূর্বোক্ত, ১ম খন্ড, পৃ: ৭৭

৬১। পূর্বোক্ত, পৃ: ৭৯-৮০

৬২। The new Encyclopedia Britannica Micropedia, Vol. I, Chicago: 1984, P-154

৬৩। G.F.I. Graham Ibid, P-341

Dhaka University Institutional Repository

৬৪। ড. মুহাম্মদ এনাম-উল-হক, পূর্বোক্ত, পৃ: ৮৩

৬৫। H.A. Dodwell- ed, The cambridge shorter History of India, Delhi: S, chand and Co....1969) p: 1049

৬৬। আলতাফ হোসাইন হালী, পূর্বোক্ত, ১ম খন্ড, পৃ: ৩৪২, ড. মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ, স্যার সৈয়দ আগমদ খানের ধর্মীয় সামাজিক চিন্তাধারা, পৃ: ১৩২

৬৭। আলতাফ হোসাইন হালী, স্যার সৈয়দ আহমদ, অনুদিত: মাওলানা মুজিবুর রহমান, ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৬৮, পৃ: ৩৪২

৬৮। পূর্বোক্ত, ৩৪৪।

* তাঁর আসল নাম মির্জা সামছুদ্দিন জান এ জানান। মজহার তাঁর কাব্য নাম তিনি ১৬৭৭ খ্রষ্টাব্দে জন্ম গ্রহন করেন। তাঁর পিতা মির্জা জান বাদশাহ আলমগীরের আমলে মনসবদার ছিলেন। মির্জা মজহার একজন সূফি ধর্ম প্রাণ ব্যক্তি ছিলেন। উর্দু কবি হিসাবে ও তাঁর বেশ খ্যাতি রয়েছে। তিনি ১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দে নিহত হন। বিঃ দ্রঃ মনির উদ্দিন ইউসুফ উর্দু সাহিত্যের ইতিহাস, ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৬৮, পৃ. ৫৭; ডঃ শ্রী হরেন্দ্র পাল, উর্দু সাহিত্যের ইতিহাস, কলকাতা: সাধনা প্রেস, ১৯৬২, প্র. ৭৭

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়

স্যার সৈয়দের সমাজ সর্ম্পকে চিন্তাধারা

সামাজিক চেতনা বোধ বিশ্ব সভ্যতার মূল উৎস ঃ

১৭৫৭ সালে এদেশে মুসলিম ভারতীয় উপমহাদেশে শাসনের অবসান ঘটে। এরপর প্রায় দুইশত বছর তারা আর পরাধীনতার গ্লানী মুক্ত হতে পারেননি। ইংরেজ নিয়ন্ত্রিত তাদের সামাজিক-রাজনৈতিক জীবন বিশ শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। তাই মুসলমানদের সামাজিক পশ্চাৎপটের ভিত্তি হিসাবে পলাশী-প্রান্তরের ভাগ্য বিপর্যয়কেই মেনে নিতে হয়।[১]

সমকালীন চিন্তাবিদ, সমাজ সংস্কারক ও লেখকদের মধ্যে সমাজ সম্পর্কিত ধারণা গুলি হয়েছেঃ স্ত্রী শিক্ষা, বাল্য বিবাহ, বহুবিবাহ, বিধবা বিবাহ, ইসলামের মাহত্যে, শরিয়ত, তাওহীদ, পীরবাদ, মুসলমানদের অতীত গৌরব ও পাশ্চাতৎ জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোকে ইসলামকে সংস্কার মুক্ত করার কথা ও ভেবেছেন।[২]

তাই সমকালীন ব্যক্তি স্যার সৈয়দ আহমদ খান যদিও কোন সামাজিক বিজ্ঞানী ছিলেন না, তবুও তিনি সমাজের উত্থান পতন নিয়ে যথেষ্ট চিন্তা ভাবনা করেন। তাঁর সমাজ সম্পর্কে প্রথম কথা হলো পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ, একের প্রতি অন্যের ভালবাসা, সহানুভুতি, সহমর্মিতা ও ঐক্যানুভুতি। কেননা এ গুলিই হলো একটি সমাজের প্রাণ। তাই স্যার সৈয়দ আহমদ খানের মতে, এ ধরনের চিন্তা থেকেই জন্মলাভ করেছে সামাজিকতা এবং তা থেকে সৃষ্টি হয়েছে বিশ্ব সমাজ এবং সমাজ ব্যবস্থা। কেননা তিনি মনে করেন যে, একজন মানুষের চরম ও পরম লক্ষ্যে হলো বিশ্ব মানব প্রেমে আকৃষ্ট হওয়া এবং তা যদি না হয় তবে দেশে প্রেমে বা নিজের জাতির সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করা।

যেহেতু স্যার সৈয়দ একজন ভারতীয় নাগরিক ছিলেন তাই তিনি ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থা নিয়ে চিন্তাভাবন করেছেন। কেননা সে সময় সমাজ ব্যবস্থা ছিল খুবই বিপর্যস্ত। ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহের পূর্বে তাঁর সামাজিক চিন্তাচেতনা তেমন একটি বিকাশ লাভ করেনি।

Dhaka University Institutional Repository

কিন্তু ৫৭ এর বিদ্রোহের হৃদয় বিদারক ঘটনা তাঁর সামাজিক চিন্তাধারাকে জাগিয়ে তোলে। তিনি সমগ্র দেশের বিশেষ করে মুসলিম জাতির অবস্থা দেখে মর্মাহত হন।

মুসলিম জাতি হিন্দু জাতির তুলনায় বেশী দুর্বিসহ বলে তিনি তাদের উন্নতির দিকে বিশেষভাবে দৃষ্টিপাত করেন। ১৮৮৬ সাল পর্যন্ত তিনি সামাজিক ও রাজনৈতিক দিক নিয়ে যত কাজ করেছিলেন, সব ক্ষেত্রেই তাঁর লক্ষ্য ছিল ধর্মনিরপেক্ষ। কেননা তাঁর প্রতিষ্ঠিত সায়েন্টিফিক সোসাইটি, বৃটিশ ইন্ডিয়ান এসোসিয়েশন, আলীগড় কলেজ প্রভৃতি সবই ছিল হিন্দু-মুসলিম ও খ্রীষ্টানদের জন্য খোলা।

কিন্তু মুসলিম জাতির প্রতি কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের উদাসীনতা লক্ষ্য করেই স্যার সৈয়দ আহমদ ১৮৮৭ সাল থেকে রাজনীতির ক্ষেত্রে সর্বভারতীয় জাতীয়তাবাদ পরিত্যাগ করেন এবং মুসলিম জাতির জন্য একটি স্বতন্ত্র জাতীয়াতাবাদের ভিত্তি গড়ে তোলেন। স্যার সৈয়দ আহমদ জাতি, ধর্ম নির্বিশেষে ভারতের সব মানুষকে সোহার্দ, সমপ্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে দেশ ও জাতির উন্নতি ও সুখ শান্তির পথ প্রশস্ত করার উপেদেশ দেন।[৩]

তিনি একে অপরের প্রতি শ্রদ্ধাবোধের সৃষ্টির জন্য মুসলমানদেরকে তাদের ধর্মীয় মনীষীদের এবং নিজ ধর্মের ভিন্নমত পোষণকারী ইমামদের প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করার পরামর্শ দান করেন এবং তা ধর্মীয় শাসন রূপে পালন করার নির্দেশ দান করেন। এমনকি তিনি নিজে কোন সময় তাঁর কাজ কর্ম ও আচার আচরণে সামপ্রদায়িকতার পরিচয় দেননি।[৪]

উপরোক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায় যে, জাতির উন্নতির শিখরে পৌঁছতে হলে তাকে যে কোন সাম্পদ্রায়িকতার উর্ধ্বে থাকতে হবে। এমনি জাতির মধ্যে ভালবাসা, মায়া-মমতা, বন্ধুত্ব গড়ে তুলতে হয়ে। তাহলেই জাতির মধ্যে সুখ-শান্তি, উন্নতি ও সামাজিক চেতনা বোধ গড়ে উঠবে।

Dhaka University Institutional Repository

মানুষ প্রয়োজনের তাগিতেই মানব সমাজ সৃষ্টি করেছে ঃ

সমাজ গঠন বলতে আমরা নির্দিষ্ট একটি সমাজের কথা বুঝি, যার অবস্থান নির্দিষ্ট কোন রাষ্ট্র বা ভৌগলিক সীমায় এবং নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক পটভূমিতে। সমাজ গঠন শব্দটি অর্থ বহন করে যার মধ্যে অন্তর্গত রাজনৈতিক ও আদর্শগত উপদান।[৫] সমাজ মাত্রেই অতি গুরুতর বস্তু। বৌদ্ধরা সমাজকে "সংঘ" বলে এবং কোমটিস্টরা "হিউমেনিটি" বলে বিবেচনা করেন। কিন্তু সমাজ যেমন হোক, মানুষ সমাজ গঠন করেই মানুষ হয়েছে সমাজভূক্ত, তা না হলে মানুষ বন্য পশু হতো।[৬]

তাই সমাজ প্রতিষ্ঠা করার প্রয়োজন এবং সামাজিক মুল্যোবোধের তাৎপর্য ও ফলাফল পর্যালোচনা করে স্যার সৈয়দ বলেন:

> "পরম করুনাময় আল্লাহ এই বিশ্বপরিমন্ডল সৃষ্টি করে তাতে দান করেছেন জড়বস্তু ও জীববস্তু। মানুষ জীব জগতের সেরা সৃষ্টি বলে তাকে দান করেছেন বিবেক বুদ্ধি। কারণ প্রত্যেক জীবের জ্ঞান আছে, তবে মানুষ হলো সবচেয়ে বেশী জ্ঞানের অধিকারী। সুতরাং আল্লাহ মানুষকে "আশরাফুল মাখলুকাত" বা সৃষ্টির সেরা বলে পবিত্র কুরআনে অভিহিত করেছেন কিন্ত জরবস্তুকে কোন বিবেক বুদ্ধি দান করেননি।"[৭]

তবে এটা সত্য যে, আল্লাহ তাঁর সৃষ্টির সব জীব জন্তুর তুলনায় মানুষকে বেশী জ্ঞান দান করেছেন। কারণ উভয়ের মধ্যে পার্থক্য এই যে, আল্লাহ নিজেই জীব জন্তুর মধ্যেই তাঁর প্রয়োজন মিটাবার ব্যবস্থা করেছেন। যেমনঃ- জীব তৃনভোজী হোজ অথবা শস্যকণাভোজী হোক যেখানে তারা থাকে, সেখানেই তারা নিজেদের খাদ্যের ব্যবস্থা দেখেতে পায়।[৮]

জীব জন্তুর প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম সাথে নিয়েই জন্মগ্রহণ করে। তাদের পোশাক তাদের সাথেই থাকে এবং ঋতু পরিবতর্ণের নিরিখে তার ও পরিবর্তন সাধিত হতে থাকে।[৯] অথচ মানুষ যখন জন্ম গ্রহণ করে, তখন তার কাছে জীবিকার কোন ব্যবস্থাই থাকে না। এমন কি শরীরে কোন পোশাকও থাকে না। তাই মানুষকে বিবেক বুদ্ধি দিয়ে তাপ ও শীত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য নানা ধরনের পোশাক ও ঘরবাড়ী তৈরী করতে হয়। এছাড়া চাহিদার কারনে সমাজ বা দলবদ্ধ হয়ে মানুষ নদীর উপর পুল নিমার্ণ করে, পাহাড় কেটে সুড়ঙ্গ সৃষ্টি করে থাকে।[১০]

Dhaka University Institutional Repository

সুতরাং বলা যায় যে, মানুষ তার নিজের প্রয়োজনের জন্য সমাজ সৃষ্টি করে থাকে এবং সমাজে দল বদ্ধভাবে বসবাস করে থাকে।

মানুষের ভিতরের গুনাবলী প্রকাশ লাভের একমাত্র উপায় হলো সমাজ ঃ

সমাজ একটি জটিল প্রক্রিয়া নিঃসন্দেহে। তবে যত জটিলই থাকুক না কেন, সামাজিক মানুষের অন্তর্নিহিত শক্তি বলে অবিরাম অনুশীলনের প্রক্রিয়ায় এই জটিলতা উত্তলন করা সম্ভব হয়।[১১] স্যার সৈয়দের মতে, মানুষ যেহেতু সামাজিক জীব তাই তাঁর সামনে নানা প্রকারের প্রয়োজন দেখা দেয়। যেমন: বাসস্থানের প্রয়োজন, রাষ্ট্রীয় প্রয়োজন, জাতীয় প্রয়োজন ইত্যাদি আরো কত প্রয়োজন। এছাড়াও প্রয়োজন দেখা দেয় মানুষ কিভাবে একে অপরের সাথে আচার ব্যবহার করবে, কিভাবে নিজের বাসস্থান সাজাবে, কিভাবে তারা সমাজে দলবদ্ধ হয়ে বাস করবে এবং কি উপায়ে সামাজিক বিধি মেনে চলবে ইত্যাদি নানা ধরনের প্রশ্ন তাদের সামনে দেখা দেয়।[১২]

মহান আল্লাহ তায়ালা মানুষের ভিতর অনেক ক্ষমতা দিয়ে রেখেছেন। তাই সে এই ক্ষমতা বলে নিজেদের উদ্দেশ্য পুরণ করে সমাজে বাস করে থাকে। সুতরাং সমাজ ছাড়া মানুষের আভ্যন্তরিন গুনাবলি প্রকাশ করা সম্ভব নয়। কেননা আমরা দেখতে পাই যে, নদীতে ঢেউ থাকে, নদী ছাড়া ঢেউয়ের কল্পনা করা যায় না। ঠিক এমনিভাবে মানুষের জাতীয় ও সামাজিক জীবন বিকাশ লাভ করে সমাজের মাধ্যমে।

এ প্রসঙ্গে স্যার সৈয়দ আহমদ আরো বলেন যে, মানুষের মধ্যে প্রকৃতির প্রদত্ত যে অর্ন্তনিহিত ক্ষমতা রয়েছে, তা সমানভাবে প্রকাশিত হয়না। এইটি কারো বেলায় বেশী, আবার কারো বেলায় কম দেখা যায়। কিন্তু যার ক্ষমতা বেশী সে ইচ্ছা করলে অপরের অধিকার কেড়ে নিতে পারে। কিন্তু মানুষ তা করে না সামাজিক জীব বলেই। বরং মানুষ তাঁর ক্ষমতা দিয়ে সামাজিক, রাষ্ট্রীয় এবং বিশ্বজনীন সম্পর্ক স্থাপনে সাহায্য করে থাকে।[১৩]

অবিরাম পরিবর্তনশীল সামাজিক ও নৈতিক অবস্থা সম্বলিত প্রগতিশীল পৃথিবীর প্রয়োজন গুলো সম্পর্কে তিক্ষ্ণতর অন্তদৃষ্টির রাসূল (সাঃ) এর চেয়ে আর কোন মানুষের ছিল না।[১৪]

Dhaka University Institutional Repository

সুতরাং আমি বলব মানুষ তার ভিতরের ক্ষমতা দিয়েই সমাজকে সুপ্রতিষ্ঠিত ভাবে গড়ে তোলে। কেননা সমাজ ব্যবস্থা হলো মানব জাতির পরম বন্ধু।

প্রেমের প্রকারভেদ ঃ

প্রেমের কথা বলতে গিয়ে স্যার সৈয়দ আহমদ ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে ৬ অক্টোবর কলকাতায় নওয়াব আব্দুল লতিফ আয়োজিত শিক্ষা সেমিনারে যোগদান করে তাঁর লিখিত ভাষনে বলেন:

> "ভালবাসা, শ্রদ্ধা ও প্রেম-প্রীতি গুলো মানুষের মধ্যে অপরের প্রতি উপকার সাধনের বিভিন্ন প্রেরনা যোগায়।"

সাধারনত প্রথম পর্যায়ের প্রেম হল বিশ্বের সব সৃষ্টির প্রতি। তবে এই রকম প্রকৃতি প্রেম আল্লাহর বিশেষ রহমত ছাড়া কারো মধ্যে জন্মায় না।

দ্বিতীয় পর্যায়ে প্রেম হলো জীব প্রেম। সৃষ্টির বিভিন্ন জীবের মধ্যে রয়েছে সামঞ্জস্য ও সম্পর্ক। তাই যার প্রাণ আছে, তার প্রতি মানুষের ভাল ব্যবহার করা উচিত।

আর তৃতীয় প্রেমটি হলো বিশ্ব জোড়া। মূলত জাতি, ধর্ম, নির্বিশেষে সকল মানুষের প্রতি সহানুভুতিশীল। যদিও এই প্রেমটি পূর্বোক্ত দুই ধরনের প্রেমের চাইতে নীচু। তবুও প্রকৃতিগত ভাবে আল্লাহ মানুষকে দুর্বলকরে সৃষ্টি করেছেন বলে এই প্রেমেই মানুষের জন্য উত্তম প্রেম রূপে পরিচিত।

আবার ধর্ম ভিত্তিক জাতীয় প্রেম হলো এর চাইতে কম গৌরবের। হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) মুসলমানদের প্রতি স্বজাতির মঙ্গল সাধনের জন্য আদেশ করেছেন। হাদীসে আছে " প্রত্যেক মুসলমানের কর্তব্য হলো আপন ভাইয়ের মঙ্গল কামনা করা।" যদি তা না করে, তবে আল্লাহর কাছে জবাবদিহি করতে হবে।[১৫]

মুলতঃ স্যার সৈয়দ ছিলেন দেশ প্রেমিক, বিশেষভাবে মুসলিম দরদী। তবে আদর্শ ও নীতিগত ভাবে তিনি যে প্রেমেই মনের মধ্যে পোষন করে থাকুক না কেন, তিনি দেশবাসীর চিন্তায় এতটাই বিভর ছিলেন যে, পৃথিবীর কোথায় কি, এমনকি মুসলিম বিশ্বের কোথায় কি হচ্ছে,

Dhaka University Institutional Repository

তা দেখার মত সময় ছিলনা। তিনি জামাল উদ্দিন আফগানীর প্যান-ইসলামবাদের লড়াইয়ের পাশে এসে দাঁড়াননি। কেননা তাঁর একমাত্র লক্ষ্য ছিল বৃটিশ সরকারের সুদৃষ্টি যাতে কোন অবস্থায় ভারতীয় মুসলমানদের থেকে হারিয়ে না যায়। এজন্য তিনি নিজে এবং মুসলমানদেরকে বর্হিভারতে রাজনীতি থেকে দুরে থাকার পরামর্শ দেন। বরং তিনি মিশরের আধুনিক শিক্ষার প্রচলন এবং মিশরীয়দের সমাজ সংস্কার ও উন্নতিতে সন্তোষ প্রকাশ করেন।[১৬]

এছাড়া স্যার সৈয়দ গ্রীকদের উপর তুর্কী মুসলমানদের বিজয় অর্জনে বেশ গর্ববোধ করেন।[১৭] মিশরীয়দের উন্নতি তাকে বেশ মুগ্ধ করেছে। এমনকি তাদের বিজ্ঞান-সম্মত আধুনিক ও প্রকৌশলের দিকে থেকে বেশ উন্নত রেলগাড়ী প্রচলিত আছে দেখে তিনি আনন্দিত হয়ে উঠেন। অন্যদিকে ফরাসী দেশের রাজমহলে সংরক্ষিত বাদশা আব্দুল কাদেরের শাসনামলের সময় যুদ্ধের একটি চিত্রে স্ত্রীলোকদের অবমাননা দেখে তিনি খুবই মর্মাহত হন।[১৮]

মুসলিম জাহানের প্রতি তাঁর আন্তরিকতার কোন অভাব ছিল না। বিশেষত তাঁর উৎকণ্ঠা ছিল শুধুই ভারতীয় মুসলমানদের জন্য। তাঁরই প্রচেষ্টায় ভারতীয় মুসলমানেরা পূনরায় চাকুরী বাকরী ও আধুনিক শিক্ষা-দীক্ষা লাভ করে জাতীয় পদ পর্যাদা লাভ করতে সচেষ্ট হন। তিনি সিপাহী বিদ্রোহের পর ব্যর্থ ও হাতাশা ভরা জাতিকে নতুন আলোর পথ দেখিয়েছেন, এবং তাদেরকে বিভিন্ন মুখী চিন্তাও মতামতের ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ্য ও জাতীয়তাবোধ সম্পন্ন করে তুলেন।

একজনের সাথে আরেকজনের নিবিড় বন্ধুত্ব ঃ

যেহেতু স্যার সৈয়দ আহমদের মতে, সবচেয়ে উত্তম প্রেম হলো, বিশ্ব জোড়া মানব প্রেম। তাই হযরত আদম (আঃ) হলেন মানব জাতির আদি পিতা। তাই প্রতিটি মানুষ আদমজাতি রূপে প্রত্যেকের ভাই। সুতরাং একে অপরের প্রতি সহানুভুতিশীল হওয়া, সকলের কৌশল বিনিময় করা, জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সকলকে ভালবাসা এগুলি হলো মানুষের মানবিক কর্তব্য। ১৮৭০ সালের ডিসেম্বরে স্যার সৈয়দ তাঁর "তাহযীবুল আখলাক" এর প্রথম সংখ্যায় "গোঁড়ামী" শীর্ষক প্রবন্ধে বলেন মানুষ মাত্রই আমাদের ভাই। তাই সকলের মঙ্গল কামনা করা, সকলের সাথে বন্ধুত্ব করা ও সকল কাজে সততা বজায় রাখা আমাদের কর্তব্য, কাজেই এগুলো বাদ না দিয়ে আমাদের অবশ্যই পালন করতে হয়ে।[১৯]

Dhaka University Institutional Repository

"গোঁড়ামী" (تعصب) শীর্ষক প্রবন্ধে স্যার সৈয়দ মানুষের সামাজিক ও মানবিক সম্পর্ক গড়ে তুলার পথে যে প্রতিবন্ধকতা রয়েছে, তাঁর বর্ণনা ও ব্যাখ্যা করে বলেন, গোঁড়ামী একজন মানুষের ভাবের আদান প্রদানকে বিরত রাখে। ফলে গোঁড়া মানুষ নিকেজে বড় বলে মনে করে সে অন্যের থেকে বিদ্যা বুদ্ধি কিছুই নিতে চায় না। এমনকি মুক্ত মনে কারো সাথে মিশেনা। বরং সে সমাজ থেকে দুরে থাকার ফলে মানুষে মানুষে, জাতিতে জাতিতে এবং সমাজে ভুল বুঝাবুঝি ও পারস্পরিক বন্ধুত্বের অবনতি ঘটে। এ ছাড়া ভারতীয় মুসলমানদের মধ্যে অনেকেই কুসংস্কারচ্ছন্ন ছিল।

তাই এ লক্ষ্যে স্যার সৈয়দ মানুষে মানুষে সম্প্রীতি, সম্পর্ক ও বন্ধুত্ব করার প্রয়োজনীয় বর্ণনা করে বলেনঃ

> "মানুষ যেহেতু প্রকৃতির অনুযায়ী পরস্পর নির্ভরশীল হয়ে জন্ম গ্রহন করে। তাই সে একা তাঁর প্রয়োজন মেটাতে পার না। সে অন্যর উপর নির্ভরশীল। এ সাহায্য বা নির্ভরশীলতা শুধু মাত্র বন্ধুত্ব ও ভালবাসার মাধ্যমেই অর্জন করা সম্ভব। যেহেতু গোঁড়া লোকেরা তাঁদের গোঁড়ামিবশত সমাজ থেকে এবং অন্যর কাছ থেকে দুরে থাকে। তাই সে নিজের মতের লোক ছাড়া আর কারো প্রতি আসক্ত হয় না।" [২০] (অনুবাদ)

সমাজের এই রকম পরিবেশ ও পরিস্থিতির উপর স্যার সৈয়দ গোঁড়ামি ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে তাঁর যুক্তিমূলক যে লেখনি ধারন করেন এবং হিন্দু ও মুসলমানে, খ্রীষ্টান ও মুসলমানে এছাড়া মানুষে মানুষে সম্পর্ক তোলার কাজে নিজেকে উৎসর্গ করেন।

মুসলমানদের সাথে হিন্দুদের সম্পর্ক ঃ

মুসলিম শাসন থাকা অবস্থায় ভারতীয় উপমহাদেশে মুসলমান ও হিন্দুদের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ ও সৌহার্দমুলক সম্পর্ক বজায় ছিল। কিন্তু পরে দেখা যায় বৃটিশ শাসনামলে ইংরেজ শাসনগণ ভারতকে বিভক্তিকর ও শাসন কর নীতি চালূ করে হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে বিবাদ সৃষ্টি করে। এমনকি ইংরেজ কর্তৃপক্ষ ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহ সংগঠিত হওয়ার জন্য মুসলমানদেরকে দায়ী করেন এবং হিন্দুরা ও সুযোগ বুঝে মুসলমানদের কাঁধে বিদ্রোহের দায়দায়িত্ব চাপিয়ে দেয়।

Dhaka University Institutional Repository

এমনকি তারা মুসলমানদের জাতীয় চেতনা, সামাজিক প্রাধান্য ও সংস্কৃতি মুছে ফেলার জন্য ইংরেজদের পুষ্ট হয়ে উঠে পড়ে লাগে।[২১]

এই অবস্থার প্রেক্ষিতে মাওলানা আলতাফ হোসাইন হালী বলেন:

> "তৎকালীন বৃটিশ সরকাররের ষ্টীম রোলার বিশেষ করে মুসলমানদের উপর চলতে থাকে। আর এই সুযোগ গ্রহন করে হিন্দুরা সরকারের সাথে হাত মিলিয়ে মুসলমানদের উপর প্রতিশোধ নিতে থাকে এবং পূর্বের সকল শত্রুতা উদ্ধারে অবতীর্ণ হয়।[২২]

যার ফলে দেখা যায় ইঙ্গ-মুসলিম সম্পর্কের মত হিন্দু-মুসলিম সম্পর্কের অবনতি ঘটে। কিন্তু স্যার সৈয়দ কখনও একটি জাতি বা দেশ নিয়ে চিন্তা করেন নি। তিনি গোটা ভারতবর্ষ নিয়ে চিন্তা ভাবনা করেছিলেন। তাঁর কাছে হিন্দু-মুসলমান ও ইংরেজ জাতি সমান ছিল। তিনি হিন্দু-মুসলিম বন্ধুত্ব রক্ষার জন্য যেমন তৎপর ছিলেন, ঠিক তেমনি ইঙ্গ-মুসলিম সম্পর্ক স্থাপনের জন্য চেষ্টা করছিলেন। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে, হিন্দু বা মুসলিম জাতি কেউ এই মুহূর্তে দেশ শাসনের জন্য উপযুক্ত নয়, এমনকি তাঁরা কেউ ভারতের শান্তি রক্ষা করতে পারবে না। তাই বৃটিশ সরকারকে এই মুহূর্তে ভারতবর্ষ থেকে হটিয়ে দেয়া সম্ভব নয়। সুতরাং তাঁর মতে ইংরেজ রাজত্বই দুনিয়ার সবচাইতে শক্তিশালী এবং সবচাইতে উত্তম। তাই বৃটিশ রাজত্বের প্রতি অভিনন্দন প্রর্দশন করাই এই মুহূর্তে দায়িত্ব ও কর্তব্য, কেননা এতে নিহিত রয়েছে ভারতীয়দের কল্যাণ।[২৩]

স্যার সৈয়দ বুঝতে পারলেন যে, বৃটিশের অধীনে মুসলমানদের গঠনমুলক কাজে আত্মনিয়োগ করা উচিত। কেননা ইংরেজগণ জোড় করে ভারতীয় শাসন ক্ষমতা কেড়ে নেন নি সুতরাং ইংরেজ শাসন কামনা করার পিছনে তাঁর মনোবৃত্তি ব্যাখ্যা করে তিনি বলেনঃ আমি ইংরেজদের প্রতি ভালবাসা প্রদর্শন বা তাদের মঙ্গলের জন্য ভারতের বৃটিশ রাজত্বের প্রতিষ্ঠা চাই না। বরং তাঁদের রাজত্বের প্রতিষ্ঠার মধ্যে মুসলিম ভারতের মঙ্গল নিহীত রয়েছে বলেই আমি তা কামনা করি। আমার মতে, মুসলমান যদি আপন দুরাবস্থা কাটিয়ে উঠতে চায়, তবে বৃটিশ রাজত্বেই তা সম্ভব।[২৪]

Dhaka University Institutional Repository

সেই সময় নাযিমাবাদের নবাব ছিলেন মাহমুদ খান। তিনি ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহের সময় সরকারের বিরোধিতা করেছিলেন। এই সময় স্যার সৈয়দ তাঁকে বলেনঃ

> আপনি ইংরেজদের প্রতি এই বিরোপ মনোভাব ত্যাগ করুন। কেননা ইংরেজ সরকারের রাজত্ব কখনো এখান থেকে যাবে না। এছাড়া ইংরেজরা যদি ভারত থেকে চলে যায়, তবুও তাদের ছাড়া আর কারো পক্ষে এই উপমহদেশের শাসনকার্য পরিচালনা করা সম্ভব হবে না।[২৫]

এই বাস্তব পরিস্থিতির আলোকে স্যার সৈয়দ আহমদ ইংরেজদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করেন এবং পাশাপাশি হিন্দু-মুসলিম ঐক্য, পরস্পরের সহানুভুতি ও সামাজিক শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষা করার চেষ্টা করেন। তিনি সমগ্র দেশ ও জাতির ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তাকরে ইঙ্গ-মুসলিম এবং হিন্দু-মুসলিম বন্ধুত্বের চেষ্টা করেন। তিনি কখনও ভাবতেন না যে, ইংরেজরা মুসলমানদের সাথে কেমন আচর-ব্যবহার করছে বা হিন্দুরা মুসলিম জাতির প্রতি কেমন মনোভাব প্রদর্শন করছে।

তবে তাঁর শিক্ষা অভিযান ছিল শুধু মাত্র মুসলমানদের জন্য। কেননা তাঁরা শিক্ষাদীক্ষায় হিন্দুদের চেয়ে অনেক পিছিয়ে আছে। তবে তিনি সমাজ সংস্কার ক্ষেত্রে যে অভিযান পরিচালনা করেন তাঁর লক্ষ্য ছিল সমানভাবে হিন্দু ও মুসলমান উভয় জাতির জন্য। তিনি হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক স্থাপনের উদ্দেশ্য বলেন, যেমন হিন্দুরা বিভিন্ন দেশ থেকে কোন এক সময় এদেশে আগমন করেছিল, তেমনি মুসলমানরা পরবর্তীতে অন্য দেশ থেকে এদেশে বসতিস্থাপন করেছে; এতেকরে কয়েকশতাব্দী ধরে হিন্দু-মুসলিম একত্রে বসবাস করতো।

ফলে তাদের মধ্যে উঠা-বসা, চলাফেরা একত্রেই হয়ে থাকে; তাদের সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বার্থ ও অভিন্ন এমনকি তারা একে অপরের সামাকিজ রীতি নীত ও গ্রহন করেছে। সুতরাং ভারতের উন্নতি ও শান্তি সম্ভব করতে হলে হিন্দু মুসলিম জাতির মধ্যে সম্প্রীতি, সহানুভুতি ঐক্য ও সহযোগিতা বজায় রাখতে হবে।[২৬]

Dhaka University Institutional Repository

হিন্দু মুসলিম সম্পর্ক স্থাপনের উপর গুরুত্ব দিয়ে স্যার সৈয়দ ১৮৮৩ সালে পাটনার এক ভাষনে বলেন ঃ

> "আল্লাহ তালার সাথে আমাদের উভয় জাতির যে সম্পর্কটি তা বাদ দিলে আমরা ভারতীয়রূপে এক জাতিতে পরিণত হই। তাই উভয়ের ঐক্য ও পরস্পরের সহানুভূতির ফলেই দেশের উভয় সম্প্রদায়ের উন্নতি ও মঙ্গল সাধন হতে পারে। কিন্তু পরস্পরের জিদ ও শত্রুতা উভয়েকেই ধ্বংস করে দেবে। আমি আবারও বলছি ভারত হলো একটি সুন্দুর নারীর মত, যার দুইটি চোখ হলো হিন্দু ও মুসলমান। তারা যদি একে অপরের শত্রুতায় লিপ্ত হয় তবে তাঁর একটি চোখ টেরা হয়ে যাবে। এরপর যদি একে অন্যকে বিনষ্ট করে তবে তাঁর আরেকটি চোখ অন্ধ হয়ে যাবে। হে ভারতয় মুসলমানগণ এটা তোমাদেরই ক্ষমতা যে, তোমরা সে সুন্দর নারীটির চোখ টেরা করবে না অন্ধ করবে।"[২৭]

স্যার সৈয়দ সব সময় জাতি, ধর্ম নির্বিশেষে ভারতীয় উপমহাদেশের স্বার্থকে ১৮৫৭ সাল থেকে শুরু করে ১৮৮৭ সাল পর্যন্ত সামাজিক বা রাজনীতি ক্ষেত্রে এক নজরে দেখেন। এছাড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বা সামাজিক সংগঠন সব ক্ষেত্রেই সর্ব সাধারণ দেশ বাসীর স্বার্থে কাজ করে যান। বিশেষত, মুসলমানদের সব ক্ষেত্রে পিছিয়ে থাকার পরিপ্রেক্ষিতে তাদের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখেলও হিন্দুদের ক্ষেত্রে তিনি সর্বদিকে উন্নতি কামনা করতেন। আর এজন্যই হিন্দু জাতি তাঁকে বিশিষ্ট ভারতীয় নেতা রূপে গ্রহন করেন।

এর প্রমাণ পাওয়া যায় ১৮৮৪ সালে আলীগড় কলেজের চাঁদা সংগ্রহের জন্য স্যার সৈয়দ পাঞ্জাব সফর করলে তারা তাকে স্বাগত জানান। এছাড়াও জলন্ধরের "আঞ্জুমানে ইসলামিয়া" তাঁকে যে মানপত্র প্রদান করেন তাতেও প্রমাণিত হয় যে, তিনি মুসলমান হিন্দু ও খ্রীষ্টান সকল জাতির নিকট সমানভাবে প্রিয় ছিলেন এবং সকল জাতিকে সমানভাবে সেবা দান করেন।

Dhaka University Institutional Repository

মানপত্রে বলা হয়ঃ

> আপনি মুসলমানদের পাশাপাশি হিন্দু ও খ্রীষ্টানদের সমানচোখে দেখেছেনএবং একজাতি বলে মনে করেছেন। এমনকি আপনি আলীগড় কলেজেমুসলমান ছাত্রদের পাশাপাশি হিন্দুদের সমান মর্যাদা দিয়েছেন। তাই আজ হিন্দু ও খ্রীষ্টান আপনার নিরপেক্ষতা ও ন্যায়নিষ্টার জন্য কৃতজ্ঞ।[২৮]

এই সময় স্যার সৈয়দকে জলন্ধরের সরকারী স্কুলের ছাত্রদের তরফ থেকে আরেকটি মানপত্র দেয়া হয়। সে সময় এই মানপত্রটি পাঠ করেন লালাভগত রাম নানক এক হিন্দু ছাত্র। তখনকার যুগে সরকারী স্কুলে মুসলমানদের চেয়ে হিন্দু ছাত্রের সংখ্যা ছিল অনেক বেশী। এ মানপত্রে স্যার সৈয়দকে লক্ষ্য করে বলা হয়ঃ

> "স্যার সৈয়দ সাহেব শুধু মাত্র একটি জাতি বা একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের সাহায্যকারী ব্যক্তি ছিলেন না। বরং তিনি বাবুকেশব চন্দ্রসেন এবং শ্রীস্বামী দয়ানন্দ সরস্বতীর ভক্তদেরকেও স্নেহের চোখে দেখতেন। কেননা তিনি শুধু মুসলমানদের সাহায্যই করেননি বরং সমগ্র দেশের সাহায্য করেছিলেন এবং গোটা ভারতের জন্য নিজেকে উৎসর্গকারী এক মহান ব্যক্তি।"[২৯]

এছাড়া তৎকালীন সময়ে স্যার সৈয়দকে ব্রাক্ষ্যসমাজ ও আর্য সমাজের একদল প্রতিনিধি তাঁর সাথে সাক্ষাত করে তাকে মানপত্র প্রদান করেন। এই মানপত্রে তাঁরা বলেনঃ

> "আপনি ভারতের আইন পরিষদের অনেক সেবা কার্য সর্ম্পন্ন করেছেন। তাই আমরা লাহোরের ব্রাক্ষ্ম ও আর্য সমাজ সমস্ত হিন্দুদের পক্ষ থেকে আপনার প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।[৩০]

উপরোক্ত আলোচনার পর আমিও স্যার সৈয়দের মতের সাথে একমত পোষন করছি। এছাড়া ড. মুহাম্মদ আবদুল্লাহ সাহেবের বিখ্যাত বই "স্যার সৈয়দ আহমদ খানর ধর্মীয় ও সামাজিক চিন্তাধারার" সূত্র ধরে আমিও বলছি যে, একে অপরের প্রতি ভালাবাসা, শ্রদ্ধাবোধ, প্রেম-প্রীতি না থাকলে কোন জাতি উন্নতির চরম শিখরে ধাবিত হতে পারে না। তাই হিন্দু, মুসলিম, খ্রীষ্টান জাতিকে আলাদা মনে না করে শুধু এক জাতি হিসাবে ভাবতে হবে তাহলে জাতির মঙ্গল।

Dhaka University Institutional Repository

হিন্দু মুসলিম সম্পর্ক বিনষ্ট ঃ

পলাশী যুদ্ধের পর মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে রাজনৈতিক উদমহীনতা ও শিক্ষা ক্ষেত্রে অনগ্রসরতার ফলে সাধারণ ভাবে জাগরনের চেতনা বোধ হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে।[৩১] তাই প্রথম থেকেই স্যার সৈয়দ হিন্দু-মুসলিম সম্পর্ক স্থাপনের বহু চেষ্ট করে থাকলেও শেষ পর্যন্ত তা বৃটিশ সরকারের কূটনীতি এবং কিছু নেতাদের মুসলিম স্বার্থবিরোধী মনোভাবের কারণে তা ব্যর্থতায় পরিগণিত হয়। তবে এই ব্যর্থতার পিছনে অনেক কারণ লুকায়িত ছিল। তার মধ্য একটি হলো পাঠ্যসূচী নিয়ে।

কেননা সরকারী ইংরেজী স্কুল সমূহে হিন্দু ছাত্ররাই বেশী পড়াশুনা করতো। অপরদিকে সদ্য রাজ্যহারা মুসলমানেরা তাদের মনের দুঃখের বা অহংকারে বা কুসংস্কারে বা উদাসীনতাবশত আবার কোথাও দেখা যায় দারিদ্রতার কারনে তাঁরা আধুনিক শিক্ষাদীক্ষা থেকে দুরে সরে থাকত। এর মধ্যে যে সব ছাত্র ইংরেজী সরকারী স্কুলে কলেজে পড়তো তারা ও আবার মনের দুঃখে ভুগতো। কারন ভারতের ইতিহাস জানার জন্য যে সব গ্রন্থ পাঠভুক্ত করা হতো, তা ছিল পক্ষপাতিত্ব মূলক।[৩২]

প্রথমঃ এই সব পাঠ্যসূচীতে মুসলমান বাদশাদের দোষ ত্রুটি ও অবিচারমূলক কার্যাবলী জড়ালোভাবে তুলে ধরা হতো। এতে করে হিন্দুদের মনে মুসলমানদের বিরুদ্ধে ঘৃণা জন্মাতে থাকে।[৩৩]

দ্বিতীয়ঃ হিন্দু-মুসলিম সম্পর্ক নষ্ট হওয়ার আরেকটি কারণ ছিল হিন্দুদের উর্দু ভাষার প্রতি বিরোধিতা। ফলে স্যার সৈয়দ একদিকে হিন্দু-মুসলিম ঐক্যর প্রচেষ্ট চালাতেন, অন্যদিকে হিন্দুরা সম্পর্ক নষ্টের অজুহাত খুঁজতেন। এই প্রসঙ্গে মাওলানা হালী বলেনঃ

> "হিন্দু জাতি দীর্ঘ দিন পর ক্ষমতা অর্জন করেছিল বলে তারা পরাজিত মুসলিম দলের উপর নিজ শক্তির পরীক্ষা করবে এবং কোন রূপ ছুতা দাঁড় করিয়ে মুসলমানদের সাথে লড়াই করবে এটাই তাদের স্বাভাবিক ব্যাপার।"[৩৪]

Dhaka University Institutional Repository

১৮৩৫ সাল থেকেই উর্দু-উত্তর পশ্চিম প্রদেশ, পাঞ্জাব ও বিহারের এবং অফিস আদালতের ভাষারূপে প্রচলিত ছিল। কিন্তু ১৮৬৭ সালে কতিপয় হিন্দু সরকারী অফিস আদালতে উর্দু ভাষা ও ফারসী অক্ষরের ব্যবহার বন্ধ করে সেখানে হিন্দী ভাষা ও দেবনাগরী অক্ষর প্রর্বতনের আন্দোলন শুরু করেন।[৩৫] উর্দু সমগ্র উত্তর ভারতে অর্থাৎ দিল্লী ও লখনৌ নগরীতে জাতীয় ভাষা হিসাবে বিশেষ উন্নতি লাভ করে। কিন্তু আলতাফ হোসেন হালীর ভাষার উর্দুর ক্রমবিকাশের যাত্রা মুসলিম আমলেই শুরু হয়েছিল বলেই হিন্দুরা এই ভাষা ধ্বংসের চেষ্টায় লিপ্ত থাকে।[৩৬]

এলাহাবাদের উর্দু বিরোধীরা তাদের কেন্দ্রীয় কমিটি স্থাপন করেন। এতে তাঁরা বাবু শারদা প্রাসাদকে সেক্রেটারী নিযুক্ত করে মুসলমানদের মুখের ভাষা কেড়ে নেবার দাবি জোড়দার করে তোলেন। স্যার সৈয়দ আহমদ বলতেনঃ

> "আমাদের মাতৃভাষা হলো উর্দু, তাই একে জ্ঞানের বাহন হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করে তুলতে হবে।"[৩৭]

১৮৫৭ সালে বিদ্রোহের জন্য যখন মুসলমানদের দায়ীকরা হয় তখন বৃটিশ সরকার মিঃ জেমস কেনিলীকে বিদ্রোহীদের সম্পর্কে তথ্য দেওয়ার জন্য নিযুক্ত করা হয়। ফলে মিঃ কেনিলী ১৮৭০ সালে তাঁর "কেলটাকা রিভিউতে" হিন্দু-মুসলিম বিদ্বেষ মনোবৃত্তি প্রকাশ করে লিখেন যে, বিভিন্ন প্রত্র-পত্রিকার মাধ্যমে, মুসলমানদের দুরাবস্থার সম্পর্কে সরকারের দৃষ্টি আর্কষনের জন্য এবং তাদেরকে বিভিন্ন প্রশাসনিক কাজে নিয়োগ দেওয়ার জন্য বলা হচ্ছে। অথচ হিন্দুদের একটি দল শাসন কর্তৃপক্ষকে মনে করিয়ে দিচ্ছে যে, মুসলমানদের মধ্যে একটি দল আছে যারা বিশ্বাস ঘাতক এবং তাদের প্রতি সকল মুসলমানের সহমর্মিতা রয়েছে।[৩৮] ফলে দেখা যায় যে, ১৮৭৩ সালে বৃটিশ সরকার মুসলমানদেরকে আধুনিক শিক্ষার প্রতি আকৃষ্ট করার জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহন করেন।[৩৯]

রাজনৈতিক পার্থক্য থাকলেও সামাজিক ক্ষেত্রে হিন্দু মুসলিম বন্ধুত্ব কামনা ঃ

মোটা কথা স্যার সৈয়দকে শেষ পর্যন্ত মুসলিম স্বার্থ রক্ষা করতে গিয়ে রাজনীতির ক্ষেত্রে আলাদা পথ অনুসরন করতে হয় এবং কংগ্রেস থেকে মুসলমানদের দুরে থাকার জন্য আহবান জানান। কিন্তু সামাজিক ক্ষেত্রে তিনি আজীবন হিন্দু-মুসলিম ঐক্য ও সম্প্রীতি কামনা করতেন।

Dhaka University Institutional Repository

তিনি এক সময় বলেছিলেন, যদি গো-কোরবানী বাদ দিয়ে হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক বজায় থাকে, তবে সেই কোরবানী না করাই ভাল।[৪০] বলাবাহুল্য যে, ১৮৮৮ সালে "মোহামেডান এডুকেশনাল কনফারেন্স" এর ৩য় অধিবেশনে স্যার সৈয়দ ঘোষনা করেন যে, মুসলমানরা একটি স্বতন্ত্রজাতি তাই তাঁরা কংগ্রেস ভুক্ত নয়।[৪১] এছাড়া তিনি সবসময় মনে করতেন, ধর্মীয় ও রাজনৈতিক মতামতে নিরিখেই সামাজিক ঐক্য ও সম্প্রীতি বজায় রাখা সম্ভব।

এই জন্যই তিনি বলেছিলেন যেঃ ধর্মীয় পার্থক্যের দরুন যেমন হিন্দু-মুসলমানদের সামাজিক লেনদেন এবং পারস্পরিক সহানুভুতি ও সম্প্রীতি বাধা গ্রস্থ হয় না, ঠিক তেমনি সামাজিক কাজ কর্ম পরস্পরের বন্ধুত্ব ও সৌহার্দ্য রক্ষার পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায় না রাজনৈতিক মতামতে।[৪২]

তাই জাতির মধ্যে রাজনৈতিক মতভেদ থাকলেও সামাজিক ভাবে তাদের বন্ধুত্ব গড়ে তোলা উচিত। কেননা মানুষ সামাজিক জীব। তাই তারা একে অন্যের উপর নির্ভরশীল।

জাতীয়ভাবে মুসলমানদের ঐক্য ঃ

ভারতীয় উপমহাদেশে মুসলিম শাসনামলে জাতীয় চেতনা, রাজনৈতিক চেতনা ও ঐক্যবোধের অভাব ছিল প্রজা সাধারণের মধ্যে। কারণ তখন দেশে গণতান্ত্রিক শাষন ব্যবস্থা কায়েম ছিল না। অবশ্য স্যার সৈয়দের পূর্বে সৈয়দ আহমদ শহীদ এবং শাহ ইসমাইল শহীদ জাতীয় ঐক্যর সৃষ্টির চেষ্টা করেছিল।

কিন্তু তাদের সে আন্দোলন ছিল ধর্মীয় ভিত্তি। তবে এই আন্দোলন ধর্মীয় ও সংস্কার মুলক হলেও শেষ পর্যন্ত তা সশস্ত্র রাজনৈতিক আন্দোলনে পরিনত হয়। তাদের চিন্তাধারা শিয়া-সুন্নী, ওহাবী বেদাতী মতবাদের উর্ধ্বে উঠে ঐক্য সৃষ্টির চেষ্টা করা হয়নি। কিন্তু স্যার সৈয়দ সর্বপ্রথম হানাফী-ওহাবী, ওহাবী-বেদাতী ও শিয়া-সুন্নী মতবাদের উর্ধ্বে উঠে এই উপমহাদেশের একক মুসলমান জাতীয়বাদ মুসলিম ঐক্য ও রাজনৈতিক স্বাতন্ত্র্যের সূচনা করেন।

Dhaka University Institutional Repository

তিনি লক্ষ্য করলেনস যে, মুসলমানরা ইসলামের মুলনীতি উপর গুরুত্ব না দিয়ে খুঁটিনাটি বিষয় নিয়ে মত পার্থক্যের সৃষ্টি করছে এবং পরে বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে পড়ছে। তিনি এই সাম্প্রদায়িকতাকে ইসলামের দৃষ্টিতে জাতীয় ঐক্য ও জাতীয় উন্নতির পক্ষে সমুচিন নয় বলে মনে করলেন, এবং কলেমা-এ-তওহীদ এর মূলতন্ত্রে সবাইকে একত্রিত করে জাতীয় ঐক্যের পথে পরিচিত করেন।

স্যার সৈয়দ মুসলিম জাতীয়তাবাদ, মুসলিম ঐক্য ও হিন্দুদের প্রতি মুসলিমদের দৃষ্টি ভঙ্গি ও রীতিনীতি কিরুপ তা ১৮৮৩ সালের ২৩ জানুয়ারী লুঠিয়ানায় এক ভাষনে পরিস্কার ভাষায় তুলে ধরেন। মূলতঃ তিনি বুঝাতে চেয়েছিলেন যে, আমাদের নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) কলেমা ও তাওহীদ এর আত্মিক ও আদর্শভিত্তিক ঐক্য জাতীয়তাবাদ প্রচলন করে স্থান, কাল ও বর্ণ নির্বিশেষে বিশ্বের সকল মুসলমানকে ভাই ভাই করেদিলেন।[৪৩] কিন্তু এর পরও স্যার সৈয়দ খুবই মর্মাহত হয়ে বলেন, এই বিশ্বে রাসুল (সাঃ) এর ভ্রাতৃত্বের আদর্শ সামনে থাকা সত্ত্বেও ভাই ভাইয়ে দেখা দেয় দ্বন্দ, হিংসা, বিদ্বেষ যা জাতীয় ঐক্য ও উন্নতির জন্য ক্ষতি কর।

এ মর্মে তিনি জাতীকে বুঝালেন যে, জাতীয় স্বার্থে সব মতবাদ ভুলে প্রত্যেক মুসলমানকে তাদের নিজস্ব তাওহীদের মূলমন্ত্রে উপনীত করতে হবে এবং মুসলিম জাতীয়তাবাদ গড়ে তুলতে হবে। সুতরাং কে সুন্নী বা শিয়া কে ওহাবী বা বেদাতী, কে মুকাল্লিদ নেচাবী ইত্যাদি এ সব শত্রুতা সৃষ্টি করা মোটেও সাজেনা। শুধুমাত্র এক কলেমায় শরীক বলে ভাই ভাই হয়ে জাতীয় ঐক্য গঠন করা উচিত।[৪৪]

মোটাকথা স্যার সৈয়দ আহমদ মুসলমানকে জাতির উন্নতির জন্য ঐক্যবদ্ধ হওয়ার পরামর্শ দান করেন। কারন তিনি শিয়া ও সুন্নীদের জন্য আলাদা পাঠ্য সূচী প্রবর্তন করলেও আলীগড় কলেজে তাদেরকে আবার একই মসজিদে নামাজ আদায় করার নির্দেশ দেন এবং ছাত্রদের একই বোডিং-এ-বাস করার ব্যবস্থা করে দেন।

Dhaka University Institutional Repository

আলীগড় কলেজের মধ্যে এরকম একটি সুন্দর পরিবেশের বর্ণনা দিতে গিয়ে নওয়াব মুহসিনুল মূলক বলেনঃ

> "সাধারণতঃ আলীগড় কলেজের শিক্ষার্থীরা এমনভাবে বসবাস করত যে, মনে হয় একই পরিবারের কিছু সংখ্যক আত্মীয়স্বজন একত্রে বাস করছে। তাদের মধ্যে ধ্যান-ধারণা ও ধর্মীয় বিশ্বাসের পার্থক্য থাকলেও শিয়া-সুন্নী সহ অন্যান্য ধর্মাবলম্বী সকল শিক্ষার্থী ঐক্যবদ্ধ হয়ে এক জায়গায় আবার নামাজ পড়ে থাকে।"[৪৫]

এই ব্যাপারে জলন্ত দৃষ্টান্ত হলো স্যার সৈয়দ নিজেও তাঁর সুন্নী বন্ধুদেরকে শিয়াদের বিরুদ্ধে কিছু লিখতে বা বলতে নিষেধ করেছিলেন।[৪৬]

সুতরাং আমার মতে শিয়া-সুন্নী, ওহাবী বেতাতী এই সব বির্তকে না গিয়ে শুধুমাত্র মুসলমানদেরকে নিজেদের উন্নতির জন্য ঐক্যবদ্ধ হওয়া একান্ত প্রয়োজন। অন্যথায় মুসলমান জাতি পিছিয়ে পড়বে।

ইংরেজদের সাথে মুসলমানদের বৈরী সম্পর্ক ঃ

মোটকথা ১৮৫৭ সালের আগ থেকেই মুসলমানেরা সাধারণত নিজেদেরকে ইংরেজদের কাছ থেকে দুরে সরিয়ে রাখার চেষ্টা করতো। কিন্তু ৫৭ এর বিদ্রোহের পর ইংরেজ শাসকরাও মুসলমানদের কাছ থেকে নিজেদেরকে দূরে সরিয়ে রাখেন। কারণ তাঁরা সিপাহী বিদ্রোহের জন্য মুসলমানদের দায়ী করেন। ফলে ইংরেজ ও মুসলমান উভয় জাতির মধ্যে সৃষ্টি হয় তিক্ততা ও বৈরীভাব।[৪৭]

মুলতঃ সে সময় ইংরেজদের সাথে খাওয়া দাওয়া ও মেলামেশা করাকে সমাজের আলেম-উলামা ও রক্ষণশীল মুসলমানেরা শরীয়তের দৃষ্টিকোন থেকে জঘন্য পাপ মনে করতেন। এই প্রসঙ্গে স্যার সৈয়দের নিজের একটি ঘটনা থেকে অনুমান করা যায়। তিনি ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহের সময় বিজনৌরের জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ পামারের সাথে একত্রে বসে চা বিস্কুট খেয়েছিলেন।

Dhaka University Institutional Repository

পরে তিনি যখন নাগিনায় ফিরে আসরের নামায পড়ে অবসর হলেন, তখন লোকেরা বলতে লাগলো যে, সদর আমীর সাহেব (স্যার সৈয়দ) ইংরেজদের সাথে চা বিস্কুট খাওয়া করে কাফের হয়ে গেছেন। তাই তাঁর নামাযের কি প্রয়োজন? স্যার সৈয়দ অবাক হয়ে তাদের এই ব্যাপারটি অনুধাবন করলেন এবং পবিত্র কুরআনের আলোকে তাদেরকে বুঝিয়ে দিলেন যে, ইংরেজদের সাথে খাওয়া দাওয়া ও তাঁদের তৈরীকৃত খাওয়া বৈধ।[৪৮]

সমাজের এই রকম চিত্র তুলে ধরে মাওলানা আলতাফ হোসাইন হালী বলেন, অনেক লোক স্যার সৈয়দকে কাফের বলে মনে করত। এছাড়া তাঁর সহকর্মী নওয়াব মুহসিনুল মূলক কে ইংরেজদের সাথে খাওয়া দাওয়া করতে হয়েছিল বলে, লোকেরা তাঁর সাথে চলাফেরা বন্ধ করে দিয়ে ছিল।[৪৯] তখন স্যার সৈয়দ আহমদ খান তৎকালীন সমাজের এই ধরনের প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার উদ্দেশ্যে সায়েন্টিফিক সোসাইটি পত্রিকায় ১৪ সেপ্টেম্বর ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ প্রকাশ করেন এবং বলেন হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) ও সাহাবায়ে কেরামের কার্যাবলী বিবরণ থেকে প্রমাণিত হয় যে, এই ধরনের কর্মকান্ড ইসলামের দৃষ্টিতে বৈধ।

তবে শর্ত হচ্ছে, তাদের খাদ্য তালিকায় হারাম বস্তু (মদ, শুকরের মাংস ইত্যাদি) অর্ন্তভূক্ত না থাকে, তাদের সাথে খাওয়া-দাওয়ায় অংশ গ্রহন করা ইসলামের দৃষ্টিতে বৈর্ধ।

তিনি এই প্রসঙ্গে নিম্ন লিখিত কোরআনের আয়াতটি উল্লেখ করেনঃ

اليوم احل لكم الطيبات وطعام الذين اوتو الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم-[৫০]

এমতাবস্থায় স্যার সৈয়দ বুঝতে পারলেন যে, ইংরেজদের প্রতি এরূপ দৃষ্টি পোষন করা মুসলমানদের জন্য বেশ ক্ষতিকর। তিনি মুসলমানদের সামাজিক ও রাজনৈতিক উন্নতির জন্য আধুনিক শিক্ষা বিস্তারের চাইতে বেশী প্রয়োজনীয়তা মনে করেন ইংরেজদের সাথে সম্প্রীতি স্থাপন করা। কারণ ইংরেজদের সাথ বন্ধুত্ব মূলক আচরন গড়ে না উঠলে মুসলমানদের প্রতি তাদের আন্ত রিকতা ও বিশ্বাস্ততা সৃষ্টি হতে পারে না।

Dhaka University Institutional Repository

ইংরেজ-মুসলিম সম্পর্কে অবনতি নিয়ে স্যার সৈয়দ চিন্তাভাবনা করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, এর পিছনে কিছুটা মনস্তাত্বিক এবং কিছুটা ধর্মীয় কারণ ছিল। রাজনৈতিক কারণ হলো যে, ভারতের শাসন ক্ষমতা ছিল মুসলমানদের হাতে এবং সেই ক্ষমতা ইংরেজরা কেড়ে নেয়। ফলে মুসরমানেরা শিক্ষাদীক্ষায় ও অর্থ সামর্থ্য হারিয়ে দিন দিন অবনতির দিকে তলিয়ে যাচ্ছে। এমতাবস্থায় তারা ধর্মীয় অজুহাত দাঁড় করিয়ে ইংরেজদের বন্ধুত্ব, সাহচার্য্য এবং তাদের আধুনিক শিক্ষাকে বর্জন করে। বরং দিন দিন মুসলমানদের সমস্ত ব্যর্থতা ধর্মীয় কুসংস্কারে লিপ্ত হয়।

এছাড়াও মুসলমানদের মনস্তাত্বিক কারণ বিশ্লেষণ করে স্যার সৈয়দ বলেন, তাঁরা ছিল বাদশার জাত। তাই পরাজয়ের গ্লানি মুছে ফেলার কোন শক্তিই তাদের ছিল না। ফলে ধর্মীয় কুসংস্কার এবং আত্মগরিমা ও জ্ঞানের মিথ্যা অভিমান তাদেরকে উন্নতির পথ থেকে দুরে সরিয়ে রেখেছে।[৫১]

স্যার সৈয়দ আহমেদ শুধু মাত্র ধর্মীয় চেতনা ও নবী প্রেমে আশক্ত হয়ে "খুতবাদ-এ-আহমাদিয়া" গ্রন্থটি রচনা করেন, যার সাথে কোন রাজনৈতিক সম্পর্ক ছিলনা। খুতবাতে আহমদিয়া লিখে স্যার সৈয়দ লাইফ অফ্ মুহাম্মদের দাঁতভাঙ্গা জবাব দিয়েছিলেন।[৫২]

স্যার উইলিয়াম মূর মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর বিরুদ্ধে চার খন্ডে "লাইফ অব মোহাম্মদ" নামক যেই গ্রন্থটি রচনা করেছিলেন, তার প্রতিটি খন্ডে হুজুর (সাঃ) এর ব্যক্তিগত সমালোচনা ছাড়াও ইসলাম ও ইসলামী দর্শনের উপর অসংখ্য মিথ্যা ও ভিত্তিহীন অভিযোগ তুলেন। মোটকথা খ্রীষ্টান লেখক "লাইফ অব মোহাম্মদ" এর মাধ্যমে শুধু মাত্র খ্রীষ্টানদেরকে ইসলাম ও ইসলামের প্রবর্তক মুহাম্মদ (সাঃ) এর সম্পর্কে খারাপ ধারনা দেওয়া হয়নি, বরং আমাদের মুসলিম শিক্ষিত তরুনদেরকেও ইসলাম থেকে দুরে রাখার চেষ্টা করা হয়েছিল।[৫৩]

এই গ্রন্থের উপর আলোচনা করতে গিয়ে বাংলাদেশের বিখ্যাত সাংবাদিক ও "আযাদ" পত্রিকার সম্পাদক মাওলানা মুহাম্মদ আকরাম খান বলেছিলেন, "স্যার সৈয়দ আহমেদ খান গ্রন্থটি লিখে জাতির সত্যিকারের সেবা ও শ্রেষ্ঠতম নেতৃত্ব দিয়েগেছেন"।[৫৪]

Dhaka University Institutional Repository

স্যার সৈয়দ মুরাদাবাদে থাকাকালীন সময়ে "আসবাব-এ-বাগওয়াত-এ-হিন্দ" গ্রন্থটি লিখে সরকার দেশ এবং জাতির কল্যাণ সাধন করেন। কেননা ইংরেজদের ধারণা ছিল যে, মুসলমানগণ যুদ্ধ করতে বদ্ধ পরিকর। তাই তাঁরা ৫৭ এর বিদ্রোহের জন্য দায়ী।[৫৫]

ইংরেজ কর্তৃপক্ষের ভুলবুঝাবুঝির অবসানের জন্য ১৮৬০-৬১ সালে স্যার সৈয়দের দ্বিতীয় পদক্ষেপ ছিল তাঁর "লয়্যাল মোহামেডানস অব ইন্ডিয়া" নামক সাময়িকীর প্রকাশ এতে তিনি ইংরেজ কর্তৃপক্ষেকে বুঝাতে সক্ষম হন যে, ভারতের সব মুসলমান বৃটিশ বিরুদ্ধে নয়। বরং ১৮৫৭ সালে বিদ্রোহের সময় অনেক মুসলমান তাঁদের সাহায্যে এগিয়ে আসেন এবং তাঁদেরকে বিপদ থেকে রক্ষা করেন।[৫৬]

স্যার সৈয়দের ১৮৬২-৬৫ সালে "তাবঈনুল কালাম" এই ব্যাখ্যা গ্রন্থটি ধর্মী দৃষ্টিকোন থেকে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ ছিল। এই তাফসীরের মাধ্যমে তিনি এই কথা প্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছিলেন যে, প্রকৃত পক্ষে সমস্ত ধর্মীয় গ্রন্থ একই উৎস থেকে নিঃসৃত। মানবতার দিক থেকে ও এটি একটি সফল গ্রন্থ। তিনি বাইবেল গ্রন্থটি নির্ভূল প্রমাণ করে পবিত্র কোরআনের মর্যদা বৃদ্ধি করেছেন। কেননা বাইবেলে আমাদের নবী (সাঃ) ও কোরআনের অবতরন সম্পর্কিত অনেকগুলো ভবিষ্যৎ বাণী রয়েছে। এই গ্রন্থের মাধ্যমে তিনি মুসলমানদেরকে উদ্দেশ্য করে বলেন, যদি কোন সম্প্রদায় মুসলমানদের বন্ধু হয়, তাহলে সেটা হবে খ্রীষ্টান সম্প্রদায়। খ্রীষ্টান ও মুসলমানদের মধ্যে সু-সম্পর্ক গড়ে তুলাই ছিল তাঁর এই গ্রন্থ রচনার একমাত্র উদ্দেশ্য।[৫৭]

স্যার সৈয়দ একদিকে খ্রীষ্টান জাতির প্রতি মুসলমানদের ভাল ধারণা সৃষ্টির জন্য "তাবঈনুল কালাম" রচনা করেন, আর অন্যদিকে খ্রীষ্টান জাতিকে ইসলামের সত্য শিক্ষার প্রতি আকর্ষন করান। তিনিই একমাত্র প্রথম মুসলমান ব্যক্তি যিনি সর্বপ্রথম উর্দু ভাষায় কুরআন হাদীসের আলোকে তাওরীত ও ইঞ্জিলের ব্যাখ্যা প্রদান করে বলেন, খ্রীষ্ট ধর্মের সাথে কেবল ইসলামেরই সামঞ্জস্য রয়েছে।

আবার অনুরূপভাবে বর্ণনা দেন যে, খ্রীষ্টানদের একমাত্র প্রকৃত বন্ধু হতে পারে মুসলিম জাতি। এমনি করে স্যার সৈয়দ ইঙ্গ মুসলিম সম্পর্কের উন্নতির জন্য কুরআন ও হাদীসে যে নির্দেশ রয়েছে তা তাঁর রচনার মাধ্যমে সেগুলি পুনারাবৃত্তি করেন।[৫৮]

Dhaka University Institutional Repository

যেহেতু স্যার সৈয়দের একমাত্র আশা ছিল বাইবেলের ব্যাখ্যা রচনা করে খ্রীষ্টান ও মুসলামন ধর্মের মধ্যে যত রকম বিরূপ ধ্যান-ধারণা আছে তার অবসান করা। সেহেতু তিনি "খুতবাত এ আহমদিয়া" নামক গ্রন্থে খ্রীষ্টান জগতের সামনে ইসলামের সামাজিক বিধিবিধানের সমস্ত মহত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করেন। কেননা খ্রীষ্টান লেখকরা ইসলামের সামাজিক ব্যবস্থা তথা একাধিক বিবাহ, তালাক, জিহাদ ও অন্যান্য বিষয়ে নানা প্রশ্নের অবতারনা করেন। এই জন্যই স্যার সৈয়দ ইসলামের সত্যতাকে সর্বত্র তুলে ধরেন। এ উদ্দেশ্যে ১৮৫৮ সালে লাহোরে আঞ্জমানে ইসলামিয়া আয়োজিত এক ভাষনে তিনি বলেনঃ

> "মোটকথা খ্রীষ্টান, ইহুদী ও হিন্দুরা হলো আমাদের প্রকৃত বন্ধু। তাই আমরা তাদের সাথে বন্ধুত্ব সুলভ ব্যবহার করব। কিন্তু তাদের ধর্মকে সত্য বলে মনে করবো না। বরং আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করব যাথে আমাদের এসব বন্ধুরা ইসলামের পথে অগ্রসর হয়। এ ছাড়া তাদের অন্তরকে আমাদের ধর্মের দিকে আকৃষ্ট করতে হবে।"[৫৯]

ইংরেজ ও মুসলমানদের সম্পর্ক ভাল করার জন্য স্যার সৈয়দ নিজেও বিজনৌরে থাকাকালীন সময়ে ইংরেজদের সাথে খাওয়া দাওয়া শুরু করেছিলেন।[৬০] স্যার সৈয়দের "আহকামে-এ-তাআমে-এ-আহলে কিতাব" নামক পুস্তকটি রচনার ফলে ইংরেজদের সাথে খাওয়া দাওয়ার ব্যাপারে মুসলমানদের মধ্যে যে কুসংস্কার ছিল তা অনেক বেশী কমে যেতে থাকে।[৬১] অতঃপর একজন খ্রীষ্টান বুদ্ধিজীবি ও লেখক হান্টার ১৮৭১ সালে "ইন্ডিয়ান মুসলমান" নামক একটি গ্রন্থ রচনা করে আবারও ইংরেজ ও মুসলমানদের মধ্যে ঘৃণা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি করেছেন।[৬২]

১৮৫৭ এর পর থেকেই স্যার সৈয়দ ইঙ্গ মুসলিম সম্পর্কের এর জন্য চেষ্টা চালিয়ে আসছিলেন। ঠিক এমন সময় হান্টারের এ রচনাটি দেখে তিনি খুবই দুঃখিত হন। ফলশ্রুতিতে স্যার সৈয়দ ডক্টর হান্টারের গ্রন্থের পর্যালোচনা শীর্ষক একটি পুস্তিকা প্রকাশ করে তার ভুল ধারণার অবসান ঘটান। কেননা ইসলাম কখনও ইংরেজদের বিরুদ্ধে জিহাদ বা বিদ্রোহ করার অনুমতি দেয় না।[৬৩]

Dhaka University Institutional Repository

স্যার সৈয়দ নিজে কর্মজীবনে খ্রীষ্টানদের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণ করতেন এবং মিঃ বেককে বহুদিন পর্যন্ত আলীগড়ে কলেজের অধ্যক্ষ পদে রেখেছিলেন। এমনকি শিক্ষা ও প্রশাসনিক কার্যে ইংরেজদের প্রাধান্য দিয়ে ইঙ্গ মুসলিম সম্পর্কের উন্নতি সাধন করাই ছিল তাঁর কলেজ প্রতিষ্ঠার একমাত্র লক্ষ্য। তিনি ১৮৮৯ সালে "মুসলিম এডুকেশন্যাল কনফারেন্স" এর চতুর্থ অধিবেশনে বলেনঃ

> "আমার আলীগড় কলেজ প্রতিষ্ঠার একমাত্র লক্ষ্য হলো ইংরেজ ও মুসলমানদের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক এবং পরস্পরের হিংসা-বিদ্বেষ ও কুসংস্কার দূর করা। এছাড়া আমি মনে করি এর মাধ্যমে বিরাট সাফল্য অর্জিত হয়েছে। আর এ সাফল্যের পিছনে কলেজের ইউরোপীয় অফিসারগণ পিতৃসুলভ ও বন্ধুত্বমুলক আচরন করে থাকেন।"[৬৪]

"আসবাব-এ-বাগওয়াত-এ-হিন্দ" নামক গ্রন্থে স্যার সৈয়দ ভারতবাসীদের প্রতি ইংরেজ কর্তৃপক্ষের বিদ্বেষ মূলক আচরণ ও তাদের হীনমনোভাব এর সমালোচনা করেন। তিনি কেবল ভারতবাসীকে ইংরেজদের দিকে এগিয়ে যেতে বলেননি, পাশাপশি ইংরেজদেরকে ও ভারতবাসীর দিকে এগিয়ে আসতে বলেছিলেন। এমনকি তিনি ইংরেজ সরকারকে ভারত বাসীর সাথে সহানুভুতিশীল সম্পর্ক তৈরী করার পরামর্শ দিয়ে থাকেন।[৬৫]

তারপরও ইঙ্গ-মুসলিম সম্পর্ক ভাল মত গড়ে উঠেনি, কিন্তু একথা স্বীকার করতেই হবে যে, মুসলিম সমাজে যে পরিবর্তন সাধিত হয় এবং ইংরেজদের সাথে যে সম্পর্ক গড়ে উঠে তা ৫৭ এর পরে চল্লিশ বছর সময়ে। এ প্রসঙ্গে হালীর ভাষায় হয়তো এক শতাব্দীতেও সম্ভবপর হতোনা যদি না স্যার সৈয়দ এর এইরুপ পদক্ষেপ না থাকতো।[৬৬]

আসলে ইংরেজ মুসলিম সম্পর্কের উন্নতি হলো স্যার সৈয়দের সর্বপ্রথম সামাজিক অবদান। মোটকথা স্যার সৈয়দ আজীবন মুসলমান জাতির মঙ্গল সাধনায় লিপ্ত ছিলেন। এ লক্ষ্যে তিনি ইংরেজদের মনে মুসলমানদের স্থান করার জন্য "আসবাবে বাগাওয়াত হিন্দ" গ্রন্থটি লিখে সাহসিকতার পরিচয় দেন। তারপর তিনি "লয়্যাল মোহামেডান অব ইন্ডিয়ান" নামে পুস্তিকা লিখে ইংরেজদের ভুল ধারনা দুর করার চেষ্টা করেন।

Dhaka University Institutional Repository

এছাড়া "খুতবাতে আহমদিয়া" লিখে স্যার সৈয়দ "লাফই অব মুহাম্মদের" দাঁত ভাঙ্গা জবাব দেন। আসলে তাঁর এক মাত্র লক্ষ ছিল মুসলমানদের প্রতি ইংরেজদের ভুল ধারণা দুর করা।

মুসলমানদের সাথে কাফেরদের সম্পর্ক ঃ

স্যার সৈয়দের মতে, ভালবাসা দুই ধরনেরঃ (এক) ঈমানী ভালবাসা, (দুই) মানবিক ভালবাসা। তবে মুসলমানদের জন্য বৈধ হলো, যে কোন ধর্মালম্বীর সাথে বন্ধুত্ব গড়ে তোলা। কিন্তু কাফের বা বিধর্মীর সাথে কোন মুসলমানই ঈমানী ভালবাসা গড়ে তুলতে পারেনা। আবার ধর্মীয় দৃষ্টিকোন থেকে বা আর্দশগত ভাবে কাফেরের সাথে বন্ধুত্ব গড়ে তোলা মুসলমানের পক্ষে হারাম।[৬৭]

কিন্তু আবার বিধর্মীদের সাথে প্রকৃতিগত ও মানবিক ভালবাসা স্থাপন করতে কোন দোষ নেই। কেননা এ প্রকারের ভালবাসা হলো প্রকৃতিরই বহিঃপ্রকাশ। আর ইসলাম ধর্ম প্রকৃতি বিরোধী নয়। কাজেই মানবিক দিক দিয়ে কাফের বা বিধর্মীর সাথে লেনদেন করা, সদাচরণ করা, সামাজিক সম্পর্ক ও সাহায্য সহানুভুতি গড়ে তোলা নিষিদ্ধ কোন কাজ নয়।[৬৮]

মুসলমানদের সাথে কাফেরের সম্পর্কের প্রেক্ষিতে বিখ্যাত ইমাম রাযী তার "তাফসীর কবীর' গ্রন্থে বলেন কাফেরের সাথে বন্ধুত্বকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন ১) কাফেরের কুফুরীকে ভালবাসা, মানে এ রকম বন্ধুত্ব নিষিদ্ধ ও নাস্তিকতার শামিল। ২) বৈষয়িক ক্ষেত্রে কাফেরের সাথে বাহ্যিক সদাচরন করা, মানে এ বন্ধুত্ব ধর্মীয় দৃষ্টি কোন থেকে অবৈধ নয়। ৩) কাফেরের ধর্ম গ্রহন যোগ্য নয় তারপরও তাঁর প্রতি ঝুঁকে পরা এবং তাকে সাহায্য করা, এ ধরনের বন্ধুত্ব নিষিদ্ধ তবে নাস্তিকতা নয়।[৬৯]

বস্তুত ঈমানী ভালবাসা কখনও কাফেরের ষড়যন্ত্রের কাছে নতি স্বীকার করে না। আর মানবিক ভালবাসা হলো অন্যের প্রতি সহানুভুতি প্রকাশ করা। তাই মানবিক কারনে ইসলামের অনুসারীগণ কাফের বা বিধর্মীর সাথে বন্ধুত্ব করতে পারেন।

Dhaka University Institutional Repository

সমাজের নানা সংস্কার ও তার ধরন প্রকৃতি ঃ

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম থেকেই হিন্দু সমাজে একের পর এক সমাজ সংস্কারক এর আর্বিভাব হতে থাকে। এসব সংস্কারকেরা সমাজে নানা ভুল ত্রুটি সমস্যা সমাধানের চেষ্টা অব্যাহত রাখেন। রাজা রাম মোহন রায়, বাবু কেশব চন্দ্র সেন, শ্রীল চন্দ্র ভট্টাচায, ইশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, স্বামী দয়ানন্দ্র সরস্বতী প্রমুখ সংস্কারকগণ বিশেষ ভাবে খ্যাত।

কিন্তু এ শতাব্দীর প্রথমার্ধে শাহ ইসমাইল শহীদ ও শাহ সৈয়দ আহমদ শহীদ ছাড়া দিল্লীতে আর কোন সমাজ সংস্কারক মুসলিম সমাজে তেমন একটা দেখা যায় না। তবে ১৭৮১-১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দে হাজী শরীয়তুউল্লাহর ফরায়েযী আন্দোলন সমাজ সংস্কার মূলক হলেও তা ছিল বাংলার কিছু অংশে সীমাবদ্ধ। আবার তিঁতুমীরর ১৭৮২-১৮৩১ খ্রীঃ সমাজ সংস্কার ধর্মী স্বাধীনতা আন্দোলনটি ছিল সৈয়দ আহমদ শহীদের সংস্কার আন্দোলন স্বরূপ।[৭০]

আসলে ইসমাইল শহীদ ও সৈয়দ আহমদ শহীদের সমাজ সংস্কারের মাধ্যমে ছিল ইসলামী ধর্মভিত্তিক। মূলতঃ শির্ক ও বেদাতের বিরুদ্ধে, কুপ্রথা ও অন্ধবিশ্বাসের বিরুদ্ধে। মোটকথা ইসলামী সভ্যতার জন্য।[৭১]

অথচ স্যার সৈয়দ ১৮৫৭ সালে এর পরে সমাজ সংস্কারের ক্ষেত্রে নতুন দৃষ্টি ভঙ্গি নিয়ে আবির্ভূত হন। শাহওলীউল্লাহ ও তাঁর উত্তরাধীকারের কাছ থেকে স্যার সৈয়দ সমাজ সংস্কারের প্রেরনা লাভ করলেও তাঁর সংস্কারের লক্ষ্যে ছিল ইউরোপীয় তহ্যীব তমদ্দুনভিত্তিক। তাঁর একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল মুসলমানদের কে ইউরোপীয় লোকদের তুচ্ছ তাচ্ছিল্যের উর্ধ্বে রাখা।[৭২]

সুতরাং এ কথা বলা যায় যে, পশ্চাৎপদ মুসলিম সমাজের ভাগ্যোন্নয়নের জন্য মুসলিম জাগরণের উদ্দেশ্যে সমাজ সংস্কারকগণ অজ্ঞতা, কুসংস্কার ও গোঁড়ামির বিরুদ্ধে সচেতনতা সৃষ্টি করে মুসলমানদের হৃত গৌরব পুররুদ্ধারে চেষ্টা করেন।

Dhaka University Institutional Repository

ইউরোপীয় রীতি নীতি গ্রহন ঃ

স্যার সৈয়দ ভারতীয় মুসলমানদেরকে ইউরোপীয় তমদ্দুন গ্রহন করার পরামর্শ দান করেন। কারণ তাঁর একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল ইঙ্গ-মুসলিম সম্পর্ক স্থাপন। ইংরেজ জাতি মুসলিম সংস্কৃতির রীতি নীতির প্রতি যে হীনতা প্রদর্শন করে নানা ধরনের কুটক্তি করতো এবং মুসলিম জাতিকে হেয় চোখে দেখতো। এই রকম পরিস্থিতির জন্যই স্যার সৈয়দ মনে করতেন, ইউরোপীয় সভ্যতা গ্রহনের মধ্যেই সার্বিক কল্যাণ নিহিত রয়েছে।[৭৩]

স্যার সৈয়দ আহমদ মুসলমানদের সামাজিক সাংস্কৃতিক পূর্ণজাগরনের লক্ষ্যে নিজেকে উৎসর্গ করেন। প্রাশ্চাত্য শিক্ষা বিজ্ঞানকে গ্রহন করার জন্য তিনি মুসলমানদের আহবান করেন। তিনি বুঝেছিলেন যে, মুসলমানদেরকে প্রাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলতে না পারলে হিন্দুদের সাথে প্রতিযোগীতায় সমাজ জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাঁরা পিছিয়ে থাকবে। এছাড়া আধুনিক শিক্ষা ও ইসলামের মধ্যে কোন বিরোধ আছে বলে তিনি শিকার করতেন না। হার্ডি বলেনঃ

In fact the aimed to shouw that Islam was mordern progress and mordern progress was Islam properly understood.[৭৪]

ইংরেজ জাতির এই চক্ষুশোলের কারণে স্যার সৈয়দের মনে গভীর ক্ষতের সৃষ্টি হয় এবং এর থেকে মুক্তির উপায়ে তিনি দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হয়ে উঠেন।

এই জন্যই তিনি তাঁর "তাহযীবুল আকলাক" এর প্রথম সংখ্যার ভূমিকায় বলেনঃ

> "পশ্চিমা সভ্য জাতি সমূহ মুসলমানদের যেভাবে অবহেলা ও অবজ্ঞার চোখে দেখে তা থেকে ভারতের মুসলমানদের মুক্ত করতে হলে উন্নত অর্থাৎ পশ্চিমা সভ্যতা গ্রহনে উৎসাহিত করতে হবে। তাহলে মুসলমান পৃথিবীতে সম্মানিত ও সভ্য জাতি হিসাবে অধিষ্ঠিত হয়"।[৭৫]

Dhaka University Institutional Repository

আসলে একটি সম্পূর্ণ আলাদা জাতির তমদ্দুন গ্রহন যাতে অন্ধের মত না হয় সে জন্য স্যার সৈয়দ ১৮৭০ সালে সতকর্তা অবলম্বনের তাগিদ করে বলেন ঃ

> "ভিন্ন জাতির রীতি নীতিকে গ্রহন করা অবশ্য উদার মানসিকতা ও জ্ঞানের প্রসস্থতা বলে মনে করা হয়। কিন্তু তাই বলে যদি বাছ বিচার ছাড়াই গ্রহন করা হয় তাহলে হবে বোকামির শামিল।"[৭৬]

এই লক্ষ্যে ১৮৬৬ সালে "সায়েন্টিফিক সোসাইটির" এক ভাষনে স্যার সৈয়দ সভ্যতার ব্যাপারে অনেকটা রক্ষণশীলতার পরিচয় দেন। তিনি সে ভাষনে আপন ঐতিহ্য রূপে ভারতের আদব-কায়দা গুলিকে ধরে রাখার জন্য উৎসাহিত করেন। তবে তিনি লন্ডন সফরের পূর্বে ইউরোপীয় তমদ্দুন প্রচারে আগ্রহী ছিলেন না।[৭৭]

তিনি ১৮৭০ সালের শেষ দিকে ভারতে "তাহযীবুল আখলাক' নামক একটি পত্রিকা প্রকাশ করেন। তিনি এই পত্রিকার মাধ্যমে নৈতিকতা ও আচার ব্যবহার উন্নতির জন্য অভিযান শুরু করেন। এমনকি মুসলমানদেরকে প্রাশ্চাত্যের আচার ব্যবহার অনুযায়ী চলার জন্য পরামর্শ দান করেন।[৭৮]

স্যার সৈয়দ মনে করতে যদি সামাজিক জীবনে শাসক ও শাসিতের মধ্যে মিল সৃষ্টি করা যায় তবেই সহজেই শাসক কর্তাদের শুভ দৃষ্টি লাভ করা যায়। তাই জীবনের শেষ সময়ে এসেও তিনি মুসলিম সমাজ ইউরোপীয় সভ্যতা প্রচারে আগ্রহী হয়ে উঠেন। কিন্তু তাঁর এ উৎসাহ প্রদানের একমাত্র লক্ষ্য ছিল জাতীয় উন্নতির সাধন এবং জাতিকে ইংরেজদের অবহেলা থেকে রক্ষা করা। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেনঃ

> "যতদিন শাসক ও শাসিতের মধ্যে একটি সুন্দর সমঝোতা গড়ে না উঠবে ততদিন তাদের পারস্পরিক বন্ধুত্ব অসম্ভব। ফলে সামঞ্জস্য না থাকার কারণে আজও ভারতের শাসক ও শাসিতের মধ্যে পারস্পরিক সম্প্রীতি গড়ে উঠেনি। তাই আমাদের সামাজিক রীতিনীতি, কর্মকান্ড, জ্ঞান চর্চা ও রাষ্ট্রীয় চিন্তাভাবনা এমনভাবে গড়ে তুলতে হবে যাতে শাসক ও শাসিতের মধ্যে সামঞ্জস্য সৃষ্টি হয়।"[৭৯]

Dhaka University Institutional Repository

তৎকালীন সময়ে হিন্দুরা ইউরোপীয় পোষাক পরিচ্ছদ গ্রহন করেছিল ধাপে ধাপে। তাই তাদের কাছে তা অস্বাভাবিক মনে হয় নি। কিন্তু স্যার সৈয়দ তা শিক্ষিতমুসলিম সমাজে চালু করার জন্য একটি কর্মসূচী হিসাবে পরিচালনা করেন।[৮০]

ফলে তাঁর এই কর্মসূচী নিজ জাতির পক্ষ থেকে বিরোধীতার সম্মুখীন হয় এবং তাঁর শিক্ষা কর্মসূচী অনেকটা বাধা গ্রস্থ হয়। পরবর্তীকালে দেখা যায় হিন্দুরা অসহযোগ আন্দোলনের অজুহাতে ইউরোপীয় পোষাক পরিচ্ছদ বর্জন করে আর মুসলমানেরা দারিদ্র্যের চাপে তা ত্যাগ করে। অন্যদিকে দেখা যায়, স্যার সৈয়দের ইউরোপীয় তমদ্দুন প্রচারের ফলে বেশ উপকার সাধিত হয়। যেমনঃ ইংরেজ ও ভারতীয়দের সম্পর্ক বেড়ে যায়, বিশেষত মুসলমানরা পাশ্চাত্য শিক্ষাদীক্ষার প্রতি গোঁড়ামী ত্যাগ করে, এমনকি ভাল দিককে গ্রহন করা আর মন্দকে পরিহার করার স্পৃহা জাগে।

ইউরোপীয় তমদ্দুন সম্পর্কে মাওলানা হালী বলেনঃ

> স্যার সৈয়দ মুসলমানদের একটি শ্রেণীকে কুসংস্কার ও দেশে প্রচলিত রীতি-নীতির দাসত্ব থেকে মুক্ত করেছেন। তবে আমাদের অবস্থার প্রেক্ষিতে ইংরেজদের এই জীবন পদ্ধতি কতটা গ্রহনযোগ্য তা বিচার সাপেক্ষে। কিন্তু সমাজের কোন রীতি ইতিবাচক আর কোন রীতি নীতিবাচক তা বুঝার ক্ষমতা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে।[৮১]

মূলতঃ তিনি ১৮৬৪ সালে প্রথমে "Translation Society" গঠন করেন। পরে এটি "সায়েন্টিফিক সোসাইটি" নামে পরিচিত হয় এবং এর মাধ্যমে প্রাশ্চাত্য জ্ঞান বিজ্ঞানকে শিক্ষিত মুসলমানদের কাছে পৌছে দেওয়াই ছিল যার লক্ষ্য।[৮২]

অতএব তিনি মুসলমানদের মধ্যে আধুনিক শিক্ষাবিস্তার, ইংরেজির মাধ্যমে পাশ্চাত্য শিক্ষা গ্রহন, মন-মানসিকতা ও মূলবোধে যুগোপযোগী পরিবর্তন সাধন এবং প্রগতি অর্জনে এক নব জাগরণের সূত্রপাত ঘটান।

Dhaka University Institutional Repository

প্রয়োজনের জন্যই সমাজের সংস্কার ঃ

স্যার সৈয়দ আহমেদ ছিলেন একজন সমাজ চিন্তাবিদ ও সমাজ দার্শনিক। তাই তাঁর সমাজ সংস্কারের ক্ষেত্রে সব চাইতে বড় অবদান হলো ইঙ্গ-মুসলিম বন্ধুত্ব প্রতিষ্ঠা। তিনি মুসলিম সমাজের সার্বিক সংস্কারের ক্ষেত্রে দুটি কাজ করেছিলেনঃ (১) ভিত্তিহীন ধর্মীয় ধ্যান ধারণার সংস্কার সাধন এবং (২) আধুনিক শিক্ষার প্রচলন।

তিনি তাঁর তাহযীবুল আখলাক এর প্রথম সংখ্যার সূচনায় বলেনঃ

> "ইহুদী, খ্রীষ্টান এবং হিন্দুদের অসংখ্য প্রথা পদ্ধতি ধ্যান ধারণা আচার আচরন ধর্মীয় বিশ্বাস আমাদের মুসলিম সমাজে প্রবেশ করেছে। তাই আমাদের মন মেজাজে অনেক ভুল ধারণার জন্ম হয়েছে যার সাথে ইসলামের কোন মিল নেই। ফলে বিজাতিরা ইসলামের এই অবস্থাকে মনে করে মৌলিক ইসলাম বলে, তাই ইসলাম সম্পর্কে ঘৃণাসূচক মন্তব্য করে থাকে।"[৮৩]

স্যার সৈয়দের ধর্মীয় সংস্কারের একমাত্র কারণ হলো যে, মুসলমানদের সামাজিক দোষত্রুটি মূলতঃ ধর্মীয় কুসংস্কারের লিপ্ত ছিল। তিনি মনে করতেন কোন জাতির সভ্যতা অর্জনে ধর্ম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আবার কোন কোন ধর্ম জাতির সভ্যতা অর্জনের পথে বাঁধা হয়ে দাঁড়ায়।[৮৪]

সে সময়কার সাধারণ মুসলমানরা ধর্মীয় নিদের্শ মনে করে কত গুলো ধারণা পোষণ করতো যার সাথে ধর্মের কোন সম্পর্কই ছিল না। যথাঃ ইংরেজী শিক্ষা দীক্ষা, ইংরেজী পোষাক পরিচ্ছদ, ইংরেজদের সাথে খাওয়া দাওয়া মেলা-মেশাকে অবৈধ বলে মনে করা হতো। এমতাবস্থায় স্যার সৈয়দ "তাহযীবুল আখলাক" পত্রিকার মাধ্যমে জাতির সামনে ইসলামের সঠিক শিক্ষা এবং রাসুলুল্লাহ (সাঃ) ও খুলাফায়ে রাশেদীন যুগের খাঁটি ইসলাম তুলে ধরার দায়িত্ব গ্রহন করেন। এছাড়া তিনি মুসলমানদেরকে একটি রাজনৈতিক জাতি হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করার জন্যই সমাজ সংস্কার তথা ধর্মীয় সংস্কারের ব্যাপারে হাত দেন।

Dhaka University Institutional Repository

আর এ জন্যই তিনি একটি পথ বেছে নিয়েছিলেন যা হলো আধুনিক পাশ্চাত্য শিক্ষা বিস্তারের পরিকল্পনা ও তাঁর বাস্তবায়ন। এটাকে তিনি জাতির চিকিৎসার ঔষধ হিসাবে মনে করে সামাজিক দোষ ত্রুটি গুলি স্বাভাবিকভাবে জাতির কাছে তুলে ধরেন।[৮৫]

সুতরাং একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, ইংরেজদের রোষানল থেকে রক্ষা, মুসলমানদের ইংরেজী শিক্ষা ও পাশ্চাত্য সংস্কৃতি বর্জন, মুসলমানদের হতাশা, হিন্দুদের উন্নতি এবং মুসলমানদের সাংস্কৃতি অনগ্রসরতা ও গোঁড়ামির প্রেক্ষাপটে তাঁর এই সংস্কার কার্যক্রম।

জাতির নিম্ন লিখিত বিষয়ে সংস্কারের প্রয়োজন ঃ

ভারতীয় মুসলমানদের অবস্থার প্রেক্ষিতে স্যার সৈয়দ বলেন, নিম্নলিখিত বিষয়ে সংস্কার ও সংশোধন হওয়া উচিতঃ

১। **মতামত প্রদানের স্বাধীনতা ঃ** জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে মুসলমানদের চিন্তাধারা, সংকীর্ণ হয়ে পড়েছে। তাই মুসলমানদের মধ্যে উন্নতি কোন চিন্তা চেতনা জাগ্রত হয় না। ফলে যতদিন পর্যন্ত তাদের মনে স্বাধীন চিন্তা চেতনার বহিঃ প্রকাশ না হবে ততদিন তাদের কাছ কোন তহযীব তমদ্দুনের কথা আশা করা যায় না।

২। **ধর্মীয় বিশ্বাসের সংশোধনী ঃ** যেহেতু ভারতীয় মুসলমানদের মনে কতগুলো ভ্রান্ত ধারণা রয়েছে। কিন্তু সে সব ধারণার কথা তাদের ধর্মীয় গ্রন্থে কিছু নেই। অথচ তাদের মনে স্থান করেছে শির্‌ক জনিত হাজারো বিশ্বাস। কাজেই তদের ধর্মীয় বিশ্বাসকে সত্যিকার ইসলামী বিশ্বাসেই পরিণত করাই হলো তহযীব তমদ্দুন লাভের একমাত্র পথ।

৩। **ধর্মীয় কার্যাবলী ও চিন্তাধারা ঃ** তহযীব লাভ করতে হলে বিদাত, শির্‌ক, নাস্তিকতা ধ্যন ধারণা বা আচার অনুষ্ঠানের সংশোধন করা প্রয়োজন। কেননা ভারতীয় মুসলমানদের মধ্যে এ ধরনের শত অন্ধ বিশ্বাস রয়েছে। যার সাথে ধর্মের কোন সম্পর্ক নেই। অথচ এগুলোকে তাঁরা যথারীতি পালন করে থাকে চিন্তা ধারার মধ্যে থেকে।

Dhaka University Institutional Repository

৪। **ধর্মের ব্যাপারে সুক্ষ্ম বিচার বিশ্লেষণ ঃ** শান্তির ধর্ম ইসলামে কতগুলো বিষয় রয়েছে, যা সত্য ও যুক্তি সম্মত। কিন্তু এ গুলোর সুক্ষ্ম বিচার বিশ্লেষণ না করলে তা যুক্তি শাস্ত্র ও সভ্যতার পরিপন্থী বলে মনে হয়। তাই ধর্মীয় বিষয়ে সঠিক ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করতে হবে।

৫। **জাতির ধর্মীয় বিষয়ে সঠিক ব্যাখ্যা প্রদান ঃ** যেহেতু জাতির সভ্যতা রচনায় ধর্ম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। তাই ধর্ম যতবেশী ত্রুটিপূর্ণ হবে তার সভ্যতা ততবেশী অনুন্নত থাকবে। এ ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী ধর্মীয় বিষয়ের ব্যাখ্যায় ভুলের শিকারে পরিনত হলে তার সঠিক ব্যাখ্যা প্রদান করতে হবে।

৬। **শিশুর জন্য শিক্ষা ঃ** শিক্ষা হলো ধর্মের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তাই অতীত ও বর্তমানের প্রতি দৃষ্টিপাত করে শিশুদের জন্য এমন একটি শিক্ষার পরিবেশ গড়ে তুলতে হবে। যাতে ধর্মীয় ও পার্থিব উভয় ক্ষেত্রে উচ্চ শিক্ষা লাভের পথ প্রস্তুত হয়।

৭। **শিক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় উপকরন ঃ** শিক্ষার জন্য উপকরণের ব্যবস্থা করতে হবে। কেবল শিক্ষা পদ্ধতি চালু করলেই হবে না। এর জন্য পারস্পরিক সহযোগিতা, সমষ্টিগত চেষ্টা ও দানের ব্যবস্থা থাকতে হবে।

৮। **নারী শিক্ষা ঃ** জাতীয় সভ্যতা অর্জন করতে হলে নারী শিক্ষা অপরিহার্য। তাদের জন্য শিক্ষাও হস্তশিল্পে সুযোগ সুবিধা থাকা প্রয়োজন।

৯। **শিল্প ও কারিগরি শিক্ষা বিস্তার ঃ** জাতীয় জীবনে প্রকৌশল, শিল্প ও কারিগরি শিক্ষার বিস্তার ও এর উন্নতি সাধন হলো জাতীয় উন্নতির একটি বড় মাধ্যম।

১০। **স্বার্থতার অভাব ঃ** মুসলিম জাতির সবচেয়ে বড় দোষ হলো স্বার্থপরতা। কেননা স্বার্থপরতা জাতীয় ও ব্যক্তিগত জীবনে ধ্বংস ডেকে আনে। এছাড়াও জাতীয় অবহেলা ও সভ্য না হওয়ার পিছনে প্রথম কারণ হলো স্বার্থপরতা।

Dhaka University Institutional Repository

১১। **প্রতিযোগিতা ও আত্মমর্যাদা বোধের প্রেরণা ঃ** আত্মমর্যাদা ও প্রতিযোগিতার আশা পরস্পর ও তপ্রোতভাবে ঘনিষ্ট। কিন্তু মুসলিম জাতির মধ্যে এই দুটির বড়ই অভাব রয়েছে। তাঁরা প্রতিযোগিতা করে ফাতেহা, বিয়ে-শাদী, চেহলাম ইত্যাদিতে ঋণ করে অর্থ ব্যয় করে। কিন্তু ইজ্জত বৃদ্ধির জন্য সৎকার্যে ব্যয় করা ভাল। কেননা আত্মমর্যাদাবোধ থেকেই প্রতিযোগিতার প্রেরণা যোগায়। এই প্রেক্ষিতে স্যার সৈয়দ খুবই দুঃখ করে বলেনঃ

> "আদর্শগত ভাবে আত্মসম্মানবোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে অপকর্ম থেকে বিরত আছে
> এমন মুলমান দেখা যায় না।"

মোট কথা তিনি মুসলিম জাতির মধ্যে সুস্থ বিবেক এবং আদর্শ বোধ সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন।

১২। **সময় নিষ্ঠা ঃ** সময়নিষ্ঠা জাতীয় সভ্যতার অন্যতম উপাদান। তাই প্রত্যেকেরই ব্যক্তিগত ও জাতীয় কর্তব্য সাধনে সময় নিষ্ঠ হওয়া উচিত।

১৩। **শিষ্টাচার ও সদ্ব্যবহার ঃ** সদ্ব্যবহার, শিষ্টাচার ও বিনয় এ গুলো মানুষের মানবীয় গুন। অথচ মুসলমানদের জাতীয় স্বভাবে পরিণত হয়েছে তোষামদ, খোশামোদ ও কৃত্রিম ভালবাসা প্রদর্শন করা।

১৪। **সত্যবাদিতাঃ** স্যার সৈয়দ বলেনঃ হাসতে হাসতে মিথ্যুক বললে মানুষের মন থেকে মিথ্যার জঘন্যতা আস্তে আস্তে লোপ পায়। ফলে তারা মিথ্যা বলতে আর ভয় করে না। সুতরাং পার্থিব কাজ কর্মে সত্য কথা বলে গৌরব বোধ করা উচিত।

১৫। **কথার মধ্যে ভদ্রতা ঃ** সংস্কৃতির একটি বড় অঙ্গ হলো ভদ্রতা। তাই কথা রার্তায় ভদ্র ভাষা ব্যবহার করা অপরিসীম।

১৬। **জীবন চলার পদ্ধতি ঃ** জীবনে চলার পদ্ধতি সম্পর্কে স্যার সৈয়দ দুঃখ করে বলেন, আমাদের জাতির যে জীবন পদ্ধতি চালু আছে তা এত কষ্টের যে, পৃথিবীতে অনেক জীবজন্তুর জীবন পদ্ধতিও এর চাইতে অনেক ভাল।

Dhaka University Institutional Repository

১৭। **কথা বলার ভঙ্গি** ঃ একজন মানুষের বাচন ভঙ্গি ককর্শ হওয়া মানে অসভ্যতার চিহ্ন। সুতরাং সভ্যতার জন্য এদিকে ও লক্ষ্য রাখা দরকার।

১৮। **বন্ধু বান্ধবের সাথে মেলামেশা** ঃ প্রত্যেকেরই বন্ধু বান্ধবের সাথে ভাল আচার ব্যবহার করা উচিত। অনেকে বন্ধুবান্ধবের সাথে পশুর মত আচার ব্যবহার করে থাকে যা সংস্কার করা একান্ত প্রয়োজন।

১৯। **পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা** ঃ হাদীসে আছে "পবিত্রতা ঈমানের অঙ্গ"। সুতরাং নিজ শরীর, বাড়ী এবং পোষাকের পরিচ্ছন্নতা রক্ষা তহযীবের অঙ্গ। এই বিষয়ে মুসলমানদের খেয়াল খুবই কম। তাই তাদের এ বিষয়ে খেয়াল রাখতে হবে।

২০। **বিবাহ রীতি নীতি** ঃ মূলত মুসলমানদের সমাজে বিয়ে সাদীর উৎসব পালনের যে, রীতিনীতি চালু আছে তাঁর কোনটাই ইসলাম সম্মত নয়।

২১। **পোষাক পরিধানের ধরন** ঃ একটি জাতি যতই সভ্য হবে, তাঁর পোষাক ততই সভ্য হবে। এক্ষেত্রে পোষাকের কাটছাট ভাল হওয় সভ্যতারই চিহ্ন। সুতরাং মুসলমানদের চিন্তা করতে হবে তাদের পোষাকে কি সংশোধন হওয়া প্রয়োজন।

২২। **পারিবারিক জীবন** ঃ মুসলমানদের পারিবারিক জীবনে অশান্তি ও বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। তাই তাদেরকে ইসলামের আলোকে এগুলোর সংস্কার ও উন্নতি করা দরকার।

২৩। **আহার পদ্ধতিঃ** মুসলিম সমাজে খাওয়ার রীতি-নীতি দেখে স্যার সৈয়দ বলেন, পরিস্কার পরিচ্ছন্ন ভালো, তবে বেশী পরিস্কার পরিচ্ছন্ন জাতির বমির কারণ না হয়ে পারে না।

Dhaka University Institutional Repository

২৪। **নারী কল্যাণ ঃ** নারী জাতির কল্যাণ সাধনের জন্য তাদের অবস্থার আরো উন্নতির প্রয়োজন এবং তাদের প্রতি পুরুষের যে ব্যবহার প্রবর্তিত আছে তাঁর ও সংস্কার করা জরুরী। কেননা বিজাতিরা মুসলমান নারী জাতির প্রতি ভুল ধারণা পোষন করে থাকে।

২৫। **দাসত্ব ঃ** মোট কথা, ইংরেজদের কারণেই ভারত থেকে দাস প্রথা লোপ পেয়েছে। মুসলমানদের বিশ্বাস করতে হবে যে, এ দাস প্রথা ইসলাম বিরোধী এবং তা ছিল একটি খারাপ দিক।

২৬। **বহু বিবাহ ঃ** সমাজে বহুবিবাহ ছিল মুসলমানদের বুকামির পরিচায়ক। তবে এ রীতি ভারতীয় মুসলমানদের মধ্যে কমই লক্ষ্য করা যায়। আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আদেশের পরিপন্থীরুপে এ রীতি চালু রয়েছে।

২৭। **কৃষি উন্নয়ন ঃ** জাতীয় সভ্যতার উন্নতি ও উৎকর্ষ সাধনের জন্য কৃষির উন্নয়ন এবং পাশাপাশি কৃষকের উন্নতি অগ্রনী ভূমিকা পালন করে। এক্ষেত্রে জাতির আরো করনীয় দিক আছে।

২৮। **শোক পালনের ক্ষেত্রে রীতি-নীতি ঃ** মুসলিম সমাজে ইসলাম বর্হিভূত হওয়ার পর ও মুসলমানেরা শোক পালন উপলক্ষে বিভিন্ন রীতিনীতির পালন করে থাকে। যদিও শাহ ইসমাইল শহীদের জন্য অনেক অশোভন রীতি-নীতি মুসলিম সমাজ থেকে লোপ পেয়েছে। তারপরও সমাজে অনেক বিদ্যমান রয়েছে।

২৯। **ব্যবসা বাণিজ্য ঃ** জাতীয় উন্নতি ও তহযীব তমদ্দুন লাভের পূর্বশর্ত হলো ব্যবসা বাণিজ্য। অথচ মুসলমানারা এ কথাটি ভুলে গেছে। কাজেই মুসলমান জাতিকে সভ্যতা আদায়ের জন্য ব্যবসা বাণিজ্যর বিস্তার ঘটাতে হবে এবং ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্রে উপযুক্ত নীতি গ্রহন করতে হবে।

Dhaka University Institutional Repository

সুতরাং তিনি এই ২৯ টি বিষয়কে তহযীব বা সভ্যতার অর্ন্তভূক্ত করে বলেন, যতদিন আমাদের মধ্যে এই বিষয় গুলির উন্নতি না হবে ততদিন আমাদের কোন সার্বিক উন্নতি সম্ভব নয়। তাই মুসলমানদের উচিত এই সব কুপ্রথা গোঁড়ামী কুসংস্কার পরিহার করা। যেহেতু ভাল মন্দ হলো বস্তু বা কর্মেরই দোষগুণ। সেহেতু মানুষের বিবেক বুদ্ধির আলোকে ও আল্লাহ প্রদত্ত সদগুন দিয়ে বস্তু বা কর্মের দোষগুণ নিরুপন করতে হয়।[৮৬]

তাই উপরোক্ত সংস্কারগুলি আলোচনার পর আমি ও স্যার সৈয়দ আহমদ খানের সাথে একমত। কেননা মুসলমান জাতির উন্নতির পক্ষে উপরোক্ত ২৯টি বিষয় সংস্কার অপরিহার্য্য।

ভারতের কুপ্রথার বিরুদ্ধে উপযোগী ব্যবস্থা গ্রহন করা উচিৎ ঃ

ইংরেজ শাসন শুরু হওয়ার আগে থেকেই ভারতের মুসলমানদের সামাজিক জীবনে বিভিন্ন অনৈসলামিক আচার অনুষ্ঠানের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। যা কিনা অষ্টাদশ শতাব্দিতে এই প্রভাব ব্যাপক আকার ধারণ করে।[৮৭] সে সময় মুসলমানদের একাধিক বিবাহ এবং সমাজের অন্যান্য সম্প্রদায়ের মধ্যে বহুবিবাহ প্রচলিত ছিল। এসব প্রথার কারণে সমাজের অনেক অমঙ্গল সাধিত হয়ে থাকে। তাই স্যার সৈয়দের মতে, এসব প্রথা উপদেশ বা অনুরোধ করে বন্ধ করা সম্ভব নয়। তাই এসব বিষয়ে সংশোধন ও আইন তৈরী করার জন্য তিনি সরকারের দৃষ্টি আকর্ষন করেন।[৮৮]

স্যার সৈয়দের সময় মুসলিম বিত্তশালীরা পাল্লা দিয়ে বিয়ে-শাদী, খতনা, বিস্‌মিল্লাহ পাঠ ইত্যাদি অনুষ্ঠানে প্রচুর অর্থ ব্যয় করে ঋণে জর্জরীত হয়ে পরতেন। স্যার সৈয়দ নিজে এই সবের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করেন এবং তাঁর পুত্রের বিয়েতে বেশী টাকা খরচ না করে পাঁচশত টাকা আলীগড় কলেজ ফান্ডে দান করে মিতব্যয়ীতার আদর্শ স্থাপন করেন। এছাড়া চাকুরী জীবনের প্রথম থেকে তিনি তাঁর লেখা ও বক্তৃতার মাধ্যমে সমাজে প্রচলিত পীর ফকিরদের মাজারে মানত করা, বাতি দেওয়া, শিরনি বিতরণ করা ইত্যাদির বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করেন।[৮৯]

মোটকথা দীর্ঘ সময় ধরে ভারতের স্থানে স্থানে নানা বিদাত বা শরীয়ত বিরোধী কার্যকলাপকে শান্তির ধর্ম ইসলামের আলোয়ে আলোকিত করার উদ্দেশ্যে স্যার সৈয়দ আহমদ সংস্কার আন্দোলন আরম্ভ করেন।

Dhaka University Institutional Repository

প্রচলিত রীতি নীতির বিচারের ক্ষেত্রে দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি ঃ

সে সময় ইসলামের বিধি নিষেধ ও ধর্ম বেত্তাদের প্রতিবাদ ও বিরোধিতা সত্যেও মুসলিম সমাজে নানা প্রকার দোষাবহ আচার অনুষ্ঠান প্রবেশ করে, যা কিনা শরিয়ত বিরুধী।[৯০]

স্যার সৈয়দ বিভিন্ন দেশ, ধর্ম, সম্প্রদায় ও যুগের প্রথাপদ্ধতি নিয়ে ব্যাপক ও তুলনামূলক আলোচনা করে বলেন, যুগ যুগ ধরে প্রচলিত রীতিনীতির সংশোধন না করা হলে তা ভাল হওয়া সত্ত্বেও মন্দে পরিণত হয়। কেননা ভাল মন্দের একটি নিদির্ষ্ট মাপকাঠি রয়েছে। তাই কোন ভাল ব্যাপার মন্দ হতে পারে না। আবার মন্দের দিক ও ভাল হতে পারে না। সুতরাং ভাল ও মন্দের মধ্যে যদি ত্রুটিমুক্ত ও অনুসরনীয় বলে বিবেচনা করা হয় তবে ভাল ও মন্দের কোন তফাত থাকে না।[৯১]

মোটকথা যুদ্ধের সময় ইহুদী, হিন্দু ও মুসলমানেরা বিপদ থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য বড় ধরনের কুরবানী করে থাকে বা বলি দিয়ে থাকে। অথচ বৌদ্ধ ধর্মী মতে এ জীব হত্যাকে ভীষণ পাপাচার, অত্যাচার ও জঘন্য শাস্তির কাজ বলে মনে করে।[৯২]

পক্ষান্তরে একজন হিন্দু ধর্মের লোক তাঁর পিতার মরদেহ ভয়াবহ আগুনে ভস্মীভূত করে শুধুমাত্র পূণ্য ও চিরত্রারেন নিশ্চিত আশায়। অতঃপর ভস্ম থেকে হাড় কুড়িয়ে নিয়ে সেগুলি গঙ্গা স্রোতে ছেড়ে দেয়। কিন্তু একজন মুসলমান বা ইহুদী বা খ্রীষ্টান ধর্মের লোকেরা এটাকে হৃদয়হীনতা ও নিষ্ঠুরতা বলে আখ্যায়িত করেন। তাঁরা এরূপ প্রিয়জনের মরদেহকে স্বহস্তে আগুনে নিক্ষেপ করাকে পাপাচার বলে মনে করে এবং তাঁরা এটা কল্পনা করতেও পারে না।[৯৩]

প্রাক ইসলামী যুগে কন্যা সন্তানের জন্মকে লোক লজ্জা ও দুর্ভগের কারণ মনে করা হত। অনেক সময় কন্যার হৃদয় বিদারক চিৎকার উপেক্ষা করে পিতা তাকে জীবন্ত কবর দিত। এটাকে তদানিন্তন ভারত সরকার একটি সম্মান জনক নতুন আইন বলে মনে করতেন।[৯৪]

প্রশ্চাত্যের লোকেরা বহু বিবাহকে মৌলিক কু-কর্ম বলে মনে করত এবং এই প্রথার আচরণকে শুধু অবৈধই মনে করত না, বরং লম্পট আর নীতিহীনতার ফল বলেও মনে করত।[৯৫]

Dhaka University Institutional Repository

আবার মুসলমান সমাজে চারটি বিয়ে করাকে বৈধ মনে করে। অথচ অসহায় ও বিধবা স্ত্রী লোকদের ভরন পোষন ব্যবস্থার অভাবে হযরত (সাঃ) যে আদর্শ নিয়ে একাধিক বিবাহ করেছিলেন, তা পরবর্তিতে পক্ষপাত দুষ্ট ও কপট শত্রুরা পরশ্রী কাতরবশত বিকৃত করেছে।[৯৬]

ভারতীয়দের বিশেষকরে মুসলমানদের কুপ্রথা অকল্যাণকর রীতিনীতির বিরুদ্ধে জনমতের তোয়াক্কা না করে স্যার সৈয়দ নিজে বলিষ্ঠ লেখনী ধারণ করেন। তিনি জতির গোঁড়ামী ও কুসংস্কার রোধ করে তাকে একটি স্বাধীন চিন্তা অবলম্বনে উদ্ধুত করেন। তিনি জাতিকে জীবনের নতুন মূল্যবোধের সাথে পরিচয় করিয়ে দেন এবং সামাজিক বিপ্লবের মধ্যে লুকায়িত আছে জাতির মঙ্গল। তাঁর এই পরিবর্তনের পথ ধরেই পরবর্তী কালে সামাজিক পরিবর্তন ও বিপ্লব সাধিত হয়।

সমাজে নারীর অবস্থার সংস্কার ঃ

স্যার সৈয়দ তাঁর "সায়েন্টিফিক সোসাইটি" ও "তাহযীবুল আখলাক" পত্রিকায় বিভিন্ন প্রবন্ধ লিখে নারী সমাজের সংস্কারের প্রতি জাতির দৃষ্টি আকর্ষন করেন। কেননা তাঁর সমাজ সংস্কার থেকে নারী সমাজ বাদ পড়েনি। তিনি লক্ষ্য করেন যে, ভারতীয় নারীদের মধ্যে নিবুদ্ধিতা, কুসংস্কার, অজ্ঞতা ও ভিত্তিহীন ধ্যান ধারণা বিদ্যমান।

তৎকালীন সময়ে স্যার সৈয়দ নারী সমাজের কুসংস্কার ও অন্ধ বিশ্বাস বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, তাদের বিশ্বাস প্রচলিত প্রথা প্রদ্ধতি সমূহ অপরিবর্তনীয় ও অবশ্য পালনীয়। কারণ এ গুলোর উপর তাদের জীবন মরন, সুখ-দুঃখ সব নির্ভর করে। তাঁরা রোগ গ্রস্থ হলে চিকিৎসার আশ্রয় না নিয়ে ঝাড় ফুঁকোর ও পীর দরবেশের মাজারে মানত করে আরোগ্য লাভের চেষ্টা করে। এমনকি নারী সমাজের কোন কোন মহলের ধারণা সন্তান জন্ম নেওয়ার আগে সন্তান মায়ের নাড়ী কামড়ে ধরে রাখে। তাই সন্তান প্রসব করতে মায়ের বিলম্ব হয়।[৯৭]

স্যার সৈয়দ ভারতীয় নারীদের এক শতাব্দীর আগের কথা বর্ণনা করেন। তখনকার দিনে কুসংস্কারকে ব্যক্তিগত ও জাতীয় চেতনার পক্ষে ক্ষতিকর বলে মনে করে তিনি তাঁর লেখনী, বক্তৃতা ও শিক্ষা অভিযানের মাধ্যমে ভারতীয় নারীদের ধ্যান ধারণা দুর করার চেষ্টা করেন।

Dhaka University Institutional Repository

স্যার সৈয়দ এর ধারনা ছিল মানুষ জিন বা ভূতের প্রভাবে অসুস্থ্য হতে পারে না। কারণ তিনি তো এসবের অস্তিত্ব বিশ্বাস করতেন না। এছাড়া মাজারে মানত করাকে তিনি শরীয়ত বিরোধী বলে মনে করতেন। বস্তুত শাহ ইসমাইল শহীদের সংস্কারের ভাবধারায় স্যার সৈয়দ আহমদ প্রভাবান্বিত হয়েছিলেন।[৯৮]

শাহ ইসমাইল শহীদের "তাকবিয়াতুল ঈমান" নামক পুস্তিকায় মুসলমানদের যত ধরনের শিরক আছে তাঁর বিস্তারিত পর্যালোচনা করেন। স্যার সৈয়দ ছিলেন ওহাবীভাবা পন্ন। তাই তিনি শিরক ও বেদাতের ঘোর বিরোধী ছিল শাহ সাহেবের মত। ওহাবীভাবাপন্ন লোকেরা সমাজ থেকে সব ধরনের শিরক বেদাত প্রতিরোধের চেষ্টা করেন। স্যার সৈয়দের সময় জন্মগত অধিকারের দিক থেকে নারী পুরুষ উভয়ই সমান ছিল যা সভ্য দেশ সমূহ প্রচার করে থাকে। তাদের দাবী তারাই নারী জাতির অধিকার পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা করেছে।

অন্যদিকে তাদের আরেকটি দাবী ছিল যে, ইসলাম নারীদের যথাযথ অধিকার দেয়নি ফলে পৃথিবীতে মুসলিম নারীর অবস্থা অনুন্নত। এই প্রেক্ষিতে স্যার সৈয়দ ইউরোপীয় সভ্য জাতির নারী অধিকার পর্যালোচনা করে বলেন, ইসলামে নারী অধিকারের সাথে অন্যান্য জাতির নারীর অধিকারের তুলনা হয় না। তিনি বরং বলে থাকেন যে, মুসলিম নারীর এই করুন অবস্থার জন্য ইসলাম দায়ী নন। উপরন্ত মুসলমানদের জাতিগত অবনতি এর জন্য দায়ী।[৯৯]

স্যার সৈয়দ ১৮৭১ সালে তাঁর "তাহযীবুল আখলাক" পত্রিকায় স্ত্রী জাতির অধিকার শীর্ষক একটি প্রবন্ধ বের করেন। তাতে তিনি সে সময়কার ইংলেন্ডের স্ত্রী জাতির অধিকার সমূহ তুলে ধরেন এবং তুলনামূলক ভাবে ইসলামের দেয়া অধিকারের প্রমাণ করেন এবং বলেন ইসলাম অধিকারের বেলায় স্ত্রী পুরুষের মধ্যে সাম্যের যে ব্যবস্থা করেছে তা অন্য কোন ধর্মে নেই বা এমন কোন দেশের আইনও নেই।[১০০]

স্যার সৈয়দ মুসলিম সমাজের নারীদের প্রতি দৃষ্টি পাত করে বলেন, নারী সমাজের জন্য ইসলামের এত সুন্দর ও উদার নীতি থাকার পরও অন্যান্য সভ্য দেশের তুলনায় মুসলিম দেশের নারীরা খুবই করুন। অথচ এই ব্যাপারটা অন্য জাতির বেলায় হওয়া উচিত ছিল।[১০১]

Dhaka University Institutional Repository

সভ্য দেশের নারীদের প্রতি যে আচার ব্যবহার করা হয় এর সাথে মুসলিম সমাজের নারীদের তুলনা করে স্যার সৈয়দ বলেন, আমাদের মুসলিম সমাজের নারীদের আনন্দ, আরাম-আয়েশের প্রতি খুব একটা খেয়াল করা হয় না, যেমনটা করা হয় বিভিন্ন সভ্য দেশের নারীদের প্রতি।[১০২]

মুসলমান পুরুষেরা যদি তাদের ভাগ্যের উন্নতির লাভের সচেষ্ট হয় এবং নারীদের অধিকার ইসলামের বিধি মোতাবেক প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহলে মুসলমান জাতির আর দুর্গতি থাকবে না। কেননা ভারতের মুসলিম সমাজের বিধি বিধান মেনে না চলার কারনেই তাদের চরম দুর্গতি নেমে আসে। স্যার সৈয়দ জাতির দৃষ্টি আকর্ষন করে বলেনঃ "আমাদের এখন নীরব বসে থাকার সময় নয় বরং আমাদের এখন উচিত হবে ইসলামের আলো নিজেদের কার্যবালী দিয়ে বিশ্বের সামনে তুলে ধরা।[১০৩]

নিঃসন্দেহ এ কথা বলা যায়, পবিত্র ইসলাম নারীকে যত সম্মান, অধিকার ও স্বাধীনতা দিয়েছে তা বিশ্বের আর কোন জাতি বা ধর্ম দিতে পারেনি আজও। স্যার সৈয়দ মূলতঃ ইঙ্গ মুসলিম সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম করেছিলেন। তিনি ইউরোপীয় তমদ্দুনের অনুরাগী ছিলেন এবং ইংরেজদের সাথে চলাফেরা, উঠা-বসা ও বন্ধুত্ব তৈরী করাকে একটি রাজনৈতিক উদ্দেশ্য বলে মনে করেন। তবে তিনি ইসলাম ধর্মকে উপেক্ষা করে কোন আধুনিকতা পছন্দ করেননি। বরং তিনি মুসলিম সমাজ তথা ইসলামের স্বার্থেই আধুনিকতা গ্রহনের পক্ষপাতী ছিলেনা। স্যার সৈয়দ ইংরেজ কর্তৃপক্ষকে বলেন, ধর্মীয় শিক্ষা ছাড়া মুসলমানেরা শিক্ষা ব্যবস্থার কল্পনা ও করতে পারে না।[১০৪]

জাতি, ধর্ম, নির্বিশেষে স্যার সৈয়দ গোটা ভারতের সমাজ সংস্কার চেষ্টা করেন। সে সময় হিন্দু সমাজের কিছু প্রথা অনুকরনে মুসলমানদের মধ্যে অনেকেই বিধবা বিবাহকে ছোট করে দেখতো।

কেননা হিন্দু ধর্ম মতে, বিধবা বিবাহ নিষিদ্ধ ছিল। হিন্দুদের এই কুপ্রথা বন্ধ করার জন্য বাংলার ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর এবং বোম্বাইয়ের বিষ্ণু পরশ রাম শাস্ত্রী বিধবা বিবাহ প্রচলনে খুবই চেষ্টা করেন। সিরিশ চন্দ্র ভট্টাচার্য এক বিধবাকে বিয়ে করে এই প্রথার বিলুপ্ত করার পদক্ষেপ গ্রহন করেন।[১০৫] স্যার সৈয়দের দৃষ্টিতে সমাজের কু-প্রথার কুফল ছিল জঘন্যতম।

Dhaka University Institutional Repository

এই কু-প্রথার কারণেই পরবর্তীতে জাতির চারিত্রিক অবনতি ঘটে। আর সে জন্যই স্যার সৈয়দ বলেনঃ

> "দ্বিতীয় বিবাহ না হওয়ার ফলে বিধবা স্ত্রী লোকদের যে ক্ষতি সাধিত হয় তা বর্ণনাতীত। এটা শুধু শরীয়ত বিরোধী নয় বরং ধর্মের কপালে কালি লেপন করা হয়। এছাড়া এতে মনুষত্বই বিনষ্ট হয়।[১০৬]

সমাজে পীর মুরিদের অবস্থান ঃ

সে সময় পীর মুরিদ ও সুফীদের কার্যক্রম ব্যাপক হারে বৃদ্ধি পেয়েছিল। তখন ধার্মিক ব্যক্তিগণ কোন না কোন পীরের হওয়াকে অপরিহার্য মনে করতেন। পীরের মুরিদ ছাড়া কোন সামাজিক মর্যাদা ছিল না। অন্য দিকে পীরেরাও সাদাসিদে মুরিদদেরকে নানা ভাবে প্রলুব্ধ করে রাখতেন।[১০৭]

স্যার সৈয়দ আহমদ খান এই ধরণের পীর মুরিদিকে শরীয়ত ও সুন্নতের পরিপন্থী মনে করতেন, তাঁর মতে, কিছু সংখ্যক বুদ্ধিমান ব্যক্তি পর্দার আড়াল থেকে সাদাসিধে মুসলমানদেরকে প্রতারিত করার জন্য এই ধরনের ব্যবসা করে থাকেন। তিনি বলেন, ওলী, গাওছ, আবদাল ও কুতুব হওয়া কোন অস্বাভাবিক কিছু না। এটা স্বাভাবিক ব্যাপার।[১০৮]

স্যার সৈয়দের মতে, শরীয়তের মুহাম্মদীয় মধ্যে যাবতীয় নেয়ামত নিহিত রয়েছে। যারা শরীয়তে মুহাম্মদীর উপর চলবে তাঁরাই আল্লাহর এই নেয়ামত ভোগ করবে। আর যারা শরীয়ত থেকে বিচ্ছিন্ন থাকবে তাঁরা আল্লাহর এই নিয়ামত থেকে বঞ্চিত থাকবে মোটকথা যে যতটুকু শরীয়তের আনুগত্য করবে সে যতটুকু আল্লাহর অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি লাভ করবে। অতএব পীর মুরিদীর মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা সম্ভব নয়।[১০৯]

Dhaka University Institutional Repository

যেহেতু পীরবাদ ছিল হিন্দু গুরু বাদের নব্য সংস্করন। তাই এই পীরবাদের ফলে মুসলমানদের জীবনে অনুপ্রবেশ করে নানা ইসলাম পরিপন্থি আচার অনুষ্ঠান। পীরের আস্তানায়-মানত, তাঁর মূর্তি ধ্যান, জীবিত ও মৃত পীরের নিকট বিপদ মুক্তির জন্য প্রার্থনা, কবরে আতর, গোলাপ পানি দেওয়া, পীরের নামে উৎসর্গীকৃত বস্তুকে প্রসাদ ও তবররুক বলে গ্রহন করা ইত্যাদি পীরবাদেরই ফল।[১১০]

এই উদ্দেশ্যে স্যার সৈয়দ বলেন, আমার হক কথা (কলেমাতুল হক) গ্রন্থটি ভন্ড পীর মুরিদের বিরুদ্ধে একটি প্রতিবাদ। বর্তমানে পীর মুরিদি নিয়ে মুসলিম সমাজে যে সমস্যা দেখা দিয়েছে তাঁর পরিণাম অত্যন্ত ভয়াবহ। স্যার সৈয়দ সে যুগের মুসলিম সমাজের বাস্তব চিত্র তুলে ধরে বলেন সাধারণ মানুষ কোন অপরিচিত ব্যক্তিকে দেখলেই তাকে পীর বা ওলি মনে করে তাঁর অনুগত্য প্রকাশ করাকে ধর্মীয় কর্তব্য বলে মনে করেন।[১১১]

লোভী ও স্বার্থপর মৌলবাদীর তকদীরের ভুল ব্যাখ্যা করে বলেন, ইহা পূর্ব নির্ধারিত ও অপরিবর্তনীয়। কিন্তু স্যার সৈয়দের মতে, মানুষ চেষ্টার মধ্যে দিয়ে নিজেই তাঁর তকদীর গড়ে এবং নিয়ন্ত্রন করে থাকে। তকদীর সম্পর্কে "ইন্ডিয়ান পাবলিক ওপিয়ন" পত্রিকায় বলা হয় ইসলাম তকদীরের প্রতি অন্ধ বিশ্বাসের শিক্ষা দেয়, এই বিশ্বাস ধ্বংসের পথে মুসলমানদেরকে পরিচালিত করে। কিন্তু আর কোন ধর্মে এরুপ শিক্ষা দেয় হয় না। পরবর্তী কালে স্যার সৈয়দ পত্রিকাটির মন্তব্য সম্পর্কে বলেনঃ মূলত মুসলমানদের মানসিকতা ও অবস্থার বাস্তবে তাই, যা এই পত্রিকায় বিবৃত হয়েছে। কেননা স্বার্থপরও লোভী মৌলবাদীরা মুসলমানদের এ শিক্ষাই দিয়েছে। অথচ পবিত্র কুরআনের শিক্ষা দেয়া হয় নাই। তিনি কুরআনের বাণী উদ্ধৃত করে বলেনঃ "মানুষ যা চেষ্টা করে থাকে তাই সে লাভ করে"।[১১২]

মোটকথা আমিও স্যার সৈয়দের মতেরসাথে একমত পোষন করছি। কেননা সমাজে গোঁড়া ও ধর্মান্ধ, মোল্লা-মৌলভীরা সমস্ত অপকর্মের জন্য দায়ী। তাঁরা নিজেদের হীনস্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য আপন সরদারি অক্ষুন্ন মানসে তাঁরা সমাজ জীবনে ধর্মের অপব্যাখ্যা প্রচার করে থাকেন নির্ধিধায়।

Dhaka University Institutional Repository

সমাজে উন্নয়নের জন্য কর্ম সূচি গ্রহন করা ঃ

প্রত্যেক জাতির তাহযীব তমুদ্দন ও জ্ঞান বিজ্ঞানে উৎকর্ষ সাধিত হয় সমাজের খান্দান পরিবার সমূহের মাধ্যমে। তাই এদেরকে জাতির আশা ভরসার মধ্যমনি মনে করা হয়। কিন্তু স্যার সৈয়দের সময় দেখা যায় এদের অবস্থা ছিল অত্যন্ত করুন। সুতরাং এদের মিথ্যা অভিমান অজ্ঞতা, দ্রারিদ্রতা দেখে স্যার সৈয়দ দুঃখ বোধ করেন। তিনি তাঁর "হিন্দুস্থানকে মু-আযযায-খান্দান" শীর্ষক প্রবন্ধে।[১১৩] বলেন, প্রত্যেক দেশ বাসীর মুখ উজ্জ্বল হয় তাঁর দেশের খান্দান সমূহের মহত্ব শ্রেষ্ঠত্ব ও বিদ্যা বুদ্ধির মধ্য দিয়ে।

তাঁর মতে, ভারতের শরীফ সম্ভ্রান্ত পরিবার গুলি ছিল বিদ্যা বুদ্ধি ও জ্ঞান গরিমান উৎস। কিন্তু বর্তমানে সে সব পরিবার গুলি তাদের বিদ্যা-বুদ্ধি,ধন-সম্পদ, মান-ইজ্জত-হারিয়ে ধ্বংসের পথে চলছে। তাই সমাজে এদের কোন মূল্য নেই। কারণ এরা শিক্ষার অভাবে লাঞ্ছিত এবং তাদের ছেলে মেয়েরা ও দুচরিত্র, লম্পট, বখাটে ও ভবঘুরে হয়ে পড়েছে। বিশেষ করে মুসলিম সম্ভ্রান্ত পরিবার সমূহের প্রতি লক্ষ্য করে স্যার সৈয়দ বলেন, মান ইজ্জত ও অর্থ সম্পদ অস্থায়ী। আর জ্ঞান, গরিমা ও বিদ্যা বুদ্ধির মূল্য চিরস্থায়ী।[১১৪]

স্যার সৈয়দ ভারতের সম্ভ্রান্ত গন্যমান্য ও খান্দান পরিবার সমূহের পতন লক্ষ্য করে বলেছিলেন, আমাদের শাসনকর্তা হিসাবে এরা যে ভারতে বসেনি সে জন্য আল্লাহর অশেষ মেহেরবানী। কেননা এরা যদি আমাদের শাসনকর্তা হিসাবে থাকতেন, তাহলে আমাদেরকে মানুষের মত জীবন যাপন করা সম্ভব হত না। আর এই উদ্দেশ্যেই স্যার সৈয়দ ভারতে অন্য একটি জাতি, অর্থাৎ ইংরেজ জাতির শাসন প্রতিষ্ঠার জন্য সন্তোষ প্রকাশ করেন।[১১৫]

ভারতীয় সমাজে মুসলিম আমলে একটা সার্বিক ঐক্যবোধ ছিল একাধিক শ্রেণী থাকা সত্বেও। কিন্তু ইংরেজ আমলে ১৮৫৭ সালের পূর্বে ও পরে ভারতীয় সমাজে নানা পরিবর্তন দেখা দেয়। তখন থেকে তাদের মধ্যে গণতন্ত্রের সূচনা হয় এবং আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা শুরু হতে থাকে। তবে এই উত্থান পতনের ফলে মুসলিম খান্দান পরিবার গুলি বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হয়।[১১৬]

Dhaka University Institutional Repository

তখনকার সমাজিক অবস্থা পর্যালোচনা করলে দেখা যায়। প্রথমতঃ ইংরেজ আমলে সম্ভ্রান্ত পরিবার সমূহ আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান থেকে নিজেদের দুরে সরে রাখেন। শুধু মাত্র সরকারের বিরুপ মনোভাবের ফলে।

দ্বিতীয়তঃ নিজেদের মিথ্যা অভিমানের কারণে। এই প্রেক্ষিতে স্যার সৈয়দ কোন শ্রেণী বিশেষের স্বার্থে নয়, বরং জাতীয় স্বার্থের নিরিখে তাদেরকে উদাসীনতার নিদ্রা থেকে জাগ্রত করার চেষ্ঠা করেন। তবে স্যার সৈয়দের দৃষ্টিতে শরীফ খান্দান পরিবার গুলি হলো বিদ্যা-বুদ্ধি ও মান-ইজ্জতে বড়। কিন্তু তিনি "বর্জুয়া" শ্রেণীকে শরীফ খান্দান বলেননি। কেননা তাঁর কাছে বিদ্যা বুদ্ধি হলো ভদ্রতার মাপকাঠি। অথচ স্যার সৈয়দের মতে,

> ভারতে এমন সম্মানিত পরিবার কমই আছে, যাদের বিদ্যা বুদ্ধি, মহত্ব ও শ্রেষ্ঠত্বের উপর ভিত্তি করে ইজ্জত করা হয়। এখানে আমরা খেয়াল করলে দেখতে পারবো। আবার এমন লোক ও আছেন যাদের সম্মান করা হয় অর্থ-সম্পদের উপর ভিত্তি করে। সুতরাং বিদ্যা বুদ্ধি, মহত্বের উপর নির্ভর অন্যান্য দেশ যে স্থায়ী ইজ্জত লাভ করে থাকে ভারত সে দিক থেকে বঞ্চিত।[১১৭]

অতএব আমার মতে নিঃসন্দেহে এই কথা বলা যায় যে, ভারতের গণ্যমান্য শরীফ খান্দান পরিবারগুলি মান-ইজ্জাতকে বড় করে না দেখে বিদ্যা-বুদ্ধির আলোকে সমাজের উন্নয়নের জন্য তাদের অগ্রনী ভূমিকা পালন করা উচিত।

Dhaka University Institutional Repository

অসহায় ও বঞ্চিতদের জন্য এতিমখানা প্রতিষ্ঠা করা হউক ঃ

বৃটিশ শাসন আমলে ভারতে অনেক সময় বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগের শিকার হতো। এতে করে বহুলোক মারা যেতো এবং বহু শিশু এতিম ও লাওয়ারিস হয়ে পড়তো। এমতাবস্থায় স্যার সৈয়দ সমাজের উন্নয়ন মূলক কাজের প্রেরণা হিসাবে এতিম খানা প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করেন। এই সময় এতিম ও অনাথ শিশুদের জন্য সরকার প্রতিষ্ঠিত কোন এতিম খানা ছিলনা। ফলে খ্রীষ্টান জাতি এই সব শিশুদের প্রতিপালনের ছলে খ্রীষ্ট্রান জাতিতে পরিণত করতেন।

স্যার সৈয়দ এই ব্যাপারে খুবই দুঃখিত হন। তাঁর মতে, প্রাপ্ত বয়স্ক লোক নিজের ইচ্ছায় খ্রীষ্টান বা ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হন তবে দুঃখের কিছু নেই। কিন্তু এসব কচি শিশুদের বিপদাবস্থায় খ্রীষ্টান ধর্মে দীক্ষিত করা এবং চিরতরে নিজের আত্মীয় স্বজন ও ভাই বোনদের থেকে বঞ্চিত করা মানবতা বিরোধী কাজ।[১১৮]

স্যার সৈয়দ এই ধরনের সমস্যা সমাধানের জন্য জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকল অনাথ শিশুদের জন্য আলীগড়ে একটি এতিমখানা প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা করেন। এ উদ্দেশ্যে জনমত গঠনের জন্য তিনি ১৮৭৭ সালে তাঁর "তাহযীবুল আখলাক" পত্রিকায় একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন।[১১৯]

এতে হিন্দু মুসলিম উভয় জাতির শিশুদের জন্য ভিন্ন ভিন্ন শিক্ষা ব্যবস্থা গ্রহনের প্রস্তাব করেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি এই পরিকল্পনা ছাড়তে বাধ্য হন। কারণ যতদিন পর্যন্ত দেশে সাধারণ শিক্ষা সম্প্রসারিত না হবে ততদিন এসব পরিকল্পনা সফল হবে না। বরং আমাদের উন্নতির জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করতে হবে। কেননা আল্লাহ বলেছেন, "পরিশ্রম করা বান্দার কাজ। সাফল্য প্রদান করা আল্লাহর হাতে"।[১২০]

বস্তুতঃ মুসলমান অসহায় ও বঞ্চিত সন্তানদের কে খ্রীষ্টানদের আগ্রাসী মনোভাবের হাত থেকে রক্ষা করার জন্যই স্যার সৈয়দ এতিমখানা প্রতিষ্ঠা করার তাগিদ দেন।

Dhaka University Institutional Repository

সামাজিক নিয়ম কানুন ও রীতি নীতির সৃষ্টি ঃ

আসলেই জাতির সামাজিক আচার ব্যবহার, প্রথা, পদ্ধতি ও নিয়ম কানুন কিভাবে সৃষ্টি হলো তাঁর বিশ্লেষণ করতে গিয়ে স্যার সৈয়দ বলেন, বিভিন্ন জাতির মধ্যে যে সব সামাজিক রীতি নীতি ও প্রথা পদ্ধতি প্রচলিত আছে, সে গুলি সাধারণতঃ

১) প্রকৃতিগত ভাবে একটি দেশের আবহাওয়া বৈশিষ্ট থেকে বা

২) দেশের সামাজিক তমদ্দুনের ভিত্তিতে এবং জনগনের মন মেজাজ ও চিন্তা ধারা অনুযায়ী। কিন্তু কোনটি আবার সৃষ্টি হয়েছে।

৩) বিজাতির অনুসরন বা অনুকরনের ফলে। এছাড়াও কোনটি আবার উৎপত্তি হয়েছে

৪) দেশের জাতীয় উত্থান ও পতন থেকে।[১২১]

সমাজের উপর প্রভাবিত প্রথা পদ্ধতির পর্যালোচনা করে স্যার সৈয়দ বলেন, সমাজে চালু প্রথা পদ্ধতিগুলির মধ্যে ভিন্নতা রয়েছে, তাদের ধরন এক নয়। যেমন কোনটা ধর্ম কেন্দ্রীক, কোনটা তমদ্দুন কেন্দ্রীক আবার দেখা যায় কোনটা সরকারী আইন কানুন ভিত্তিক। আবার অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় ধর্মের সাথে মিল নেই কিন্তু সমাজে প্রচলিত আছে। এগুলোকে ধর্ম ভিত্তিক মনে করে এবং তা পালন করা পূন্যের কাজ বলে বিবেচনা করে। কাজেই কোন রীতিই প্রত্যক যুগে সমান ভাবে বিবেচ্য হতে পারে না। আবার অনেক সময় একজাতির রীতি নীতি অন্য জাতির জন্য কল্যাণকর হয় না। তবু এই টুকু বলা যায় কোন কোন জাতির রীতি নীতি বেশী ত্রুটি পূর্ণ আবার কোন কোন জাতির রীতি নীতি ত্রুটি বহুল নয়।[১২২]

সামাজিক রীতি নীতির ক্ষেত্রে স্যার সৈয়দ আহমদ খান মনে কষ্ট নিয়ে বলেনঃ

> "আমাদের মুসলমানদের মধ্যে এমনসব কু-প্রথা চালু রয়েছে যে গুলো ইসলাম বিরোধী, মানবতা বিরোধী, তহযীব তমদ্দুন বিরোধী। তাই মুসলমানদের উচিত এই সব কু-প্রথা গোঁড়ামী ও কুসংস্কার পরিহার করা। কেননা মানুষের বিবেক বুদ্ধির আলোকে আল্লাহ প্রদত্ত সদগুণ দিয়ে বস্তু বা কর্মের দোষগুন নিরুপন করতে হয়।"[১২৩]

Dhaka University Institutional Repository

কাজেই মানুষকে তাঁর বিবেক বুদ্ধি খাঁটিয়ে সামাজিক জীবন যাপনের জন্য আল্লাহ ও রাসূলের পথ অনুসরণ করে সামাজিক নিয়ম-কানুন ও রীতি নীতি সৃষ্টি করতে হবে।

মুসলিম আইন অনুসারে ওয়াকফ সম্পত্তি রক্ষা ঃ

ভারতের অনেক আমীর ওমরাহ ও মুসলিম সম্ভ্রান্ত পরিবার শিক্ষা-দীক্ষা, অর্থ সামর্থ্য হারিয়ে ও জায়গা জমিন বিক্রি করে পথের ভিখারীতে পরিণত হচ্ছে। স্যার সৈয়দ এই সব মুসলিম পরিবার সমূহের ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে শঙ্কিত হন। ফলে তিনি এই পরিস্থিতির জন্য "গর্ভনমেন্ট অব ইন্ডিয়া কাউন্সিলে" এমন একটি আইন প্রণয়নের চেষ্ট করেন, যাতে মুসলিম সমাজে সম্পত্তির মালিকেরা তাদের সন্তানদের নামে শরীয়তের আইন মোতাবেক নিজ নিজ সম্পত্তি ওয়াকফ্ করতে পারে এবং ভবিষ্যতে ওয়ারিসেরা প্রণীত বিধি অনুযায়ী সে সম্পত্তি ভোগ দখল করতে পারে।

তিনি ১৮৭৮ সালে তাঁর "তাহযীবুল আখলাক" পত্রিকায় "মুসলিম পরিবারকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষার একটি প্রচেষ্টা" শীর্ষক একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন, শুধুমাত্র জনমত গঠনের উদ্দেশ্য। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁর এই পরিকল্পনা নানা জটিলতার কারণে বাস্তবে রূপ লাভ করতে পারেনি।

গণ্যমান্য লোকদের প্রতি সমাজের কল্যাণ সাধনে প্রভাব বিস্তারের আহবান ঃ

বহুদিনের পঞ্চায়েত প্রথা ভারতের জনগনের উপর প্রভাবিত ছিল। এতে করে নিজ এলাকার শান্তি ও গ্রামের উন্নতির ভার তাদের উপর ছিল। তবে স্যার সৈয়দের সময় পঞ্চায়েত প্রথা না থাকলে মাতবর, সরদার, তালুকদারগণ নিজ নিজ এলাকায় শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখতো।

তাই এদেরকে সমাজের যাবতীয় কল্যাণ কাজে প্রভাব বিস্তারের জন্য স্যার সৈয়দ আহ্বান করেন। ১৮৬৬ সালের ৫ জুলাই আলীগড় "সায়েন্টিফিক সোসাইটির" এক ভাষনের স্যার সৈয়দ আহমদ সমাজের আমীর, শরীফ ও বিত্তশালীদের সমাজ কল্যাণ মুলক কাজে উদ্বুদ্ধ করার চেষ্টা করেন।[১২৪]

Dhaka University Institutional Repository

স্যার সৈয়দ উক্ত ভাষনে বলেন, সকল উন্নত দেশের গণ্যমান্য ব্যক্তি ও বিত্তশালী লোকেরা সামাজিকতা গড়ে তোলে এবং আর্থিক উন্নতির জন্য সক্রিয় ভূমিকা পালন করে থাকেন। সুতরাং ভারতের সকল বিত্তশালী আমীরদের উচিত আন্তরিকতার সাথে এই কাজ করা। এক্ষেত্রে সমাজের মৌল্লা-মৌলভী, ব্রাহ্মণ, পীর-ফকীরের পাশাপাশি সরদার, মাতব্বর, তালুকদার এবং জমিদারদের ও বিশেষ ক্ষমতা রয়েছে।[১২৫]

সুতরাং উপরের আলোচনার পর আমিও স্যার সৈয়দের সাথে একমত পোষণ করে বলব, মুসলিম পরিবারকে বিপদের হাত থেকে বাঁচানোর জন্যই ইসলামের আইন অনুযায়ী সম্পদের সঠিক বণ্টন করা উচিত। এমনকি সমাজের উন্নয়নের জন্য প্রভাব শালী লোকদেরকে এগিয়ে আসতে হবে।

পরামর্শ দান করা হয় সমাজ উন্নয়নের জন্য পুঁজি বিনিয়োগের ঃ

১৮৬৬ সালের "সায়েন্টিফিক সোসাইটির" ভাষনে স্যার সৈয়দ জমিদারদের পুঁজি বিনিয়োগের পরামর্শ দেন এবং বলেন, পুঁজি বিনিয়োগের মাধ্যমে তাদের উচিত নিজ নিজ এলাকার উন্নয়ন সাধন করা। যেমন প্রয়োজন অনুযায়ী পানি সরবরাহ, সেচের জন্য খাল বিল খনন করা এবং যাতায়াত ব্যবস্থার জন্য সড়ক প্রস্তুত করা। এছাড়া তিনি তাদেরকে কৃষি ব্যবস্থার প্রতি উৎসাহ দিয়ে বলেন, যদি কৃষির উন্নয়ন সাধিত হয় তাহলে আবার তাঁরা রাজার মত জীবন যাপন করতে সক্ষম হবেন।[১২৬]

এছাড়া স্যার সৈয়দ গভীরভাবে উপলব্ধি করেন, কৃষি সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করার জন্য কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করার প্রয়োজনীয়তা এবং এ কাজে সরকার সাহায্য না করলে জমিদারদের নিজস্ব চেষ্টায় তা করতে হবে। তবে তিনি কৃষির উন্নতির জন্য এবং ভাল জাতের গো-মহিষাদি পালনের জন্য কৃষি কর্মকর্তাদের দৃষ্টি আকর্ষন করেন।[১২৭]

এমনকি স্যার সৈয়দ সমাজের প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ীদেরকে শিল্প উন্নয়ন ও কলকারখানা প্রতিষ্ঠার পরামর্শ দেন। অতঃপর তিনি ব্যবসায়ীদেরকে তাদের নিজস্ব কাজ কারবারে সততা ও সত্যতা ধরে রাখতে অনুপ্রাণিত করেন।[১২৮]

Dhaka University Institutional Repository

একটা বিষয় লক্ষ্যণীয় যে, আজকের ও তখনকার ভারতের মধ্যে অনেক তফাত রয়েছে। সে সময় বৈজ্ঞানিক চাষাবাদ ও গ্রামীন উন্নয়নে অনেকটা কষ্ট ছিল। তবে আজ বিংশ শতাব্দীতে কৃষি ও সমাজ উন্নয়ন সম্পর্কে যে চিন্তাভাবনা করা হচ্ছে যুগের চাইতে অগ্রগামী স্যার সৈয়দ উনবিংশ শতাব্দীতে তা করেছিলেন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত "সায়েন্টিফিক সোসাইটির" অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল বৈজ্ঞানিক চাষাবাদের পন্থা আবিষ্কার করা।[১২৯]

মূলতঃ এই সোসাইটির অধীনে যে কৃষি ক্ষেত খামার ছিল তাতে কৃষি উৎপাদনের পরীক্ষা নিরীক্ষা চালানো হতো। অতঃপর ক্ষেতে বীজ বপনের জন্য স্যার সৈয়দ নিজে এক প্রকার লৌহনলী আবিস্কার করেন।[১৩০]

মোটকথা সমাজে বিত্তশালীরা যদি দেশের উন্নয়নের জন্য পুঁজি বিনিয়োগ না করে, তাহলে কোন দেশ বা জাতি উন্নতির পথে অগ্রসর হতে পারে না।

জনস্বাস্থ্য রক্ষার সুপারিশ ঃ

স্যার সৈয়দ আহমদ খান "সায়েন্টিফিক সোসাইটির" ভাষনে বলেন, গ্রাম ও শহরের বিত্তশালীরা জনস্বাস্থ্য রক্ষার দিকে নজর দিবেন এবং তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য হলো রাস্তা-ঘাট, বাড়ী-ঘর তৈরী করা। এমনকি তাঁরা পরিবেশের চিন্তা করে রাস্তার দুই ধারে বৃক্ষ রোপন করবেন। অতঃপর তাঁরা বিশুদ্ধ পানির ব্যবস্থা জন্য পুকুর খনন করবেন।[১৩১]

সাধারণ শিক্ষার প্রতি লক্ষ করে স্যার সৈয়দ "সায়েন্টিফিক সোসাইটির" ভাষনে দুঃখ করে বলেন, অনেক শিক্ষিত লোক এদেশে আছে। কিন্তু উচ্চ শিক্ষা, যুগোপযোগী বিজ্ঞান ও কারগরি শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়নি। তাই যতদিন পর্যন্ত এদেশে সাধারণ শিক্ষা ব্যবস্থা না হবে, ততদিন পর্যন্ত সমাজ কল্যাণ কাজে সফল হবে না।[১৩২]

Dhaka University Institutional Repository

স্যার সৈয়দ সাধারণ শিক্ষার প্রসার সম্পর্কে বলেন, এর জন্য অতি জরুরী হলো ধর্মীয় চিন্তা ধারার সংস্কার করা এবং স্বাধীন চিন্তা ধারা গ্রহন করা। এই লক্ষ্যে তিনি সমাজের আমীর, কবীর ও আলিম ফাযিলগণকে আধ্যাত্মিক ও ধর্মীয় উৎকর্ষ সাধনের জন্য উৎসাহ দান করেন এবং সংঘ ও সমিতি গঠন করেন এবং বলেন বিভিন্ন ধর্ম ও পবিত্র গ্রন্থ সমূহের তত্ত্বাদি নিয়ে তাদের উচিত তুলনামূলক আলোচনা করা। এছাড়া এ সংঘ বা সমিতির কাজ হলো-মানুষের দ্বীন যে কারণে বিচ্যুতি ঘটে তা নির্ণয় করা এবং তার প্রতিকার করা।[১৩৩]

অতঃপর স্যার সৈয়দ দেশের দানশীল ও দেশহিতৈষী বিত্তশালীদের উৎসাহিত করেন শুধু মাত্র সমাজের অসহায় ও গরীবদের কল্যাণ সাধনে দাতব্য চিকিৎসালয়, লঙ্গরখানা ও সরাইখানা প্রতিষ্ঠার জন্য।[১৩৪]

কাজেই গোটা দেশের জনস্বাস্থ্য ঠিক রাখতে হলে সরকারের পাশাপাশি সমাজের বিত্তশালীদের নজর দিতে হবে। তাহলেই দেশ উন্নত হবে।

জাতীয় মর্যাদা ও সামাজিক চেতনার জন্য ঃ

আমরা জানি যে, কোন সমাজ বা জাতির মধ্যে যদি বিশেষ কোন শ্রেণী উন্নত হয়, আর পুরো সমাজ ও জাতি পিছনে থাকে তাহলে সে উন্নতি অর্থহীন। তাই স্যার সৈয়দ মনে করতেন, ব্যক্তি সমষ্টির অপর নামই জাতি। তাই জাতীয় সম্মান অর্জিত না হলে ব্যক্তিগত সম্মান লাভ করা মোটেই সম্ভব পর নয়। তিনি সামাজিক ও জাতীয় চেতনায় অত্যন্ত পারদর্শি ছিলেন।

ফলে গোটা জাতির লোক যদি লাঞ্ছনা ও গঞ্জনার মধ্যে দিয়ে জীবন অতিবাহিত করে এবং এর মধ্যে এক ব্যক্তি যদি কোন সম্মান অর্জনে সক্ষম হয়, তাতে গোটা জাতির লাভ কি? সে হয়তো নিজ সমাজে প্রশংসা পাবে, কিন্তু পৃথিবীর চোখে তাঁর কোন ইজ্জত বা সম্মান হবে না। সুতরাং ব্যক্তিগত সম্মান মূলত জাতীয় সম্মানের উপরই নির্ভর করে।[১৩৫] বস্তুত জাতীয় ভাবটি হৃদয়োন্নতি শোপানের একটি প্রশস্ত ধাপ।[১৩৬]

Dhaka University Institutional Repository

উচ্চ বংশে জন্ম গ্রহন করে ও স্যার সৈয়দের বিশেষ কোন গৌষ্ঠী বা শ্রেণীর প্রতি দরদ ছিলনা। মুসলমান আমলে ভারতে একাধিক শ্রেণী থাকা সত্ত্বে ও শ্রেণী সংগ্রাম ছিল না। অথচ স্যার সৈয়দের সময় ভারত সবেমাত্র গণতন্ত্রের দিকে পা দিয়েছে। তাই তিনি ভারতীয় সমাজের সকল শ্রেণীকে নিজ নিজ জায়গায় রেখেই সকলের সভ্যতা ও আর্থিক অবস্থার উন্নতি কামনা করতেন। এছাড়া তিনি আমীর, কবীর, রাইসদের আর্থিক ও সংস্কৃতিক দুর্যোগ থেকে বাঁচাতে চেয়েছিলেন।[১৩৭]

এমতাবস্থায় স্যার সৈয়দের জাতীয় চেতনা ও জাতীয় দরদ সম্পর্কে সহজে বুঝা যায় তাঁর ঘনিষ্ট বন্ধু ও সহযোগী নওয়াব মুহসিনুল মুলকের বর্ণনায়। তিনি বলেনঃ

"মুসলিম শিক্ষান্নয়ন কমিটি" গঠন হওয়ার পূর্বের রাত এগারটা পর্যন্ত মুসলমানদের শিক্ষা সম্পর্কে তাঁর সাথে আমার আলাপ আলোচনা হয়। এরপর আমি ঘুমিয়ে পড়লাম। রাত প্রায় দুটোর সময় আমার ঘুম ভাঙ্গলে চেয়ে দেখি তিনি তাঁর পালংকে নেই" তাঁর খোজে আমি কক্ষের বাহিরে গেলে দেখতে পাই তিনি বারান্দায় পায়চারি করছেন, আর ফুপিয়ে ফুপিয়ে কাঁদছেন। আমি জিজ্ঞাসা করলামঃ খোদা না করুন; কোন বিপদের খবর তো পান নি? এ কথা শুনে স্যার সৈয়দ আরো বেশী করে কাঁদতে লাগলেন এবং বললেনঃ মুসলমান জাতি বিনষ্ট হয়ে গেল, অথচ তাদের মঙ্গল সাধনের কোন পথ খুঁজে পাচ্ছি না। এর চাইতে বড় বিপদ আর কি হতে পারে? ভাবছি কালকের সভায় কি যে ফল হবে; এবং কারো কানে কিছু প্রবেশ করবে কি না ?[১৩৮]

যেহেতু বৃটিশ রাজত্বেই ভারতে গণতন্ত্রের সূচনা হয় এবং এরই ফলে সামাজিক ও জাতীয় চেতনা বিকাশের পথ সুগম হয়। এ ছাড়া সৈয়দ আহমদ শহীদের জিহাদ আন্দোলনের ফলে সমাজে ধর্মভিত্তিক জাতীয় চেতনার উন্মেষ ঘটেছিল। তবে মুসলিম স্বাতন্ত্র্যমন্ডিত রাজনৈতিক জাতীয় চেতনার দিগন্ত তখনো জ্বলে উঠেনি। পরবর্তীতে স্যার নওয়াব আব্দুল লতিফ, সৈয়দ আমীর আলী প্রমুখ ব্যক্তিবর্গের হাতেই এই চেতনা গড়ে উঠে এবং তা রাজনৈতিক মুসলিম জাতীয়তাবাদের রূপ ধারণ করে।

স্যার সৈয়দ আহমদ মুসলমানদের মধ্যে সামাজিক ও জাতীয় চেতনা সৃষ্টির জন্য শুধু প্রবন্ধ রচনা বা ভাষন দিয়ে থেমে থাকেন নি। বরং "সায়েন্টিফিক সোসাইটি" "বৃটিশ ইন্ডিয়ান এসোসিয়েশন," "মোহামেডান এডুকেশনাল কনফারেন্স," "পেট্রিওটিক এসোসিয়েশন,"

Dhaka University Institutional Repository

"এ্যাংলো ইন্ডিয়ান ডিফেন্স এসোসিয়েশনের" মত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে তিনি সামাজিক জাতীয় ও রাজনৈতিক ঐক্যবোধ জাগ্রত করার চেষ্টা করেন। এরপর তিনি কলেজ প্রতিষ্ঠা করে তরুন শিক্ষিত সমাজকে সামাজিক ও জাতীয় চেতনায় উৎসাহিত করার জন্য সুদুর প্রসারী পরিকল্পনা গ্রহন করেন।

স্বতন্ত্র আবাসিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে জাতীয় চেতনা সৃষ্টির প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করে স্যার সৈয়দ ১৮৯৪ সালে "মোহামেডান এডুকেশনাল কনফারেন্সের" নবম অধিবেশনে বলেনঃ-

> "সারা ভারতে মুসলমানেরা ছড়িয়ে আছে। সরকার ও মিশনারীরা ধর্মীয় দৃষ্টিকোন থেকে বিভিন্ন স্থানে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যদিও স্থাপন করেছেন, কিন্তু সেখানে মুসলমানদের সংখ্যা খুবই কম, অন্যান্য সম্প্রদায়ের সংখ্যা বেশী ছিল। ফলে তাদের মধ্যে জাতীয় চেতনা তো দুরের কথা শিক্ষার ব্যাপারে ও তাঁরা পরস্পরের সাহায্য করতে পারবে না। সুতরাং এ ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা লাভ করে আমাদের জাতি সত্যিকার জাতিতে পরিণত হবে এ আশা অবাস্তব"।[১৩৯]

কিন্তু ইংরেজ সরকার কর্তৃক মুসলমানদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গুলি ধ্বংস সাধন ও মুসলমান সমাজ কর্তৃক অসহযোগ নীতি অবলম্বন সত্যেও মুসলমানদের মধ্যে কিছু কিছু ইংরেজী শিক্ষার প্রসার ঘটতে থাকে। তবে পরিতাপের বিষয় যে, শিক্ষা সমাপনের পর মুসলমানদের ভাগ্যে সরকারী চাকুরী জুটতনা। এই প্রসংঙ্গে ডাঃ উইলিয়াম হান্টার তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থে ১৮৭১ সালে হিন্দু মুসলিম কর্মচারীর মধ্যে যে হিসাব দিয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

তা নিম্নে পেশ করা হলোঃ

ক্রমিক নং	চাকুরীর নাম	হিন্দু	মুসলমান
০১।	অতিরিক্ত সহকারী কমিশনার	৭ জন	০ জন
০২।	ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর	১১৩ জন	৩০ জন
০৩।	আয়কর বিভাগ	৪৩ জন	০৬ জন
০৪।	রেজিস্ট্রেশন	২৫ জন	০২ জন
০৫।	ছোট আদালতের জজ	২৫ জন	০৮ জন
০৬।	মুনসেফ	১৭৮ জন	৩৭ জন
০৭।	জন কল্যাণ বিভাগ	১২৫ জন	০৪ জন
০৮।	চিকিৎসা বিভাগ	৬৫ জন	০৪ জন
০৯।	জনশিক্ষা	১৪ জন	০১ জন
	সর্ব মোট	৫৯৫ জন	৯২ জন

[১৪০]

আবার কোন কোন লেখকের ধারণা স্যার সৈয়দ শুধু উত্তর ভারতীয় মুসলমানদের সংস্কার করতে চেয়েছিলেন। অর্থাৎ সর্ব ভারতীয় মুসলমানদের নয়। এই ধারণা ঠিক নয়। তিনি " নিখিল ভারত জাতীয় কংগ্রেস" প্রতিষ্ঠান সাথে সাথে সর্ব ভারতীয় মুসলিম স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠা করার প্রত্যাশী ছিলেন। তাঁর "মুসলিম এডুকেশ্যনাল কনফারেন্স" এর প্রথম অধিবেশনের ভাষনে বলেন, "মুসলিম এডুকেশ্যনাল কনফারেন্স" প্রতিষ্ঠা হয়েছিল সারা ভারতের জন্য।[১৪১]

তিনি আজীবন ভারতীয়দের বরং মুসলমানদের জাতীয় উন্নতি ও সম্মান কামনা করতেন। তিনি ১৮৭৩ সালে "আঞ্জুমানে ইসলামিয়ার" উদ্যোগে এক সভায় জাতীয় সম্মান কি ব্যাখ্যা করে বলেন, জাতীয় সম্মান হলো একটি জাতি আস্তে আস্তে সুখ শান্তি অর্জন করবে, জ্ঞান বিজ্ঞানে বেশীর ভাগ লোক শিক্ষিত ও পরিমার্জিত হবে, দেশ-বিদেশে ঘুরবে ও সবার সাথে ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে সাধুতা সততা ইত্যাদি মানবীয় গুনে গুনান্বিত হবে।

Dhaka University Institutional Repository

আর এসব গুন অর্জিত হলে শুধু নিজের মান ইজ্জত লাভ হবে না বরং তাদের ধর্মীয় ইজ্জত ও বৃদ্ধি পাবে। লাহোরের অধিবেশনে স্যার সৈয়দ বলেন, ইসলাম মানবীয় গুনে সমৃদ্ধ। তাই এই গুন গুলি অর্জিত হলে তাদের পার্থিব সম্পদ ও সুখ শান্তি পায়ের ধুলু নিতে বাধ্য।[১৪২]

মোটকথা দেশের জাতীয় উন্নতি ও জাতীয় সম্মান লাভের জন্য স্যার সৈয়দ জাতিকে কয়েকটি পথ অনুসরন করার পরামর্শ দান করেন। যেমন তাঁর মধ্যে বিশেষ ভাবে খ্যাত কৃষি উন্নতি, ব্যবসা বাণিজ্য ও চাকুরী বাকরী। তবে চাকুরীকে তিনি সবচেয়ে ছোট পেশা হিসাবে বর্ণনা করছেন।[১৪৩] কিন্তু সময়ের দাবিতে সরকারের সাথে সাথে প্রশাসনিক ক্ষেত্রে নিযুক্ত এই পেশাকে সাময়িক ভাবে জরুরী বলে মনে করতেন।[১৪৪]

সুতরাং জাতির মধ্যে এই সব পথ বা পন্থা বাস্তবায়ন হওয়ার জন্য দুটি জিনিসের বেশ প্রয়োজন ছিল। ১) শান্তিপূর্ণ পরিবেশ ও ২) শিক্ষাদীক্ষা বিস্তার ঘটানো।

স্যার সৈয়দ আহমদ এদুটি সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেনঃ বৃটিশ শাসন আমলে দেশে শান্তি শৃংখলা বিরাজমান ছিল। আর এখন শুধু দরকার শিক্ষাদীক্ষার প্রসার ঘটানো।[১৪৫]

তাই উপরোক্ত আলোচনার পর একথা বলা যায় যে, একটি জাতি যখন জাতীয় চেতনা ও মর্যাদার উদ্বুদ্ধ হবে তখন জাতি তাঁর কাঙ্খিত স্বাধীনতার লক্ষ্যে পৌছতে পারবে। তবে এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য জাতিকে শিক্ষা দীক্ষায় ও চাকুরী বাকুরীতে উন্নতি অর্জন করতে হবে।

মানব কল্যাণ সাধনই শ্রেষ্ঠতম ইবাদত ঃ

স্যার সৈয়দ যখন জাতির স্বার্থে জাতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার পরিকল্পনা নিয়ে অর্থ সঞ্চয় অভিযান শুরু করেন তখন তাকে জাতির তীব্র বিরোধিতার সম্মুখীন হতে হয়। কারণ সে সময় সওয়াব ও ইবাদত সম্পর্কে সাধারণ মানুষের ভুল ধারণা ছিল। তাঁরা মনে করত ফরজ ইবাদতের পর ধর্মীয় শিক্ষা অর্জন, কুরআন তিলওয়াত ও দো'আ মাসুরাকে মনে করতো পীরদের নির্ধারিত ওয়াযীফা পাঠই ইবাদত।

Dhaka University Institutional Repository

তাই তিনি জাতির নিকট শিক্ষা বিস্তারের জন্য ঐক্য ও আর্থিক সাহায্য কামনা করেন এবং বলেন ইংরেজ সরকার প্রবর্তিত শিক্ষা ব্যবস্থা ছিল মূলতঃ মুসলমানদের জাতীয় আদর্শ বিরুদ্ধ।[১৪৬]

বস্তুত জাতীয় মঙ্গল ও মানব কল্যাণ সাধন করা যে শ্রেষ্ঠ ইবাদত ও সওয়াব এদিকে তাদের কোন খেয়ালই ছিল না। স্যার সৈয়দ মুসলমানদের সওয়াব ও ইবাদত সম্পর্কে এই সংকীর্ণ ধ্যান ধারণা পরিবর্তনের চেষ্টা করেন। তিনি বলতেন, শুধু বেহেশত লাভের উদ্দেশ্য ইবাদত করা স্বার্থপরতারই সামিল।[১৪৭]

সওয়াব ও ইবাদতের প্রচলিত অর্থ পরিবর্তন সাধন করে স্যার সৈয়দ এর পরিসর বৃদ্ধির জন্য জাতির মানসিকতার পরিবর্তন ঘটান। তিনি মুসলমানদের বোঝান যে, প্রকৃতি নিয়মের প্রয়োজনে এবং যুগের চাহিদার তাগিতেই যে কাজ করা হয় তাই ইবাদত।

তিনি এই উদ্দেশ্যে বলেনঃ

> "কোথাও পানির সমস্যা দেখা দিলে সেখানে নফল নামায পড়া বা কুরআন তিলওয়াত করার চাইতে ও পানি আনা এবং লোকদের তা পান করানোই বেশী সওয়াবের কাজ হবে। কাজেই বর্তমানে মুসলমানদের জাতীয় কল্যাণ সাধণের যদি চেষ্টা করা হয় তবে তা রাত জেগে নফল নামাজ পড়ার চাইতে বেশী সওয়াবের কাজ হবে।[১৪৮]

তাই আমি ও স্যার সৈয়দ আহমদের কথার সাথে সূর মিলিয়ে বলতে চাই আল্লাহ প্রদত্ত এই সুন্দর পৃথিবীতে মানব কল্যাণ সাধনই জাতির শ্রেষ্ঠ ইবাদত।

Dhaka University Institutional Repository

আধ্যাত্মিক ও বৈষয়িক জীবন ঃ

মানব জীবন ও মানব সমাজের এমন কতগুলি দিক রয়েছে যা ধর্মের সীমা বর্হিভূত এবং যা সম্পূর্ণ ধর্মনিরপেক্ষ। তাই এ গুলির উপর ধর্মের কোন নিয়ন্ত্রন নেই। স্যার সৈয়দ এর মতে মানব জীবনের দুটি দিক আছেঃ-

১। আধ্যাত্মিক জীবন

২। বৈষয়িক জীবন

> "যে ধর্ম সত্য নিষ্ট বৈষয়িক ব্যাপারে তাঁর কোন ভূমিকা নেই। মানুষের শুধু মাত্র আধ্যাত্মিক সংস্কার ও উৎসর্য সাধনের জন্যই আল্লাহ তাআলা নবীদের দুনিয়ায় পাঠিয়েছেন। তাই ধর্ম আর্বিভূত নবীদের বৈষয়কি ব্যাপারে কোন কর্তব্য ছিল না"।[১৪৯]

কারণ নবীরা ছিলেন উচ্চ জ্ঞান ও উচ্চ গুনাবলীল অধিকারী। যদি ও তাঁরা মানুষের আত্মিক ও চারিত্রিক উৎকর্য সাধনের জন্য আবির্ভূত হয়েছিলেন, তবুও মানুষ নিজ নিজ বৈষয়িক সমস্যা সমাধানের জন্য শুধু তাঁদের সততা ও যোগ্যতায় আকৃষ্ট হয়ে পরামর্শ চাইতো। মোটকথা নবীদের কার্যাবলীকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়।

১) নবী রূপে ও

২) সামাজিক ও রাজনৈতিক নেতারূপে

স্যার সৈয়দের ভাষায়ঃ

দুনিয়াতে আধ্যাত্মিক ও বৈষয়িক দু'প্রকার কাজ রয়েছে। এ দুইটির অন্য শব্দ হলো ধর্মীয় ও পার্থিব। পার্থিব বিষয়াদির সাথে ধর্মের কোন সম্পর্ক নেই। তবে এমন কিছু বিষয় আছে, যা মানুষের চরিত্রের উপর প্রভাব বিস্তার করে থাকে। ধর্ম এ সব বিষয়াদিকে নিয়ন্ত্রন করে। কেননা ইসলাম একটি সত্য ধর্ম। এ মর্মে হাদীসে আছে, ধর্ম সম্পর্কে নবী তোমাদের নিকট যা পেশ করেছেন তা গ্রহন কর এবং যা নিষেধ করেছেন তা থেকে বিরত থাক।[১৫০]

Dhaka University Institutional Repository

যেহেতু পার্থিব বিষয়াদির সাথে ধর্মের কোন সম্পর্ক নেই। তাই এ সন্দেহ দুর করতে গিয়ে স্যার সৈয়দ বলেন, নবীদের বিবেক বুদ্ধি অভিজ্ঞতা ছিল সাধারণ মানুষের চাইতে উর্ধ্বে। যদিও তাঁরা ধর্মীয় বিষয়ে নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য আর্বিভূত হয়েছেন, তবুও তাঁদের পার্থিব বিষয়ে নেতৃত্ব দিতে হয়েছিল। আমাদের নবীজির ক্ষেত্রে ও তাই হলো। আরবের লোকেরা তাঁকে কেবল নবী রূপে নয় বরং পার্থিব সরদার হিসাবে বরণ করেছিল।[১৫১]

সুতরাং আমাদের নবীজীর নেতৃত্ব আরবের লোকেরা ধর্মীয় ও পার্থিব উভয় ক্ষেত্রে নেতারূপে বরণ করে নেয়। তাঁরা জীবনের প্রতিটি কাজে নবীর অনুমোদন লাভের চেষ্টা করতো। নবী ও অনেক ক্ষেত্রে সামাজিক নেতা হিসাবে পার্থিব বিষয়ে তাদের পথ সম্পর্কে বলে দিতেন।[১৫২]

আমার আলোচ্য ব্যক্তি স্যার সৈয়দ তাঁর যুগের ধর্মীয় গুরুদের ধ্যান ধারণা মেনে নিতে পারেননি। কেননা সেই সময়ে ধর্ম গুরুরা মনে করতেন, জাতীয় অবনতির মূল কারণ হলো ধর্মীয় শিক্ষার অবনতি। আর এই কথাটি তিনি মেনে নেননি। কারণ তিনি মনে করতেন, ধর্মীয় শিক্ষার উদ্দেশ্য, পার্থিব শিক্ষার উদ্দেশ্য থেকে আলাদা। তাই তাঁর মতে, জাতীকে ধর্মীয় ও পার্থিব উভয় শিক্ষা সমান ভাবে গ্রহন করতে হবে। কেননা ধর্মীয় শিক্ষা পরকালের জন্য আর পার্থিব শিক্ষা বৈষয়িক জীবনে উন্নতির জন্য দায়ী।[১৫৩]

কাজেই জাতির জন্য আধ্যাত্মিক ও বৈষয়িক জীবন দুইটাই দরকার। সুতরাং আমাদের উচিত আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পথ অনুসরণ করে আধ্যাত্মিক ও বৈষয়িক জীবনে সফলতা লাভ করা।

দ্বীন ও দুনিয়ার সম্পর্ক

দ্বীন-ইসলাম নিছক একটি ধর্ম নয়। এটি একটি বিপ্লবী বিশ্বাস, একটি বিপ্লবী আদর্শ, একটি পূর্ণাঙ্গ ও বিপ্লবাত্তক জীবন বিধান নিঃসন্দেহে।[১৫৪]

কোন ধর্ম সত্য আর কোনটি অসত্য এই বিষয়টি বিচার করার প্রদান মাপকাঠি হলো দ্বীন দুনিয়ার পারস্পারিক সম্পর্ক।

Dhaka University Institutional Repository

পৃথিবীর আদি থেকে আজ পর্যন্ত সকল ধর্ম ও সকল জাতিই দ্বীন-দুনিয়ার সঠিক ব্যাখ্যা নিরুপনে ভুল করেছেন। দ্বীন-দুনিয়ার সম্পর্ক নিরুপনে হেনরী ব্রাঞ্জিয়া "রিভিউ অব রিভিউ" এর চব্বিশতম খন্ডে বলেনঃ যদি কোন বিদ্যান ব্যক্তি ধর্মীয় কুসংস্কার এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানের দিক থেকে ধর্মের প্রতি যে বিরুপ আচারন রয়েছে, এসব নিরসন করে উভয়ের মধ্যকার দৃঢ় সম্পর্কটি পূণঃপ্রতিষ্ঠিত করতে পারতেন, তবে বিরাট কল্যাণ সাধিত হত। এতে করে দ্বীন-দনিয়ার মধ্যে যে টানা হেঁচড়া চলছে তাঁর অবসান ঘটতো।[১৫৫]

স্যার সৈয়দ দ্বীন-দুনিয়ার পারস্পরিক সম্পর্ক বর্ণনা করে বলেনঃ

> "ধর্মীয় উন্নতি ও পার্থিব উন্নতির মধ্যে একটি শক্ত ও অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক রয়েছে। কিন্তু দুর্ভাগ্য যে কোন কোন সময় দুনিয়ার লিপসা ধর্মকে নষ্ট করে দেয়। আর ভালো হলে দুনিয়ার সুখ স্বাচ্ছনদ্য ধর্মকে আরও আলোময় করে।[১৫৬]

সুতরাং স্রষ্টা কর্তৃক নির্ধারিত অবিকৃত মানব প্রকৃতি মানুষের দ্বীন। তাই দ্বীন রক্ষার্থে মানুষকে সচেষ্ট হতে হয়। কারণ পরকালের শাস্তি ও পুরস্কার দ্বীনের বিকৃতির ও অবিকৃতির উপরে নির্ভর করে।[১৫৭]

অন্য দিকে দুনিয়াতে যা কিছু আছে, সব কিছু মানুষের জন্য তৈরি। তাই মানুষের উচিত সেগুলিকে বৈধ উপায়ে উপভোগ করা। মহান আল্লাহ্ বলেনঃ আকাশ জমিনের সব কিছু তোমাদের জন্য বশীভূত করা হয়েছে।[১৫৮]

মোটকথা সমাজ জীবনে শান্তি ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত করাই প্রকৃত ধর্মের কাজ। আর যে ধর্ম শান্তির বদলে অশান্তি এবং শৃঙ্খলার বদলে অনিয়ম জন্ম দেয়, সে ধর্ম আসলে ধর্ম নয় বরং মহা অধর্ম।[১৫৯]

Dhaka University Institutional Repository

পরিশেষে উপরোক্ত আলোচনার পর আমি বলব স্যার সৈয়দ আহম্মদ খান একটি নাম নয় বরং একটি আন্দোলন। তিনি সমাজের প্রতিটি ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন। কেননা তাঁর সমাজ সংস্কার ও জাতীয় উন্নতির জন্য যে সব পরিকল্পনা ছিল তা অত্যন্ত বাস্তব সম্মত পদক্ষেপ। তিনি এসব প্রদক্ষেপের ভিত্তিতে জাতিকে বিশেষ করে মুসলিম সমাজকে বিপদ থেকে উদ্ধার করেছিলেন।

শিক্ষা সংস্কার ঃ

স্যার সৈয়দ আহমদ খান ছিলেন তদালীনন্তন ভারতের মুসলমানদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ শিক্ষা অনুরাগী। মৃত্যুর আগ মুহুর্ত পর্যন্ত তিনি শিক্ষা বিস্তারে ব্যাপৃত ছিলেন। তিনি বহুমুর্খ প্রতিভার অধিকারী হলেও শিক্ষা সংস্কারের ক্ষেত্রে তাঁর অবদান ছিল সবচাইতে বেশী, এই কারণে তাঁকে ভারতের পিতা এবং শিক্ষার অগ্রদুত বলা হত।[১৬০] তিনি ও রাজা রাম মোহন রায়ের মতো মুসলমানদের আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত হবার আহ্বান জানান। তিনি এ উদ্দেশ্য সাধণের জন্য প্রথমে "Vernacular University"[১৬১] স্থাপন করেন।

তিনি মনে করতেন, যত দিন ভারতীয়রা উচ্চতর থেকে নিম্নতর পর্যন্ত সমস্ত শিক্ষা দেশীয় ভাষায় অর্জন করতে না পারবে, ততদিন তাদের উন্নতি হবে না। তাই ১৮৫৯ খ্রীঃ একটি ফার্সী মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে তিনি শিক্ষা সংস্কার আন্দোলন শুরু করেছিলেন। এর পর ১৮৫৭ খ্রীঃ গাজীপুরে মাদ্রসাতুল উলুম নামে আর একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করে শিক্ষা বিস্তার শুরু করেন। তিনি এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে মুসলমানদের ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত করে সমাজে একটি শক্তিশালী মুসলিম জাতি হিসাবে গঠন করতে চেয়েছিলেন।[১৬২]

রাজা রামমোহন রায়ের মত স্যার সৈয়দ ও বিলাতে গিয়ে (১৮৬৯ খ্রীঃ) পাশ্চাত্য শিক্ষা ব্যবস্থা চাক্ষুষ পর্যবেক্ষণ করে দেশে ফিরে ভারতীয় মুসলমানদের মধ্যে পাশ্চাত্য শিক্ষা বিস্তারে আত্মনিয়োগ করছিলেন। এই লক্ষ্যে তিনি "তাহযীবুল আখলাক" নামে উর্দু পত্রিকা বের করেন।[১৬৩]

Dhaka University Institutional Repository

অতঃপর স্যার সৈয়দ ১৮৭৬ খ্রীঃ ৫৯ বৎসর বয়সে চাকুরী ছেড়ে দিয়ে উপমহাদেশের শ্রেষ্ঠতম আধুনিক মুসলিম সংস্কৃতির প্রাণ কেন্দ্র আলীগড়ে কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন। যা পরবর্তীতে (১৯২৭ খ্রীঃ) আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ে রুপান্তরিত হয়।[১৬৪]

বিশেষ করে মুসলিম সমাজে এ ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার উদ্দেশ্য মুসলমানদেরকে উৎসাহিত করার জন্য তিনি শিক্ষা আন্দোলনের কর্মসূচী গ্রহন করেছিলেন। আলীগড় কলেজ ছাড়া ও তিনি শিক্ষা সংস্কার ও শিক্ষা বিস্তারের উদ্দেশ্য "সায়েন্টিফিক সোসাইটি" কায়েম করে বহু বিজ্ঞান বিষয়ক ইংরেজী পুস্তক উর্দু ভাষায় অনুবাদ করেন।

এ প্রসঙ্গে তিনি বলতেন,

> "বিজ্ঞানের ফলে পৃথিবীর নেতৃত্ব পাশ্চাত্যবাসীর হাতে চলে গেছে। তাই বিজ্ঞানে আমাদেরকে পারদর্শী হয়ে নেতৃত্বের আসন অলংকৃত করতে হবে।"[১৬৫]

স্যার সৈয়দ আহমদ মুসলিম সমাজে মুক্তির জন্য আজীবন সংগ্রাম করে গেছেন। তিনি যেখানে যেতেন সেখানে শিক্ষা বিস্তারের জন্য নানা সভা সমিতি ও প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতেন। ১৮৭০ সালে বিলাত থেকে ফিরে এসে তিনি ভারতীয় মুসলমানদের মধ্যে শিক্ষার উন্নতি সমিতি গঠন করে শিক্ষা সংস্কার আন্দোলনকে এগিয়ে নিতে উদ্যোগী হয়েছিলেন।

এই সমিতির সহযোগীতায় মুসলমানদের পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত ও ইসলামী শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে উজ্জীবিত করার জন্য "মোহামেডান এ্যাংলো ওরিয়েন্টাল কলেজ" প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন।[১৬৬]

মুসলমানদের মধ্যে তাঁর শিক্ষা বিস্তারের স্বীকৃতি স্বরুপ তদন্তীন বড় লাট লর্ড লরেন্স তাঁকে একটি স্বর্ণ পদক ও প্রদান করেছিলেন। লন্ডনের "টাইমস" পত্রিকা শিক্ষা ক্ষেত্রে তাঁর অসাধারণ কৃতিত্বের জন্য তাঁকে " The Prophet of Education" নামে অভিহিত করেছিলেন।[১৬৭]

Dhaka University Institutional Repository

১৮৮৬ সালে তিনি "মুসলিম শিক্ষা সম্মেলন" নামে আরো একটি সমিতি গঠন করে ভারতীয় মুসলমানদের অবিসংবাদিত নেতা হিসাবে স্বীকৃতি পেয়ে ছিলেন। সুতরাং শিক্ষা বিস্তার ও শিক্ষা সংস্কারের কর্মসূচী সফল করার উদ্দেশ্যে তিনি যে সমস্ত প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেছিলেন, তাঁর মধ্যে নিম্নে বর্ণিত প্রতিষ্ঠান সমূহ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

১) সায়েন্টিফিক সোসাইটি।

২) আলীগড় বৃটিশ ইন্ডিয়ান এসোসিয়েশন।

৩) মাদরাসাতুল উলুম।

৪) মোহামেডান এ্যাংলো ওরিয়েন্টাল কলেজ।

৫) মোহামেডান সিভিল সার্ভিস এসোসিয়েশন।

৬) মোহামেডান এডুকেশন্যাল কনফারেন্স।

উক্ত প্রতিষ্ঠান গুলো পরিচয় সংক্ষিপ্ত ভাবে উপস্থাপন করা হলো।

সায়েন্টিফিক সোসাইটি (বিজ্ঞান সমিতি) ঃ

এটি উপমহাদেশের মুসলিম সমাজে শিক্ষা বিস্তার ও শিক্ষা সংস্কারের প্রথম প্রতিষ্ঠান। এই প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে স্যার সৈয়দ মুসলিম সমাজে আধুনিক শিক্ষার উন্নয়নের একটি সংস্কার আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন এবং তিনি জাতিকে বুঝাতে সক্ষম হয়েছিলেন যে, আধুনিক শিক্ষা ব্যতীত সমাজের কোন উন্নয়ন সম্ভব নয়।[১৬৮]

এই সমিতির সাথে ধর্ম ও বর্ণের কোন সম্পর্ক ছিল না। প্রকৃত ভাবে এই সমিতি ছিল স্যার সৈয়দের প্রথম এবং তাঁর শিক্ষা কার্যক্রমের একটি গুরুত্বপুর্ণ ও মৌলিক পদক্ষেপ।[১৬৯]

মুলতঃ সায়েন্টিফিক সোসাইটি গঠন করা হয়েছিল দুটি লক্ষ্যকে সামনে রেখে। ১) ভারতীয় প্রাচীন লেখকদের উৎকৃষ্টতম দুস্প্রাপ্য গ্রন্থগুলি সংরক্ষণ ও সেগুলি পুনরায় মুদ্রিত করা এবং ২) বিজ্ঞান বিষয়ের উপর ইংরেজী ও ইউরোপীয় অন্যান্য ভাষায় লিখিত গ্রন্থসমূহ ভারতীয় ভাষায় অনুবাদ করা।[১৭০]

Dhaka University Institutional Repository

আলীগড় ও বৃটিশ ইন্ডিয়া এসোসিয়েশন ঃ

স্যার সৈয়দ আহমদ খান আলীগড়ে থাকাকালীন সময়ে ১৮৫৬ খ্রীঃ "বৃটিশ ইন্ডিয়া এসোসিয়েশন" গঠন করেন। এ সমিতির প্রধান উদ্দেশ্য ছিল সরকারকে জনগনের দাবী দাওয়া সম্পর্কে অবগত করানো। "ভার্নাকিউলর বিশ্ববিদ্যালয়" স্থাপনের প্রস্তাব এই দাবী সমূহের মধ্যে অন্যতম।[১৭১]

মাদ্রাসাতুল উলুম ঃ

১৮৭৩ সালে স্যার সৈয়দের বড় ছেলে সৈয়দ মাহমুদ বিলাতের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পাঠ্যসূচীর আলোকে একটি পাঠ্যসূচী "শিক্ষা উন্নয়ন কমিটির" সদস্যদের এক সভায় পেশ করলে সঙ্গে সঙ্গে তা অনুমোদিত হয়। অতঃপর ১৮৭৫ সালের ২৪শে মে তৎকালীন আলীগড়ের ডেপুটি ক্যালেক্টর ও শিক্ষা উন্নয়ন কমিটির সেক্রেটারী মৌলভী মোহাম্মদ করীম "মাদ্রাসাতুল উলুমের" উদ্বোধন করেন।[১৭২] এবং ১৮৭৫ সালের জুন মাস থেকে রীতিমত ক্লাশ শুরু করা হয়।[১৭৩]

মোহামেডান এ্যাংলো ওরিয়েন্টাল কলেজ ঃ

অতঃপর স্যার সৈয়দ তৎকালীন গভর্নর লর্ড লিটনকে দিয়ে (১৮৭৬-১৮৮০খ্রীঃ) এম, এ, ও, কলেজের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করান।[১৭৪] দিল্লীতে অবস্থান কালে স্যার সৈয়দের সাথে লর্ড লিটনের সাথে ঘনিষ্ঠতা হয়। সে সময় তিনি স্যার সৈয়দকে কথা দিয়েছিলেন যে, তিনি সময় পেলে "মাদ্রাসাতুল উলুম" পরিদর্শনে যাবে। অবশেষে তিনি ১৮৭৭ সালে আলীগড়ে স্বপরিবারে আসেন এবং মাদ্রাসা পরিদর্শন শেষে এম, এ, ও, কলেজের ভিত্তি স্থাপন অনুষ্ঠানে যোগদান করেন।[১৭৫]

স্যার সৈয়দ এমন একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গঠন করতে চাইতেন, যেখানে মুসলমানেরা তাদের ধ্যান ধারণা, জাতীয় চরিত্র ও স্বকীয় ঐতিহ্য অনুসরণ করে উচ্চ শিক্ষা অর্জন করতে পারে এবং এর মাধ্যমে সারা ভারতীয় মুসলমানদের ঘরে ঘরে জ্ঞানের আলো পৌছাতে পারে। পরবর্তী ইতিহাসে দেখা যায় যে, এ কলেজটি মুসলিম সমাজে এমন একদল জাতীয় নেতার জন্ম দিয়েছিলেন যারা স্বাধীনতা সংগ্রামে অগ্রনী ভূমিকা পালন করেছিলেন।[১৭৬]

Dhaka University Institutional Repository

মোহামেডান সিভিল সার্ভিস এসোসিয়েশন ঃ

ভারতীয় ছাত্রদেরকে আধুনিক শিক্ষা অর্জনের জন্য বিলেতে উৎসাহিত করার উদ্দেশ্যে এ প্রতিষ্ঠানটি (১৮৮৩ খ্রীঃ) গঠিত হয় এবং এর সাথে একটি অর্থ তহবিল ও গঠিন করা হয়েছিল।[১৭৭] এই সংগৃহিত অর্থ দিয়ে ভারতীয় ছাত্রদেরকে ইউরোপে আধুনিক শিক্ষা অর্জন করার জন্য পাঠানো হতো।[১৭৮] এই ধরনের গঠন মূলক কার্যক্রমের ফলে তিনি সমগ্র ভারতের জাতীয় নেতা বিশেষ করে মুসলমানদের এক অভিসংবাদিত নেতায় পরিণত হন।[১৭৯] এর পর তিনি ১৮৮৭ খ্রীষ্টব্দে লর্ড ডাফরিন এর সহযোগীতায় পাবলিক সার্ভিস কমিশনের সদস্য হিসাবে যোগদান করেন।[১৮০] পরবর্তীতে এই এসোসিয়েশন "আলীগড় মোহামেডান এসোসিয়েশন" নামে পরিবর্তীত হয়"।[১৮১]

মোহামেডান এডুকেশন্যাল কনফারেন্স গঠন ঃ

উইলিয়াম হান্টারের শিক্ষা কমিশন থেকে পদত্যাগ[১৮২] করার পর তাঁর প্রস্তাবিত শিক্ষা সংস্কার ও শিক্ষা বিস্তার কর্মসূচীকে এগিয়ে নিয়ে যাবার উদ্দেশ্য তিনি ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে "মোহামেডান এডুকেশনাল কনফারেন্স" নামে একটি সংগঠন কায়েম করেন।[১৮৩]

মোটকথা স্যার সৈয়দ আহমেদ খান ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে মুসলিম সমাজে প্রাশ্চাত্য শিক্ষার সর্বঙ্গীন ও সার্বিক প্রসারের লক্ষে মোহামেডান এডুকেশনাল কনফারেন্স গঠন করেন। এই সংগঠনের উদ্যোগে মুসলিম মেয়েদের জন্য প্রাশ্চাত্য শিক্ষা দানের পরিকল্পনা করা হয়।[১৮৪] এই কনফারেন্স যদিও মুসলমানদের শিক্ষা বিস্তারের একমাত্র সমিতি ছিল তথাপিও এটা ছিল মুসলমানদের একটি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান। তখনকার যুগে মুসলমানগণ এই সংগঠনকে কংগ্রেসের বিকল্প প্রতিনিদিত্বকারী সংগঠন বলে মনে করত। কারণ এই সংগঠনের মাধ্যমে মুসলমানদেরকে শিক্ষা প্রদান ছাড়াও জাতীয় স্বার্থে বিভিন্ন বিষয়ে সচেতন করে তুলা হত।[১৮৫] পরবর্তী কালে এই কনফারেন্সের অধিবেশনে মুসলমানদের প্রথম রাজনৈতিক সংগঠন "অল ইন্ডিয়া মুসলিমলীগ" (১৯০৬ খ্রীঃ)[১৮৬] গঠিত হয়েছিল।[১৮৭]

Dhaka University Institutional Repository

মোটকথা রাজনীতি, শিক্ষা সংস্কার, ধর্ম সংস্কার ইতিহাস রচনা, পত্রিকা প্রকাশ, সাহিত্য চর্চা বিশেষ করে উর্দু সাহিত্যেকে আধুনিকরনে এই কনফারেন্স বিশেষ ভূমিকা পালন করে। যদিও স্যার সৈয়দের যুগে এই প্রতিষ্ঠানটি অরাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে কাজ করেছিল, কিন্তু পরবর্তীতে কংগ্রেসের বিপরীতে উপমহাদেশের মুসলমানদের একমাত্র রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে উঠে।

স্যার সৈয়দ আমহদ, আব্দুল লতিফ ও সৈয়দ আমীর আলী সমসাময়িক ব্যক্তিত্ব ঃ

উত্তর ভারতে স্যার সৈয়দ আহমদ এবং বাংলাদেশে আব্দুল লতিফ ও সৈয়দ আমীর আলী কর্ম ক্ষেত্রে প্রায় একই সময়ে আর্বিভূত হন। তাঁরা উভয়ে সমাজের নেতৃত্বভার গ্রহন করে সিপাহী বিদ্রোহের বিপক্ষে রায় দেন এবং সভা ডেকে বৃটিশ সরকারের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেন।[১৮৮]

উত্তর ভারতে স্যার সৈয়দ আহমদ খান মুসলমানদের জন্য যা করেছেন বাংলার মুসলমানদের জন্য নবাব আব্দুল লতিফ তাই করেছেন। সৈয়দ আহমদ মুসলিম সমাজকে ইংরেজী শিক্ষার দিকে উদ্বুদ্ধ করেছেন, অপরদিকে আব্দুল লতিফ ইংরেজ সরকারকে মুসলিমদের সুযোগ সুবিধা প্রদানের দিকে আগ্রহশীল করে তুলেছে।[১৮৯]

বরং তাদের উভয়ের প্রথম কাজ হল ভারতীয় মুসলমানের প্রতি ইংরেজগণের যে সন্দেহ আছে, তা দূর করা।[১৯০] এছাড়া সুমলিম জাগরনে স্যার সৈয়দ আহমদের অবদান ছিল শিক্ষামূলক ও রাজনৈতিক, অন্যদিকে আব্দুল লতিফের অবদান ছিল ব্যাপক আকারে শিক্ষা ও সংস্কৃতির অঙ্গনে। ভব্লিউ, এস, প্লান্ট তাকে একজন ধর্মীয় নেতা ও সমাজ সংস্কার হিসাবে আখ্যায়িত করেছেন।[১৯১]

যেহেতু স্যার সৈয়দ, নওয়াব আব্দুল লতিফ ও সৈয়দ আমীর আলী ছিলেন প্রায় সমসাময়িক সর্বভারতীয় মুসলিম নেতা। তাই তাঁদের লক্ষ্য ছিল এক ও অভিন্ন। তবে তাদের চিন্তাধারা এবং কার্যক্রমের মধ্যে কিছুটা পার্থক্য দেখা যায়।[১৯২]

Dhaka University Institutional Repository

স্যার সৈয়দ ব্যাপকভাবে এদেশে ইউরোপীয় তহযীব তমদ্দুন গ্রহনের নিদের্শ দেন। কিন্তু আব্দুল লতিফ ও সৈয়দ আমীর আলী প্রাচ্য ও ধর্মীয় ঐতিহ্য বজায় রেখে ইউরোপের আধুনিকতাকে বরণ করার শিক্ষা দেন।[১৯৩]

বস্তুত আব্দুল লতিফের শিক্ষা ও সংস্কার আন্দোলন শুরু হয় স্যার সৈয়দ আহমদের শিক্ষা ও সংস্কার আন্দোলনের বহু আগেই। তবে পশ্চিম ও মধ্য ভারতে স্যার সৈয়দের অবদান বেশী আর বাংলার মাটিতে আব্দুল লতিফের সমাজ সংস্কারের প্রভাব সবচাইতে বেশী গভীর।[১৯৪]

মুসলিম জাতীয়তার বিকাশে আব্দুল লফিত এক বিশিষ্ট ভূমিকা পালন করেন। ১৮৫৩ সালে তিনি মুসলিম সমাজের সার্বিক উন্নতির জন্য ইংরেজী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা গ্রহনের উদ্দেশ্যে জনমত গঠনের জন্য সারা ভারতের মুসলমান ছাত্র কাছ থেকে "মুসলমান ছাত্রদের পক্ষে ইংরেজী শিক্ষা গ্রহনের সুফল" সম্পর্কে ফার্সী ভাষায় একটি রচনা প্রতিযোগিতার আয়োজন করেন।[১৯৫]

বাংলায় মুসলিম জাগরণ ঃ

উনিশ শতকের শেষার্ধে স্যার সৈয়দ আহমদ (১৮১৭-১৮৯৮) ও তাঁর সহযোগিরা যখন উত্তর ভারতে মুসলিম রেনেসাঁ আন্দোলনের মশাল জ্বেলে রেখেছিলেন, তখন বাংলায় অনুরুপ আন্দোলনের দিকপাল ছিলেন নওয়াব আব্দুল লতিফ (১৮২৮-১৮৯৩) বিচারপতি সৈয়দ আমীর আলী (১৮৪৯-১৯২৮), মাওলানা আব্দুর রউফ ওহীদ (১৮২৮-১৮৯৩), উবায়দুল্লাহ সুহরাওয়াদী (১৮৩২-১৮৮৬) প্রমুখ।[১৯৬]

কেননা ১৭৫৭ সালের যুদ্ধের পর লর্ড ক্লাইভ বাংলায় যে শাসন ব্যবস্থা গড়ে তোলেন তাকে পন্নিকর একটি দুস্যরাষ্ট্র বলে অভিহিত করেন, যার উদ্দেশ্য হলো যে সব এলাকায় তার শাসন করার কথা সে সব এলাকা থেকে যতদুর সম্ভব শোষণ করা।[১৯৭]

Dhaka University Institutional Repository

নওয়াব আব্দুল লতিফ তাঁর "মোহামেডান লিটারারী সোসাইটির" মাধ্যমেম মুসলিম জাতির কাছে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরার চেষ্টা করেন।[১৯৮]

নওয়াব আব্দুল লতিফ ফরিদপুর জেলার রাজাপুরে এক সম্ভ্রান্ত কাজী পরিবারে ১৮২৮ সালে জন্ম গ্রহন করেন। তিনি হযরত খালিদ ইবনে ওয়ালিদের বংশধর এবং তাঁর পূর্ব পুরুষগন প্রথম বাগদান থেকে দিল্লী এবং পরে বাংলায় আগমন করেন।[১৯৯]

আবার, অন্যদিকে সৈয়দ আমীর আলী কেবল ইংরেজী শিক্ষার প্রবক্তা ছিলেন না। তিনি রাজনৈতিক সংগঠনের মাধ্যমে মুসলমানদের অভাব অভিযোগের নিরসন এবং তাঁদের ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠানে দৃঢ় বিশ্বাসী ছিলেন। তাঁর "সেন্টাল নেশন্যাল মোহামেডান এসোসিনেশন" একটি আত্মপ্রত্যয় কেন্দ্রিক সংগঠন।[২০০]

১৮৯৮ সালে স্যার সৈয়দের মৃত্যু ঘটলে তাঁর শিক্ষা ও সংস্কার আন্দোলনে ভাটা পড়েনি। কেননা তিনি শিবলী নোমানী, মাওলানা আলতাফ হোসাইন হালী, নওয়াব মুহসিনুল মুলক, মৌলবী চেরাগ আলী, ড. নযীর আহমদ এর ন্যায় নেতৃত্বশীল এমন একদল জাঁদরেল সহযোগি রেখে যান, যারা তাঁর প্রতিষ্ঠিত আলীগড় কলেজ (১৮৭৭) কে কেন্দ্র করে তাঁর মিশনকে আরো সক্রিয় ও আরো সুদূর প্রসারী করার চেষ্টা আত্মনিয়োগ করেন।[২০১]

কিন্তু বাংলাদেশে মুসলমানদের জন্য আলীগড় কলেজের ন্যায় উচ্চ পর্যায়ের কোন আধুনিক স্বতন্ত্র শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেনি। ফলে আব্দুল লতিফের "সোসাইটি" ও আমীর আলীর "এসোসিয়েশন" এর অগ্রযাত্রাকে গতিশীল করে তোলার জন্য উপযুক্ত নেতার তীব্র অভাব দেখা দেয়। মোটকথা উনিশ শতকের শেষ দশকে বাংলার নেতৃত্বে শূণ্যতা দেখা দেয়।[২০২]

Dhaka University Institutional Repository

পরিশেষে বলা যায় যে, মুসলিম জাতির আলোড়িত মনের অবিব্যক্তি ঘটে মুষ্টিমেয় ব্যক্তির চিন্তাধারা ও কর্মতৎপরতার মধ্য দিয়ে উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে। এরা আধুনিক জ্ঞান তথা পাশ্চাত্য শিক্ষা লাভ এবং পরিবর্তীত সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতির সাথে মুসলিম জাতির মন মেজাজকে খাপ খাইয়ে নেয়ার মাধ্যমে তাদের ভাগ্যোন্নয়নের জন্য মরিয়া হয়ে চেষ্টা করেন। উত্তর ভারতে স্যার সৈয়দ আহমদ ও তাঁর একনিষ্ঠ সহযোগীগণ।

আর বাংলায় আব্দুল লতিফ ও আমীর আলী। এরা সমাজ সংস্কার, সামাজিক আন্দোলন, সচেতনতা সৃষ্টি, শিক্ষা সম্প্রসারণ এবং সর্বোপরি সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি স্থাপনের মাধ্যমে আধিকার বঞ্চিত ও অত্যাচারিত মুসলমানদের জন্য বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা আদায়ে গুরুত্ব পূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

Dhaka University Institutional Repository

টিকা ও তথ্য নিদেশ

১। ড. শাহজাহান মুনির, বাংলাসাহিত্যে বাঙালী মুসলমানের চিন্তাধারা, ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৯৩, পৃ. ১০ (ভূমিকা)

২। ড. শাহজাহান মুনির, পূর্বোক্ত, পৃ. ১২ (ভূমিকা)

৩। ড. মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ, স্যার সৈয়দ আহমদ খাঁর ধর্মীয় ও সামাজিক চিন্তাধারা, বাংলাদেশঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন,১৯৮২, পৃ. ১৪৬-১৪৭

৪। ড. মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪৬-১৪৭

৫। ড. মুনতাসির উদ্দিন খান মামুন, পি, এইচ, ডি, থিসিস, পূর্ববঙ্গে সমাজ জীবনে কয়েকটি দিক একটি ঐতিহাসিক পর্যালোচনা, (১৮৫৭-১৯০৫), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, পৃ. ৭৯

৬। ভূদেব মুখোপাধ্যায়, ভুদেব রচনা সম্ভার, কলকাতাঃ শ্যামাচরন দে ষ্ট্রীট, ১৩৬৯, পৃ. ৩০

৭। স্যার সৈয়দ আহমদ খাঁন, তাফসীরুল কোরআন, ২য় খন্ড, লাহোরঃ রেফায়ে আম প্রেস, তা. বি, ১৯৮২, পৃ.৮-১০

৮। পূর্বোক্ত, পৃ. ৮-১০

৯। ড. আব্দুল্লাহ অনুদিতঃ ইসলামি দর্শন, প্রথম ও দ্বিতীয় খন্ড, বাংলাদেশঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ১৯৮১, পৃ.১৯৪

১০। পূর্বোক্ত, পৃ. ১৯৫

১১। খুরশিদ আলম, পরিবেশ সমাজ ও সামাজিক বিকাশ, ঢাকাঃ কাকলী প্রকাশনী, ২০০১, পৃ.৮৫

১২। স্যার সৈয়দ আহমদ, তাফসিরুল কোরআন, পৃ.৮-১০

১৩। পূর্বোক্ত, ৩য় খন্ড, পৃ.৮-১১

১৪। সৈয়দ আমির আলী, দি স্পিরিট অব ইসলাম, অনুদিতঃ মোহাম্মদ দরবেশ আলী খান, বাংলাদেশ ইসলামী ফাউন্ডেশন, পৃ. ২১৭

১৫। স্যার সৈয়দ, মাকালাত, পানি পথি সম্পাদিত, ৫ম খন্ড, লাহোরঃ মজলিস এ তারাক্কী এ আদব, ১৯৬৫, পৃ. ৪৭-৪৮।

১৬। ইসমাইল পানিপথি, ৮ম খন্ড, পৃ. ১৬৯-১৭১

১৭। পূর্বোক্ত, ১ম খন্ড, পৃ. ১৬৮

১৮। ড. মোঃ আব্দুল্লাহ, স্যার সৈয়দ আমহদ খাঁর ধর্মীয় ও সামাজিক চিন্তাধারা, পৃ.১৫১

১৯। স্যার সৈয়দ, তাহযীবুল আখলাক, লাহোরঃ মালেক ফখরুদ্দিন কাকে যাই, তাজির এ কুতুব কওমী বাজারে কাশমিরি, ১৮৯৫ ২য় খন্ড, পৃ. ১৫

২০। তাহযীবুল আখলাক, ২য় খন্ড, পৃ. ১২

Dhaka University Institutional Repository

২১। শহীদ হোসাইন রায়যাকী, স্যার সৈয়দ আওর ইসলাহ এ মুআসারাহ, লাহোরঃ সাকাফাত এ ইসলামিয়া, ১৯৬৩, পৃ. ১৯৬

২২। আলতাফ হোসাইন হালী, হায়াত এ জাবীদ, লাহোরঃ আয়না-এ-আদব চওক, মীনার, ১৯৬৬, পৃ. ১১২

২৩। মাকালাত, ১২মত খন্ড, পৃ. ১৮২

২৪। মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ, মুসলিম জাগরণে কয়েক জন কবি ও সাহিত্যিক, বাংলাদেশ ইসলামি ফাউন্ডেমন, ১৯৮০, পৃ. ৪৮-৪৯

২৫। আলতাফ হোসাইন হালী, পূর্বোক্ত, পৃ.১১০

২৬। স্যার সৈয়দ আহমদ খান মুকাম্মল মাজমুআ লেকচার্স, লাহোরঃ মাকে ফখরুদ্দীন, কাকে যাই, তাজেয়ান-এ-কওমী বাজারে, কাশমীরী, ১৯০০, পৃ.১৫৩

২৭। পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫১

২৮। পূর্বোক্ত, পৃ. ১৮৯

২৯। পূর্বোক্ত, পৃ. ১৯০

৩০। ড. মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ, মুসলিম জাগরনে কয়েক জন কবি সাহিত্যিক, পৃ. ৫৩

৩১। অতুল চন্দ্র রায় ও প্রণব কুমার চট্টোপাধ্যায়, ভারতের ইতিহাসঃ আধুনিক ফ্লা, কলকাতাঃ মৌলিক লাইব্রেরী, ১৯৯৯, পৃ.২৯১

৩২। স্যার সৈয়দ, মাকতুবাত, লাহোরঃ মজলিসে-এ-তবাক্কী-এ-আদব, ১৯৫৯, পৃ. ৫৪

৩৩। আলতাফ হোসাইন হালী, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৬২

৩৪। পূর্বোক্ত, পৃ.১৮৩

৩৫। Mahmud Hossain, History of the freedom movement, Vol.u, Karachi: Historical Society, 1961, P. 518

৩৬। মাজমুআ লেকচাস, পৃ. ৪৭৮

৩৭। Mahmud Hossain, History of the freedom movement, Vol.u, Karachi: Historical Society, 1961, P. 517

৩৮। ড. মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ, স্যার সৈয়দ আহমদ খার সামাজিক ও ধর্মীয় চিন্তাধারা, পৃ. ১৬০

৩৯। সৈয়দ হাশেমী ফরিদাবাদী, তারিখ-এ-মুসলমানানো পাকিস্তান ওয়া ভারত, ২য় খন্ড, করাচিঃ আনজুমান-এ-তারাক্কি-এ-উর্দু-পাকিস্তান, ১৯৫২, পৃ. ৪৫৪-৪৫৬

Dhaka University Institutional Repository

৪০। মাকালাত, ১৫তম খন্ড, পৃ.৪২

৪১। ড. মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ, মুসলিম জাগরনে কয়েক জন কবি ও সাহিত্যিক, পৃ. ৪৬

৪২। মাকালাত, ১৫তম খন্ড, পৃ. ৪৩

৪৩। পূর্বোক্ত, ৫ম খন্ড, পৃ. ১৬৭

৪৪। পূর্বোক্ত, ৫ম খন্ড, পৃ. ১৬৯

৪৫। তুফায়েল আহমেদ, রওশান মুসতাকবিল, বাদায়ুনঃ নিজামি প্রেস, ১৯৩৮, পৃ. ২০৬

৪৬। আলতাফ হোসাইন হালী, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩২০

৪৭। আলতাফ হোসাইন হালী, পূর্বোক্ত, পৃ.৬১৬

৪৮। পূর্বোক্ত, পৃ. ১৬৮

৪৯। শাহিদ হোসাইন, রায়যাকী, পূর্বোক্ত, পৃ. ২১৭

৫০। আল-কুরআন, সূরাতুল মায়িদাহ, আয়াতঃ ৫

৫১। ইসমাইল পানি পথি, ৫ম খন্ড, ১৬৫

৫২। ড. মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ, স্যার সৈয়দ আহমদ খার ধর্মীয় ও সামাজিক চিন্তাধারা, পৃ. ৯৬

৫৩। আলতাফ হোসাইন হালী, পূর্বোক্ত, পৃ. ২১৩-২২৩

৫৪। মাওলানা মুহাম্মদ আকরাম খান, মুস্তফা চরিত্র, ঢাকাঃ কাকলী প্রকাশনী, বাংলাবাজার, ১৯৯৮, পৃ. ১০৫

৫৫। ড. মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ, মুসলিম জাগরনে কয়েকজন কবি ও সাহিত্যিক, পৃ.৮-৯

৫৬। আলতাফ হোসাইন হালী, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩৫

৫৭। ড. মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ, মুসলিম জাগরনে কয়েকজন কবি ও সাহিত্যিক, পৃ.১২-১৩

৫৮। মাকালাত, ১২তম খন্ড, পৃ. ১৭২

৫৯। পূর্বোক্ত, ১৫তম, পৃ. ২৩১-২৩৫

৬০। মাজমুআ লেকচার্স, পৃ. ১১৮

৬১। আলতাফ হোসাইন হালী, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৬৮

৬২। পূর্বোক্ত, পৃ. ১৬৯

৬৩। মাকালাত, ৯ম খন্ড, পৃ. ১২৫

৬৪। আলতাফ হোসাইন হালী, পূর্বোক্ত, পৃ.১৯৮

৬৫। মাজমুআলেকচার্য, পৃ. ৩৭৩

Dhaka University Institutional Repository

৬৬। স্যার সৈয়দ আহমদ, আবযাব-এ-বাগওয়াত, অনুদিতঃ ড. মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ, ভারতের বিদ্রোহের কারণ বাংলাদেশ ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ১৯৭০, পৃ. ১৩

৬৭। আলতাফ হোসাইন হালী, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬১৮

৬৮। মাকলতে, ৫ম খন্ড, পৃ. ৬৯

৬৯। পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৯

৭০। তাফসীরুল কুরআন, ২য় খন্ড, পৃ. ৯

৭১। রওশন মুসতাকবিল, পৃ.১০০

৭২। পূর্বোক্ত, পৃ. ১১০

৭৩। স্যার সৈয়দ, তাহযীবুল আখলাক, লাহোরের মালেক ফখরু উদ্দীন কাকে যাই, তাজির-এ-কওমী বাজারে কাশমিরী, ১৮৯৫, ২য় খন্ড, পৃ.১

৭৪। শাহজাহান মনির, পূর্বোক্ত, পৃ.৩১

৭৫। ড. মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ, স্যার সৈয়দ আহমদ খার ইশীয় ও সামাজি চিন্তাধারা, পৃ. ১৮৮

৭৬। তাহযীবুল আখলাক, ২য় খন্ড, পৃ. ৫

৭৭। ড. এনাম-উল-হক, ২য় খন্ড, পৃ.৬৩

৭৮। তাহযীবুল আখলাক, ২য় খন্ড, পৃ. ৯

৭৯। মাজমুআলেকচার্য, পৃ.৩০

৮০। শাহজাহান মনির, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩১

455552
ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

৮১। মাকালাত, ৮ম খন্ড, পৃ. ৩৭

৮২। রওশন মুসতাকযিল, পৃ. ১৮৬-১৮৭

৮৩। আলতাফ হোসাইন হালী, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬১৮

৮৪। তাহযীবুল আখলাক, ২য় খন্ড, পৃ.৬

৮৫। মাকালাত, ১০ম খন্ড, পৃ. ৩৫

৮৬। স্যার সৈয়দের সামাজিক প্রথা ও রীতিনীতি সম্পর্কে দুটি প্রবন্ধ আছে। যেমনঃ- (১) রসম ও রওয়াজ (তাহযীব) ২য় খন্ড, পৃ.৭

(২) রসম ও রেযয়াজ কি পাবন্ধীকে নুকসানাত, (তাহযীব), ২য় খন্ড, পৃ.২৫

Dhaka University Institutional Repository

৮৭। শাহজাহান মনির, পূর্বোক্ত, পৃ.৯

৮৮। মাকালাত, ১২তম খন্ড, পৃ. ৮

৮৯। আলতাফ হোসাইন হালী, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬১৫

৯০। শেখ মুহাম্মদ লুৎফর রহমান, ইসলামঃ রাষ্ট্র ও সমাজ, ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৭৭, পৃ. ৪০০-৪০১

৯১। ড. মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ, স্যার সৈয়দ আহমদ খার ধর্মীয় ও সামাজিক চিন্তাধারা, পৃ. ২০৭

৯২। পূর্বোক্ত, পৃ. ২০৮

৯৩। পূর্বোক্ত, পৃ. ২০৮

৯৪। কে আলী, ইসলামের ইতিহাস, ঢাকাঃ আলী পাবলিকেশন্‌স, ১৯৭৬, পৃ.২১

৯৫। সৈয়দ আমীর আলী, দি স্পিরিট অবইসলাম, অনুদিতঃ অধ্যাপক মুহাম্মদ দরবেশ আলী খান, পৃ.২১৭

৯৬। পূর্বোক্ত, পৃ. ৯০

৯৭। মাকালাত ৫ম খন্ড, পৃ. ১৮৮-১৯৩

৯৮। ড. মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ, স্যার সৈয়দের ধর্মীয় ও সামাজিক চিন্তাধারা, পৃ.২১৪-২১৫

৯৯। মাকালাত, ৫ম খন্ড, পৃ. ১৯৪-৯৯

১০০। পূর্বোক্ত, পৃ.১৯৭

১০১। পূর্বোক্ত, পৃ.১৯৭

১০২। পূর্বোক্ত, পৃ. ১৯৮

১০৩। পূর্বোক্ত, পৃ. ১৯৯

১০৪। মাজমুআ লেকচার্য, পৃ. ৭৯

১০৫। পূর্বোক্ত, পৃ. ৯৬

১০৬। মাকালাত, ৫ম খন্ড, পৃ.২০০

১০৭। পূর্বোক্ত ৫ম খন্ড, পৃ. ২৬৯-২৭০

১০৮। পূর্বোক্ত, পৃ. ২৭০

১০৯। ড. মুশতাক আহমদ, স্যার সৈয়দ কী নছরী খেদমত, দিল্লীর এডুকেশনাল বুক হাউস,১৯৯৩,পৃ.৭৪

১১০। শাহজাহান মনির, পূর্বোক্ত, পৃ. ১০-১১

১১১। মাফালত, ৫ম খন্ড, পৃ.২৬৯

১১২। তাহযীবুল আখলাক, ২য় খন্ড, পৃ.৫২৩

Dhaka University Institutional Repository

১১৩। মাকালাত, ৫ম খন্ড, পৃ. ৮৭-৯৬

১১৪। পূর্বোক্ত, পৃ. ৯৩

১১৫। মাকালাত, পূর্বোক্ত, পৃ. ৯৫

১১৬। মাকালাত, ১২তম খন্ড, পৃ.২৭০

১১৭। পূর্বোক্ত, ৫ম খন্ড, পৃ. ৯১

১১৮। পূর্বোক্ত, ৫ম খন্ড, পৃ. ১৪০

১১৯। মাজমুআ লেকচার্য, পৃ. ২৮-৩৬

১২০। পূর্বোক্ত, ৫ম খন্ড, পৃ. ১৫

১২১। পূর্বোক্ত, ৫ম খন্ড, পৃ. ১৫

১২২। মাকালাত, ৫ম খন্ড, পৃ.১৭

১২৩। মাজমুআ লেকাচার্য, পৃ.-২৮-৩৬

১২৪। মাকালাত, ১২তম খন্ড, পৃ. ২-৩

১২৫। মাকালাত, ১২তম খন্ড, পৃ. ৮-৯

১২৬। মাকালাত, ১২তম খন্ড, পৃ. ১১-১৩

১২৭। পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩

১২৮। আব্দুল হক, (উদ্ধৃত) পৃ. ১৪৫

১২৯। আব্দুল হক, পূর্বোক্ত- ১৪৬

১৩০। মাকালাত, ১২তম খন্ড, পৃ.১৪

১৩১। মাকালাত, ১২তম খন্ড, পৃ. ১৫

১৩২। মাকালাত, ১২তম খন্ড, পৃ. ১৮

১৩৩। মাকালাত, ১২তম খন্ড, পৃ. ১৮

১৩৪। মাজমুআ লেকচার্য, পৃ. ৯৮

১৩৫। ভূবেদ মুখোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃ. ২ (ভূমিকা)

১৩৬। মাজমুআলেকচার্য, পৃ.২৮

১৩৭। আলতাফ হোসেন হালী, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৯০-১৯১

১৩৮। মাজমুআলেকচার্য,পৃ. ৪৬২-৪৬৩

Dhaka University Institutional Repository

১৩৯। মুহাম্মদ ওয়ালী উল্লাহ, আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৭৮, পৃ. ১৩০

১৪০। মাজমুআ লেকচার্য, পৃ. ২৮০-২৮৩

১৪১। মাজমুআ লেকচার্য, পৃ. ১০২

১৪২। পূর্বোক্ত, পৃ. ১০১

১৪৩। পূর্বোক্ত, পৃ. ২০৩

১৪৪। পূর্বোক্ত, পৃ. ১০২

১৪৫। মাকালাত, ১ম খন্ড, পৃ.১৪৭

১৪৬। পূর্বোক্ত, ১ম খন্ড, পৃ. ১৫২

১৪৭। পূর্বোক্ত, ১ম খন্ড, পৃ. ১৫৩

১৪৮। পূর্বোক্ত, ৯ম খন্ড, পৃ. ১০

১৪৯। পূর্বোক্ত, পৃ. ১০

১৫০। মাকালাত, ৫ম খন্ড, পৃ.৪

১৫১। পূর্বোক্ত, ৫ম খন্ড, পৃ. ৪

১৫২। মাজমুআ লেকচার্য, পৃ.১৫৩

১৫৩। মুহাম্মদ আব্দুর রহীম, ইসলামে জিহাদ, ঢাকাঃ খায়রুন প্রকাশনী, ১৯৮৬, পৃ. (ভূমিকা)

১৫৪। শিবলী নোমানী, ইসলামী দর্শন, ১ম ও ২য় খন্ড, অনুদিতঃ ড. আব্দুল্লাহ, বাংলাদেশ ইসলামিক ফাউন্ডেশন,১৯৮১, পৃ.৩৭৮-৩৭৯

১৫৫। মাকালাত, ৫ম খন্ড, পৃ.৮২-৮৩

১৫৬। বাংলা বিশ্বকোশ, ৪র্থ খন্ড, ঢাকাঃ নওরোজ কিতাবিস্তান, ১৯৭৫, পৃ. ৮০২

১৫৭। অনুদিতঃ ড. আব্দুল্লাহ, ইসলামী দর্শন, পৃ. ৩৮০

১৫৮। অনুদিতঃ ড. আব্দুল্লাহ, ইসলামী দর্শন, পৃ. ১১৬-১১৭

১৫৯। ড. মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ, স্যার সৈয়দ আহমদ খান ধর্মীয় ও সামাজিক চিন্তাধারা, পৃ. ২৬৭

১৬০। ড. মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ, মুসলিম জাগরনে কয়েকজন কৃতি সাহিত্যিক, ঢাকাঃ ইসলামী ফাউন্ডেশন, ১৯৮০, পৃ.১৭

১৬১। কে আলী, পাকভারতের মুসলমানদের ইতিহাস, ঢাকাঃ আলী পাবলিকেসন্স, ১৯৬৯, পৃ.৪৩৩

১৬২। আনীসুজ্জামান, মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্যে, ১৭৫৭-১৯০৮, ঢাকাঃ লেখক সংঘ প্রকাশনী, ১৯৬৪, পৃ.৬৯-৭০

Dhaka University Institutional Repository

১৬৩। প্রফেসর মুহাম্মদ খলীলুল্লাহ, তাহরীক এ পাকিস্তান, করাচীরঃ শুবা-এ-তছনীফ ওয়া তালীফ ওয়া তরজমা সরকারী উর্দু কলেজ, ১৯৮২, পৃ.৫১

১৬৪। পূর্বোক্ত, পৃ.৫১

১৬৫। ড. মুহাম্মদ এনাম উল হক, ভারতের মুসলমান ও স্বাধীনতা আন্দোলন, ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৯৫,পৃ.৭৬

১৬৬। কে আলী ভারতের মুসলমান ও স্বাধীনতা আন্দোলন, ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৫৫. পৃ. ৪৩৫

১৬৭। প্রফেসর খলীফ আহমদ নেজামী, স্যার সৈয়দ আওরা আলীগড় তাহরীক, আলীগড়ঃ এডুকেশন্যাল বুক হাউস, ১৯৮২, পৃ.২৩৩-২৩৪

১৬৮। ড. মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ, স্যার সৈয়দ আহমদ খানের ধর্মীয় ও সামাজিক চিন্তাধারা, পৃ. ৮২

১৬৯। ড. আব্দুল হক, স্যার সৈয়দ আহমদ খান, হালাত ও আফকায়, পাকিস্তানঃ আঞ্জুমানে তারাক্কি-এ-উর্দু, ১৯৫৯, পৃ. ১৩৫

১৭০। আলতাফ হোসাইন হালী, হায়াত-এ-জাবীদ, ১ম খন্ড, পৃ. ৫৩

১৭১। ড. মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ, মুসলিম জাগরনে কয়েকজন কবি সাহিত্যিক, পৃ. ২৬

১৭২। আলতাফ হোসেন হালী, পূর্বোক্ত ১ম খন্ড, পৃ. ২৪১

১৭৩। আলতাফ হোসেন হালী, পূর্বোক্ত, ১ম খন্ড, পৃ. ২৪৫

১৭৪। আলতাফ হোসেন হালী, পূর্বোক্ত, ১ম খন্ড, পৃ. ২৪৫

১৭৫। ড. মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ, স্যার সৈয়দ আহমদ খানের ধর্মীয় ও সামাজিক চিন্তাধারা, পৃ. ১১২

১৭৬। আলতাফ হোসেন হালী, পূর্বোক্ত, ১ম খন্ড, পৃ. ৩০১

১৭৭। আলতাফ হোসেন হালী, পূর্বোক্ত, ১ম খন্ড, পৃ. ৩০১-৩৩০

১৭৮। কে আলী, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৩৫

১৭৯। ড. এনামুল হক, পূর্বোক্ত, পৃ. ৮০

১৮০। আলতাফ হোসেন হালী, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩০১

১৮১। ড. মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ, স্যার সৈয়দ আহমদ খানের ধর্মীয় ও সামাজিক চিন্তাধারা, পৃ, ১২৬-১২৭

১৮২। আলতাফ হোসেন হালী, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩০৯

১৮৩। ইসলামী বিশ্ব কোষ, বাংলাদেশঃ ইসলামী ফাউন্ডেশন, ১৭শ খন্ড, পৃ.৭৩৩

১৮৪। অতুল চন্দ্র রায় ও প্রনব কুমার চট্টপাধ্যায়, পৃ. ৩৫১-৩৬৩

Dhaka University Institutional Repository

১৮৫। ১৯০৬ সালের ডিসেম্বর মাসে নবাব স্যার সলিমুল্লাহর উদ্যোগে ঢাকায় অনুষ্ঠিত হোহামেডান কনফারেন্সর বার্ষিক সভায় "অল ইন্ডিয়া মুসলীমলীগ" গঠন করা হয়। দ্র. প্রফেসর মোহাম্মদ খলীলুল্লাহ: পূর্বোক্ত, পৃ. ৯১-৯৮

১৮৬। অতুল চন্দ্র রায় প্রনব কুমার চট্রপাধ্যায়, পৃ. ৩৭৭-৩৭৯

১৮৭। ড. ওয়াকিল আহমদ উনিশতকে বাঙালী মুসলমানের চিন্তা চেতনার ধারা, ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, ২য় খন্ড, ১৯৮৩, পৃ.১৫৮

১৮৮। এম, এ, রহিম, বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস, (১৭৫৭-১৯৪৭), ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৭৬, পৃ. ১৫৫

১৮৯। ড. ওয়াকিল আহমেদ, পূর্বোক্ত, ২য় খন্ড, পৃ. ১৫৮

১৯০। এম, এ, রহিম, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫৫

১৯১। ড. মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ, মুসলিম জাগরনে কয়েকজন কবি ও সাহিত্যিক, বাংলাদেশঃ ইসলামী ফাউন্ডেশন, ১৯৮০, পৃ. ৪৮

১৯২। পূর্বোক্ত, পৃ.৪৮

১৯৩। ড. মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৯।

১৯৪। পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৯

১৯৫। ড. মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ, বাংলাদেশের দশ দিশারী, বাংলাদেশঃ ইসলামী ফাউন্ডেশন, ১৯৯১, পৃ.৩২

১৯৬। ড. এনামুল হক, পূর্বোক্ত, পৃ. ৮৪

১৯৭। ড. মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ, মাওলানা ওবায়দুল্লাহ সহরাওয়ার্দী, বাংলাদেশঃ ইসলামী ফাউন্ডেশন,১৯৮৪, (ভূমিকা)

১৯৯। ড. এনামুল হক, পূর্বোক্ত, পৃ. ৮৪

২০০। ড. মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ, মাওলানা ওবায়দুল্লাহ সহরাওয়ার্দী,(ভূমিকা)

২০১। ড. মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ, বাংলাদেশর দশ দিশারী, পৃ.৩২

২০২। পূর্বোক্ত, পৃ. ৩২-৩৩

* উল্লেখ্য যে, মোহামেডান লিটারারী সোসাইটি ও সায়েন্টিফিক সোসাইটি উভয় সমিতির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ছিল পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের প্রতি মুসলমান সমাজের দৃষ্টি আর্কষণ করা এবং মুসলমান ও ইংরেজদের মধ্যে সু-সম্পর্ক স্থাপন কিন্তু লিটারারী সোসাইটি ছিল সাংস্কৃতিক ও সমাজ উন্নয়ন মুলক। পক্ষান্তরে সায়েন্টিফিক সোসাইটি ছিল তমাদ্ধুনিক। দ্র. সওগাত, ৫৬ বর্ষ, ১০ম সংখ্যা, ভাদ্র, ১৩৮১ সন, পৃ-৫০০।

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায়

স্যার সৈয়দ আহমদ খানের রাজনৈতিক বিষয়ে চিন্তাধারা

স্যার সৈয়দের যাবতীয় কর্মতৎপরতা রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ছিল ঃ

উনবিংশ শতাব্দীতে ভারতের রাজনৈতির চিন্তাধারা তাঁর ধর্মীয় ভাবধারা থেকেই উদ্ভুত হয়েছে। কারন ধর্মচেতনার সাথে রাজনৈতিক ভাবধারার মিশ্রণ এদেশের সামাজিক রাজনৈতিক ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ন বৈশিষ্ট্য।

কেননা পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে এ যুগে শিক্ষিত সমাজের অনেকের মধ্যে উদার নৈতিক চিন্তাচেতনা জন্মলাভ করে। আবার খ্রীষ্টান মিশনারীদের প্রচারণায় এদেশবাসীর ধর্ম বিশ্বাসে আঘাত লাগে এবং তা থেকে আত্মরক্ষার প্রবৃত্তি জাগে অনেকের মনে। মূলতঃ এ দুটি কারনে নতুন ধর্মান্দোলনের উন্মেষ ঘটে আর এর মধ্যেই অঙ্কুরিত হয় রাজনৈতিক চিন্তারাধার বীজ।[১]

তাই আযাদী আন্দোলনের অগ্রদূত হিসাবে স্যার সৈয়দ আহমদ চাকরী জীবনের অধিকাংশ (১৮৩৮-৭৬) সময় অতিবাহিত করেন বিচার বিভাগীয় একজন সরকারী কর্মচারীরুপে। অথচ কোন রাজনীতিবিদের সংস্পর্শে বা কোন কুটনীতি নিরীক্ষা করার মত সুযোগ তাঁর জীরনে আসেনি। কিন্তু তা সত্ত্বে ও তিনি আপন লেখনী বক্তৃতা এবং কার্যাবলীর মধ্য দিয়ে যে রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ও দূরদর্শিতার পরিচয় দেন, তা সত্যিই বিস্ময়কর না বলে পারা যায় না।[২]

যে ঘটনাটি হিন্দুস্তানের ইতিহাসে "১৮৫৭" সাল একটি কালো চিহ্ন এঁকে দিয়েছে, যা ভারতের জাতি সমূহের ভাগ্য সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহনকারী প্রমাণিত হয়েছে এবং যে ঘটনাটি স্যার সৈয়দের ধ্যান-ধারনার মহা বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনতে সক্ষম হয়েছে, সে ঘটনাটি তিনি বিজনৌরে বসে পত্যক্ষ করেছিলেন।[৩]

তাই ১৮৫৭ সালের ইতিহাস খ্যাত রাজনৈতিক বিপ্লবের পর ভারতবাসীকে বিশেষ করে মুসলিম জাতিকে রাজনৈতিক বিপর্যয় থেকে মুক্ত করার জন্যই স্যার সৈয়দের বেশীর ভাগ লেখনী ধারা প্রবাহিত হয়। এছাড়া তিনি সমাজ ও ধর্ম ক্ষেত্রে যে সব সংস্কার সাধন করেন বা ধর্মীয় বিধিবিধানের যে সব যুক্তি ভিত্তিক ব্যাখ্যা প্রদান করেন, তাও ছিল রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রসূত ছিল।

Dhaka University Institutional Repository

তিনি মনে করতেন, রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক বা ধর্মীয় যে কোন দিক থেকে মুসলমানদেরকে অবহেলা করা মানে, ইসলামেরই অবহেলা করা। আর সে লক্ষ্যে তিনি সকল দিক থেকে মুসলিম জাতিকে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করেন। কিন্তু তাঁর বেশীর ভাগ লেখা ধর্ম কেন্দ্রীক হলে ও মূল্য উদ্ধেশ্য ছিল রাজনৈতিক চেতনা। অর্থাৎ রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিলের জন্যই তিনি ধর্মীয় সংস্কারে মনোনিবেশ করেন। স্যার সৈয়দ আহমদ মুসলিম জাতির মুক্তি ও উন্নতি শিবলী নোমানী, আবুল কালাম, আজাদ, ড. ইকবাল, সৈয়দ আমীর আলী প্রমুখ ব্যক্তি বর্গের ন্যায় কুরআন হাদীসে খোঁজ করেননি, বরং তা খোঁজেছেন আধুনিক শিক্ষা এবং ইউরোপীয় সভ্যতায়। এছাড়া তিনি মনে করতেন, মুসলমানদের ধর্মীয় কুসংস্কার এবং প্রকৃতি বিরোধী বিশ্বাস তাদের পার্থিব উন্নতির পথে বাধা। তাই তিনি ধর্মীয় সংস্কার এবং ধর্মীয় রচনায় উদ্যোগী হন।[৪]

স্যার সৈয়দের রাজনীতির মূল কথা হলো ইংরেজদের সাথে মুসলমানের সোহার্দ্য স্থাপন করা, আধুনিক শিক্ষা জ্ঞান-বিজ্ঞানে তাদের অগ্রগামী করে তোলা, সরকারী চাকরি বাকরিতে হিন্দুদের পাশাপাশি মুসলমানের ন্যায্য অধিকার লাভের ব্যবস্থা করা এবং পরবর্তী স্বাধীনতা সংগ্রামে হিন্দুদের সাথে মোকাবিলা করে কাজে নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য যোগ্যতা অর্জন করা।[৫]

ব্রিটিশ ভারতের প্রথম মহাবিদ্রোহটি হলো ১৮৫৭ সালের "সিপাহী বিদ্রোহ" আর সেখান থেকেই ব্রিটিশ বিরোধী রাজনৈতিক আন্দোলনের সূচনা।[৬] তাই ৫৭- সালের বিপ্লবের পর স্যার সৈয়দ আহমদ খানের যাবতীয় রচনা ও কর্মতৎপরতা রাজনৈতিক খাতেই প্রবাহিত হয়। কেননা তিনি '৫৭' এর লড়াই স্বচক্ষে দেখেছিলন এবং ইংরেজ সরকারের সাথে সহযোগিতা না করার ফলে মুসলমানদের উপর যে দুর্গতি নেমে এসেছিল, তাও তিনি নিজ চোখে দেখেন। আবার অন্যদিকে হিন্দুরা ইংরেজদের পৃষ্টপোষকতা অর্জন করে মুসলিম জাতির জাতীয় মর্যাদা, সামাজিক শ্রেষ্ঠত্ব এবং তাদের তহযীব তমাদুন মুছে ফেলার চেষ্টায় মেতে উঠেছিল।[৭]

স্যার সৈয়দ আহমদ ছিলেন দুরদর্শী চিন্তাবিদ। তিনি এটা বুঝতে সক্ষম হন যে, যেহেতু মুসলমানেরা শাসন ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছে। তাই বৃটিশ সরকারের অধীনে তাদের গঠন মূলক কাজে আত্মনিয়োগ করা উচিত। তিনি প্রায় বলতেন, ইংরেজগণ জোড়পূর্বক ভারতীয় শাসন ক্ষমতা কেড়ে নেয়নি বা ছল-চাতুরী করে ও তা অর্জন করেনি।

Dhaka University Institutional Repository

বরং ভারতের জন্য সত্যিকার অর্থে সেরুপ একটি শাসন কতৃপক্ষের প্রয়োজন ছিল।[৮] মুলতঃ বৃটিশ শাসন কামনা করার পেছনে স্যার সৈয়দ আহমদ তাঁর মনোবৃত্তি ব্যাখ্যা করে বলেনঃ-

> আমি ইংরেজদরে প্রতি ভালবাসা দেখানো বা মঙ্গলের জন্য ভারতে বৃটিশ রাজত্বের প্রতিষ্ঠা চাই না। বরং ইংরেজ রাজত্ব প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে মুসলিম ভারতের কল্যাণ নিহিত রয়েছে বলেই আমি তা কামনা করি। কেননা আমার মতে, মুসলমানেরা যদি আপন দুরাবস্থা কাটিয়ে উঠতে চায়, তবে তা বৃটিশ রাজত্বেই সম্ভব।[৯]

সুতরাং একথা বলা যায় যে, স্যার সৈয়দ আহমদ উত্তর ভারতে যে সংস্কার আন্দোলন গড়ে তোলেন। তার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল রাজনৈতিক দিককে কেন্দ্র করে।

রাজনৈতিক কার্যাবলীর ধারা ঃ

রাজনৈতিক শক্তির দ্বারা ব্যক্তি স্বাধীনতা বিপন্ন হওয়ার ভয় সম্পর্কে দার্শনিক আলগায্যালী সর্তক বাণী উচ্চারণ করে বলেন ঃ যর্থাথ দাসত্বের চেয়েও স্বাধীনতার বড় সম্ভাব্য শত্রু হচ্ছে রাজনৈকিতক ক্ষমতা। তিনি রাজনৈতিক ক্ষমতাকে বলেছেন, "জাহ" বা "পদ" তা চায় যে স্বাধীন মানুষের ক্ষমতাধিকারীদের কাছে স্বেচ্ছায় আত্মসমর্পন করুক। এর অর্থ শুধু শারীরিক দাসত্বই নয়, হৃদয় ও মনের ও দাসত্ব।[১০]

মূলত ১৮৫৭ সালের সংগ্রামের পর তাঁর রাজনৈতিক কর্মতৎপরতার বহিঃপ্রকাশ ঘটে। কিন্তু তার ও আগে ব্যক্তিগত জীবনের মধ্য দিয়ে তাঁর রাজনৈতিক কর্মতৎপরতা প্রকাশ পেয়েছিল। অর্থাৎ তিনি মোঘল শাসনের পতন আঁচ করতে পেরে নিজ পরিবারের নিষেধ সত্ত্বেও মোঘল দরবারে চাকরি না করে কোম্পানীর অধীনে চাকরি গ্রহণ করেন। এমনকি পূর্ববর্তী একনায়কত্ব মূলক মুসলিম শাসনের প্রতি তাঁর আগ্রহ ছিল না। ১৮৬৬ সালে "বৃটিশ ইন্ডিয়া এসোসিয়েশন" এর এক সভায় তিনি পূর্ববর্তী মুসলিম শাসনকে একনায়কত্ব মূলক ও স্বেচ্ছাচারী শাসনরুপে অভিহিত করেন।[১১]

Dhaka University Institutional Repository

১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দে স্যার সৈয়দ আহমদ অত্যন্ত পরিশ্রম ও গবেষনা করে "সিল সিলাতুল মূলক" গ্রন্থটি প্রণয়ন করেন। এই গ্রন্থে তিনি রাজা জর্ড হাস্টের থেকে রাণী ভিক্টোরিয়া পর্যন্ত ২০২ জন বাদশাহ সহ ৫ হাজার বছরের দিল্লীর শাসনকর্তাদের নাম, শাসন, কাল, তাদের তিরোধান এবং অন্যান্য কার্যকলাপের বিবরণ রয়েছে।[১২]

প্রকৃত পক্ষে এ গ্রন্থটি ভারতীয় রাজা বাদশাহদের রাধাবাহিক তালিকা। এতে ক্রমান্বয়ে রাজা বাদশাহদের নাম, পিতার নাম, ক্ষমতা কালে, রাজধানী, শাসন, মেয়াদ ও সংক্ষিপ্ত ইতিহাস বর্ণনা করা হয়েছে। বস্তুত সর্বমোট ২০২ জন বাদশাহর বিবরণ রয়েছে।[১৩]

স্যার সৈয়দ রাজনীতির ক্ষেত্রে খুবই দুরদর্শী ছিলেন। ১৮৫৭ সালের ১১ মে বিজনৌরে সংগ্রাম ছড়িয়ে পড়লে স্যার সৈয়দ তখনকার রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিপর্যয় লক্ষ্য করে তাঁর ধারনা হয়েছিল যে, "ভারত থেকে ইংরেজ রাজত্ব মুছে যাবে না। কিন্তু এখান থেকে ইংরেজরা যদি চলে যায়, তবে অন্য কোন জাতি এদেশ শাসন করতে পারবে না"। এছাড়া তিনি বিশ্বাস করতেন যে, " এখানে এমন কোন সুদৃঢ় কেন্দ্রীয় শক্তি নেই, যা শান্তি-শৃংখলা বজায় রাখতে এবং মুসলমানদের টিকিয়ে রাখতে সক্ষম হবে। বৃটিশরা যদি দেশ ত্যাগ করে, তবে মুসলমানরা সংখ্যাগরিষ্ট হিন্দুদের কৃপার পাত্র হয়ে দাঁড়াবে"।[১৪]

বিজনৌরে থাকাকালীন "৫৭" এর লড়াইয়ের সময় স্যার সৈয়দের বই, পুস্তক, মালপত্র সবই হারিয়ে যায়। এমতাবস্থায় তিনি ধৈর্য নিয়ে বিজনৌরে বিদ্রোহের ইতিহাস রচনার জন্য উপকরণ সংগ্রহে ব্যস্ত ছিলেন। এতেই বুঝা যায় যে, তিনি রাজনীতির ক্ষেত্রে কত দুরদর্শী ছিলেন।[১৫]

১৮৫৭ সালের এপ্রিলে স্যার সৈয়দ বিজনৌর থেকে মুরাদাবাদ গমন করেন। এখানে তিনি "তারিখ-এ-সরকাশী-এ-বিজনৌর" (বিজনৌরে বিদ্রোহের ইতিহাস) লিখে প্রকাশ করেন। এতে ১৮৫৭ সালের মে থেকে ১৮৫৮ সালের এপ্রিল পর্যন্ত বিজনৌরে সংঘটিত ঘটনাবলী ক্রমানুসারে এবং বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেন।[১৬]

Dhaka University Institutional Repository

উপমহাদেশীয় রাজনীতির উপর লেখা স্যার সৈয়দ আহমদ খাঁনের" আসবাব এ বাগাওয়াত-এ-হিন্দ" (ভারতে বিদ্রোহের কারন ১৮৫৮) একটি মৌলিক ও রাজনীতির উপর প্রথম বই।[১৭] ভারতে বিদ্রোহের কারণ পুস্তিকার স্যার সৈয়দ সম্রাট দ্বিতীয় বাহাদুর শাহকে অর্কমণ্য ও বেদাতি বলে অভিহিত করেন এবং তাঁর নিয়ন্ত্রাধীন মসজিদে দিল্লীর সম্ভ্রান্ত মৌলবীরা নামাজ পড়তেন না বলে তিনি উল্লেখ করেন।[১৮]

স্যার সৈয়দের মতে, বিরোধিতামূলক মনোভাব নিয়ে সরকারের আদেশ অমান্য করা এবং কার্যে পরিণত না করা বা সরকারের প্রতি নাগরিকের যে দায়িত্ব ও কর্তব্য রয়েছে তা বেপরোয়াভাবে লংঘন করাই হচ্ছে বিদ্রোহ।[১৯]

স্যার সৈয়দ আহমদ তাঁর "ভারতে বিদ্রোহের কারন" পুস্তিকায় ভারতীয় প্রশাসনের সকল দিক আলোচনা করেন, যার সংস্কার করা প্রয়োজন ছিল। এমনকি ভারতবাসীর যাবতীয় অভাব অভিযোগ ইংরেজ সরকারের নিকট তুলে ধরেন। তবে তাঁর এ রচনার মূখ্য উদ্দেশ্য ছিল ইংরেজ সরকারের নিকট মুসলমানদের নির্দোষ প্রমাণ করা। একজন সরকারী কর্মচারী হওয়ার পর ও তিনি এই দুর্যোগমুহূর্তে যে, সাহস ও দেশ প্রেমের পরিচয় দিয়েছিলেন, যার ফল শ্রুতিতে শুধু মুসলিম ভারতেই নয়, গোটা ভারতে রাজনীতির ভিত্তি স্থাপিত হয়। আর এইটাই ছিল তাঁর রাজনৈতিক চিন্ত াধারার মূল উদ্দেশ্য।[২০]

মোটকথা, এই পুস্তিকায় স্যার সৈয়দ ইংরেজদের এটা বুঝাতে চেষ্টা করেন যে, ৫৭'এর বিদ্রোহের জন্য শুধু মুসলমান দায়ী নয়, এতে অন্যান্য সম্প্রদায়ও দায়ী। এছাড়া তিনি আরো বলেন, এটা পূর্ব পরিকল্পিত বা ভারতীয় সৈন্যদের ষড়যন্ত্র নয়, বরং এর জন্য ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর প্রশাসনিক অব্যবস্থাই দায়ী। তিনি এই পুস্তিকায় বিদ্রোহের পাঁচটি মৌলিক কারণ দায়ী করেন-

১। শাসক ও শাসিতের মধ্যে ভূল বুঝাবুঝি সৃষ্টি হওয়া;

২। ধর্ম বিরোধী আইন প্রণয়ন, ফলে প্রজাদের মনে অসন্তোষ সৃষ্টি হওয়া;

৩। প্রজাদের আর্থিক বিপর্যয়ে অফিসারদের উদাসীনতা'

৪। ভারতীয়দের সাথে সৌহার্দমূলক সম্পর্ক গড়ে তোলার অভাব;

৫। সৈন্য বাহিনীর বিশৃংখলা।[২১]

Dhaka University Institutional Repository

মোটকথা সে সময় মুসলমানদের অপরাধী সাব্যস্ত করার জন্য কোন প্রমাণের প্রয়োজন হতো না বরং মুসলমান হওয়াটাই তার অপরাধী সাব্যস্ত হওয়ার জন্য যথেষ্ট ছিল।[২২] স্যার সৈয়দ শাসক ও শাসিত উভয়কে শিক্ষা দেয়ার কাজ হাতে নেন এবং উভয়ের ভুল বুঝাবুঝির কারণ দূর করার জন্য প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে তিনি " ভারতের বিদ্রোহের কারণ" শীর্ষক পুস্তিকা প্রকাশ করেন।[২৩]

১৮৬৬ সালে স্যার সৈয়দ আহমদ তাঁর "সায়েন্টিফিট সোসাইটি" থেকে একটি পত্রিকা প্রকাশ করেন, যা পরে এটি নাম পরিবর্তন করে "আলীগড় ইনস্টিটিউট গেজেট" নামে প্রকাশিত হতে থাকে তাঁর জীবনের শেষ মূর্হুত পর্যন্ত। তাঁর এ পত্রিকায় রাজনৈতিক বিষয়ে এত বেশী লিখা হয়েছে যে, পত্রিকার প্রথম খন্ড সমূহকে তাঁর রাজনৈতিক কর্মের এক মহা সংকলন বলা যেতে পারে।[২৪]

স্যার সৈয়দ আহমদ ১৮৬৬ সালে "বৃটিশ ইন্ডিয়া এসোসিয়েশন" গঠনের মাধ্যমে তিনি বৃটিশ সরকারের কাছে উত্তর প্রদেশের ভারতীয় মুসলমানদের দাবী-দাওয়া সমূহ তুলে ধরেন। সম্ভবত এটাই ভারতীয়দের প্রথম "রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান" হিসাবে বিবেচিত হয়।[২৫]

১৮৭০ সালে স্যার সৈয়দ আহমদ খাঁ (১৮১৭-১৮৯৮) আলীগড় থেকে তাঁর সমাজ সংস্কার আন্দোলনের মুখপাত্র "তাহযীবুল আখলাক" প্রকাশ করেন। এই প্রতিষ্ঠানটি ছিল রাজনৈতিক দিক থেকে বৃটিশ সরকারের সমর্থক। এর আসল উদ্দেশ্য ছিল উপমহাদেশীয় সমাজকে পাশ্চাত্য চিন্তাধারার জাগ্রত করা।[২৬]

ডক্টর হান্টার রচিত (১৮৭১) Our Indian Mussalmans গ্রন্থের মাধ্যমেই ইংরেজগণ ভারতীয় মুসলামন সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করেছিলেন। কারণ হান্টার এ গ্রন্থে ইসলামকে জোড়জুলুমের ধর্মরুপে অভিহিত করেন এবং ওহাবীদেরকে বৃটিশ রাজত্বের পক্ষে বিপদ হিসাবে চিহ্নিত করেন।[২৭]

তবে স্যার সৈয়দ হান্টারের এ গ্রন্থের সমালোচনা করে একটি রিভিও প্রকাশ (১৮৭১-১৮৭২) করেন। এই রিভিওটি পাইওনিয়ার পত্রিকায় প্রথমে এবং পরে উর্দু সোসাইটি প্রত্রিকায় ধারাবাহিক প্রকাশিত হতে থাকে।[২৮]

Dhaka University Institutional Repository

পরবর্তীতে ইহা ১৮৭২ সালে লন্ডনের হাংরী এইচ কিংপ্রেস থেকে গ্রন্থাকারে প্রকাশ করা হয়। বর্তমান এই গ্রন্থটি ইসমাইল পানিপথি সম্পাদিত মাকালাত-এ-স্যার সৈয়দ এর নবম খন্ডে সংযোজিত রয়েছে। স্যার সৈয়দের এই গ্রন্থের ফলে ইংরেজ সরকার ভারতীয় মুসলমানদের উপর ধীরে ধীরে আস্থাশীল হয়ে উঠে। [২৯]

ডাঃ হান্টার তাঁর গ্রন্থে ওহাবী মুসলমানদের রাষ্ট্রদ্রোহী,[৩০] লুণ্ঠনকারী,[৩১] সত্য ভ্রষ্ট,[৩২] ও ধর্মত্যাগী [৩৩] উল্লেখ করেছেন।

তবে ডক্টর হান্টারের গ্রন্থটি সমালোচনার যোগ্য হলেও এর ফলে মুসলিম জাতি বিশেষভাবে উপকৃত হয়। কারণ তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, শিক্ষা ও চাকরী থেকে বঞ্চিত করে মুসলামানদেরকে রাজভূক্ত করা সম্ভব নয়। তাই তিনি তাঁর এই গ্রন্থের ৪র্থ অধ্যায়ে মুসলমানদের আর্থিক দূরাবস্থা এবং অন্যান্য সমস্যাবলী আলোচনা করেন। এছাড়া এই গন্থের অনেক জায়গায় ফুটে উঠেছে ভারতীয়, বিশেষত, মুসলমানদের সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের স্পষ্ট ছবি। অর্থাৎ ইংরেজ শাসকগণ মুসলমানদের প্রতি যে অন্যায় অবিচার করেছে, তার কিছুটা এই গ্রন্থে ফুটে উঠেছে । এ লক্ষ্যে তিনি সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন এবং শিক্ষা দীক্ষার সুযোগ সুবিধা দিয়ে তাদেরকে সরকারের অনুগত করে তোলার জন্য পরার্মশ দেন। তিনি বলেনঃ

> আমাদের বিজয় ও পরিবর্তিত শাসন ব্যবস্থার ফলে মুসলমান জাতি আজ অবনতির গহ্বরে পড়ে গেছে। তাদের উপর আমাদের আন্তরিকতার অভাব এ অবস্থাকে আরো অসহনীয় করে তুলেছে। তাই এ সবের সংশোধন সরকারকেই করতে হবে। তবে মুসলমানদের মধ্যে যে দলটি অবাধ্য তাদের প্রতি ভাল ব্যবহার দেখাতে হবে। শুধু জনগণের প্রতি ন্যায় বিচারের জন্য সরকার কেবল তাদের কাছেই প্রশংসার যোগ্য হবে না বরং গোটা জনমতই সরকারের অনূকূলে চলে আসবে।[৩৪]

মোহামেডান এ্যাংলো ওরিয়েন্টাল কলেজ বা আলীগড় কলেজে মুসলমানদের সামজিক সাংস্কৃতিক ও শিক্ষা কার্যক্রমের কেন্দ্র বিন্দু হলে ও পরবর্তীকালে এটি মুসলমানদের রাজনৈতিক চিন্তা ধারায় আবর্তীত হয়।[৩৫]

Dhaka University Institutional Repository

১৮৮৬ সালে স্যার সৈয়দ আহমদ "মুসলিম এডুকেশন্যাল কনফারেন্স" নামে একটি প্রতিষ্ঠান গঠন করেন। যদিও এই প্রতিষ্ঠানটির লক্ষ্য ছিল মুসলমানদের শিক্ষা ও সাধারণ অবস্থা আলোচনা করা। কিন্তু পরে এটি মুসলমানদের রাজনৈতিক ভাবধারা প্রকাশের একটি মঞ্চ হিসাবে ব্যবহৃত হয়।[৩৬]

মোটকথা তিনি মুসলমানদের মধ্যে রাজনৈতিক সচেতনতা জাগিয়ে তোলার জন্য সভা-সমিতি ও পুস্তকাদি রচনা করেছেন। এছাড়া ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহের কারন চিহ্নিত করে ইংরেজদের বোঝাতে সক্ষম হন যে, বিদ্রোহের জন্য মুসলমানেরা দায়ী নয়।

রাজনৈতিক স্বাতন্ত্র্য ঃ

১৮৫৭ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধের পর মুসলমানদের মধ্যে নবচেতনার উন্মেষ ঘটে। ক্রমশ তারা ইংরেজী শিক্ষা দীক্ষা গ্রহণ করে উন্নতির দিকে ধাবিত হয়। কিন্তু উনিশশত তিরিশের দশকে মুসলমানদের মধ্যে পৃথক আভাস ভূমির দাবি উচ্চারিত হয় এবং চল্লিশের দশকে সে দাবি আরো জোড়দার হয়। অবশেষে প্রায় এক দশকের ঘটনা অঘটনার ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া ও ঘাত প্রতিঘাতে ১৯৪৭ সালে ভারত ও পাকিস্তান নামে দুটি পৃথক রাষ্ট্র সৃষ্টির মাধ্যমে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম সফলতা লাভ করে।[৩৭]

১৮৮৫ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় "ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস" উপমহাদেশের প্রথম প্রধান রাজনৈতিক সংগঠন। কিন্তু প্রথম দিকে এ সংগঠনের কাজ ছিল আবেদন-নিবেদনের মাধ্যমে সরকার কে দিয়ে কিছু ভালো বা উন্নয়ন মূলক কাজ করিয়ে নেয়া, সংগ্রামের মাধ্যমে দাবি আদায় করা নয়। সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জীর ভাষায়, কংগ্রেস নেতারা ছিলেন, "সরকারের বেসরকারী পরামর্শ দাতা"- We in the congress are the Unofficial advisers of the Government. [৩৮]

মোটকথা ভারতের রাজনৈতিক ভাবধারার সূচনা লক্ষ করা যায় রাজা রামমোহন রায় প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মন সমাজের মধ্যে এবং এর সুত্র ধরে ১৮৮৫ সালে " ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস" প্রতিষ্ঠা লাভ করে। সে সময় সর্ব ভারতীয় নেতা স্যার সৈয়দ আহমেদ কংগ্রেসের সাথে একত্রে কাজ করতে আগ্রহী ছিলেন না। কারন ভারত "একটি জাতি" নয়। [৩৯]

Dhaka University Institutional Repository

কিন্তু শতাব্দীর পর শতাব্দী কালধরে মুসলমানেরা ভারতে অবস্থান করলেও তারা তাদের স্বতন্ত্র্য বজায় রেখেছে।[৪০]

যেহেতু কংগ্রেসের মৌলিক দুটি দাবি ছিলঃ (১) সমস্ত উচ্চপদস্থ চাকরী প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা দ্বারা প্রদান করা এবং (২) সর্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে ভাইসরয়ের কাউন্সিলের এক অংশ সদস্য নির্বাচিত হওয়া।[৪১] এমতাবস্থায় স্যার সৈয়দ কংগ্রেসের মৌলিক দাবির উপর ভিত্তি করে এর বিরোধিতা এবং মুসলমানদেরকে এই প্রতিষ্ঠান থেকে দূরে থাকতে উপদেশ দেন।[৪২] কেননা তাঁর ভয় ছিল যে, রাজনীতি করতে গিয়ে যদি সদ্য প্রতিষ্ঠিত ইংরেজদের সাথে মুসলমানের সম্পর্কের ফাটল ধরে। তাই তিনি মুসলমানদেরকে রাজনীতি থেকে দূরে সরিয়ে রাখার পক্ষপাতী ছিলেন।[৪৩]

বলাবাহুল্য স্যার সৈয়দের শিক্ষা, আর্দশ ও প্রচারণা শিক্ষিত মুসলমানদের চিন্তাধারার উপর এতবেশী প্রভাব বিস্তার করে ছিল যে, তাদের একটি অংশ কংগ্রেসে যোগদান হতে বিরত থেকে একটি স্বাতন্ত্র্য। রাজনৈতিক সংস্থা গঠনের জন্য তাঁর অলক্ষ্যে সঙ্ঘবদ্ধ হতে থাকে।[৪৪]

কংগ্রেসের প্রতি স্যার সৈয়দের বিরুপতার কারনে কংগ্রেসে মুসলমানদের যোগদান নিরুৎসাহিত হয়। কেননা, The story of Muslim politics in the latter half of the ninteenth century has been woven round the personality of sayed Ahmad Khan.[৪৫]

লখনৌ ভাষণ ঃ

১৮৮৭ সালের ২৮ ডিসেম্বর স্যার সৈয়দ আহমদ লখনৌ ভাষনে মুসলমানদেরকে কংগ্রেসে যোগদান করতে প্রকাশ্যে নিষেধ করেন।[৪৬] প্রতিযোগিতামূলক সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা সম্পর্কে স্যার সৈয়দ উক্ত ভাষণে বলেন, যোগ্যতা, শিক্ষা ও অর্থের দিক থেকে সব জাতি সমান নয় এবং ভারতে উন্নত অনুন্নত অনেক জাতিই বাস করে। তাই উচ্চ পদসমূহে চাকরি করার জন্য যোগ্যতার দিক হিন্দুদের তুলনায় মুসলমানদের মধ্যে খুবই কম। সুতরাং এ ধরনের পরীক্ষা কোন বিশেষ সম্প্রদায়ের জন্যই ক্ষতিকর নয়, বরং গোটা দেশের নিরাপত্তার জন্য হুমকি স্বরুপ।[৪৭]

Dhaka University Institutional Repository

স্যার সৈয়দ তাঁর বক্তৃতায় আরো বলেন, এমন পরিস্থিতিতে মুসলমানদের পক্ষে কংগ্রেসের মাদ্রাজ অধিবেশনে যোগদান করা বা কংগ্রেসের দলে যোগদান করা আত্মঘাতী ছাড়া আর কিছুই নয়।[৪৮]

মোটকথা, ভারতীয় কংগ্রেসে মুসলমানদের যোগদান করা নিয়ে স্যার সৈয়দের ১৮৮৭ সালের বক্তব্য ছিল সুদূর প্রসারী। যা ভারতীয় রাজনীতিতে প্রথমবারের মত পৃথক মুসলমান দৃষ্টিভঙ্গি দেখা যায়। আর, সি, মজুদার বলেন ঃ

> "মোটামটিভাবে বলা যেতে পারে যে, উত্তর ভারতের মুসলমানরা সৈয়দ আহমদের নীতির সাথে দৃঢ়ভাবে সংযুক্ত যেমনটি ভারতের হিন্দুরা ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সাথে সংযুক্ত।"[৪৯]

মীরাট ভাষণ ঃ

পরের বছর ১৮৮৮ সালের ১৬ মার্চ স্যার সৈয়দ মীরাটের বক্তৃতায় ও মুসলমানদেরকে কংগ্রেসে যোগদান করতে প্রকাশে নিষেধ করেন।[৫০] কেননা স্যার সৈয়দের সময় সাধারণ মুসলমানেরা, রাজনৈতিক আন্দোলনের কার্যবিধি সম্পর্কে সচেতন ছিলেন না। অথচ হিন্দুদের শিক্ষা আন্দোলন শুরু হয় রাজা রাম মোহন রায়ের ১৮১৬ সালে "হিন্দু কলেজ" প্রতিষ্ঠার মাধ্যমেই। আর মুসলমানের শুরু হয় সত্তর বাহাত্তর বছর পরে। স্যার সৈয়দ মীরাট ভাষণে মুসলিম জাতির অতীত ইতিহাস এবং শাসন ক্ষমতার উল্লেখ করে বলেন, মুসলিম জাতিকে বাদ দিয়ে হিন্দুরা এগিয়ে যেতে পারে না।[৫১]

১৮৭৭ সালে সৈয়দ আমীর আলী "সেন্টাল ন্যাশনাল মোহামেডান এসোসিয়েশন" গঠন করলে স্যার সৈয়দ এর বিরোধিতা করেন।[৫২] কিন্তু তিনি ১৮৯৩ সালে আর্য সমাজের হিংসাত্মাক মনোবৃত্তি, মুসলিম নিধন এবং গো-কুরবানী বিরোধ অভিযান দেখে মুসলমানদের নিরাপত্তার অভাব বোধ করেন। ফলে পরের বছর তিনি মুসলমানের জান-মালের নিরাপত্তার লক্ষ্যে " মোহমেডান এ্যাংলো ওরিয়েন্টাল ডিফেন্স এসোসিয়েশন অব আপার ইন্ডিয়া" নামক একটি নিরাপত্তা মূলক রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান গঠন করেন।[৫৩]

Dhaka University Institutional Repository

স্যার সৈয়দ আহমদ কংগ্রেস থেকে মুসলমানদের বিরত রেখে যে মুসলিম স্বাতন্ত্র্য এবং মুসলিম জাতীয়তাবাদের বীজ বপন করেন, সেটা ১৯০৬ সালে "মুসলিম লীগ" রুপে এক পল্লবিত বৃক্ষে পরিণত হয় এবং সে বৃক্ষই ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান রুপে পরিচিত লাভ করে।[৫৪]

গণতন্ত্র ঃ

স্যার সৈয়দ ছিলেন মূলতঃ গণতন্ত্রের সমর্থক। তাই রাজতন্ত্র, স্বৈরতন্ত্র ও আমলাতন্ত্রের ঘোর বিরোধী ছিলেন। অথচ কংগ্রেসের বিরোধিতায় মনে হয় তিনি গণতন্ত্রের বিরোধী। আসলে ব্যাপারটা তা নয়। গণতন্ত্রের কথা বলতে গিয়ে তিনি ইংল্যান্ডে তাঁর এক বন্ধুর কাছে পত্রে বলেন, আমি মুসলমান ও ইসলাম তাই ইসলাম কখনো রাজতন্ত্র বা স্বৈরাচারী সরকার পছন্দ করে না। ইসলাম সমর্থ করে জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত সরকার।[৫৫]

স্যার সৈয়দ লর্ড রিপনের সামনে ১৮৮৩ সালে ভাইসরয় কাউন্সিলে "লোক্যাল সেলফ গভর্নমেন্ট " বিলের উপর বক্তৃতায় বলেনঃ

> আজ আমি আনন্দিত যে, ভারতবাসী তাদের সরকারের নিকট থেকে স্বায়ত্বশাসনের বিধি বিধানের শিক্ষা নিতে চলেছে আমার চোখের সামনেই। তাই আমার জীবনদ্দশায় ভারতবাসীকে স্বায়ত্তশাসনের পথ খুঁজতে দেখে আমি নিজেকে ভাগ্যবান বলে মনে করছি।[৫৬]

উক্ত বিলে মধ্যপ্রদেশের সংখ্যালঘু সম্প্রদায় সমূহের স্বার্থ রক্ষার জন্য স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা সমূহে দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের নিয়োগ নির্বাচনের মাধ্যমে এবং বাকী এক-তৃতীয়াংশ সদস্যের নিয়োগ সরকার কর্তৃক করার সুপারিশ করা হয়। স্যার সৈয়দ এই বিলে সংশোধনী প্রস্তাব আহ্বান করে সমগ্র ভারতের লোক্যাল স্বায়ত্ব শাসিত সংস্থাসমূহে উক্ত পদ্ধতি প্রয়োগের জন্য আবেদন করেন। ফলে লর্ড রিপন স্যার সৈয়দের প্রস্তাব আংশিকভাবে গ্রহণ করে উত্তর ভারতের ক্ষেত্রে এ মনোয়ন নীতি গ্রহণ করেন।[৫৭] পরবর্তীতে দেখা যায় যে, এই নীতির ফলেই লোক্যাল বোর্ড সমূহে কিছু সংখ্যক মুসলমান প্রতিনিধি আসন লাভ করতে সক্ষম হন।[৫৮]

Dhaka University Institutional Repository

এছাড়া স্যার সৈয়দ ১৮৬৪ সালে গাজীপুর মাদ্রাসার ভিত্তির সময় বলেছিলেন, "তোমরা নিজেরাই নিজেদের আইন তৈরী করবে এবং তা নিজেরাই কার্যে পরিনত করবে তবে সেদিন আর দুরে নয়।"[৫৯] কেননা ১৮৮৩ সালের বিলের উপর বক্তৃতা দিতে গিয়ে তিনি ভারতে গণতান্ত্রিক পদ্ধতি চালু হওয়ার জন্য সন্তোষ প্রকাশ করেছিলেন।[৬০]

মনের ভিতর স্বাধীনতা পোষন ঃ

১৮৫৭ সালে স্বাধীনতা যুদ্ধে এক যুগের ও পরে যখন মুসলমানেরা সম্পূর্ন ভাবে প্রায় ধ্বংস প্রাপ্ত লাঞ্ছিত ও অপমানিত হয়েছে, তখন ইংরেজ লেখক হান্টার তার গ্রন্থে বলেন যে, মুসলমানরা শাসন বিভাগে সব ক্ষমতা এবং সব রকম মুনাফা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে, অথচ এগুলো পূর্বে তাদের একচেটিয়া অধিকারে ছিল। এমন কি ক্রমে ক্রমে তাদের ক্ষমতা হিন্দুদের হাতে চলে যাচ্ছে।[৬১]

তাই স্যার সৈয়দ আহমদ অনেকবার বলেছেন যে, ভারতে বৃটিশ রাজত্ব চিরস্থায়ী হোক এবং সরকারের স্থায়িত্ব কামনা করেন। এমনকি তিনি ১৮৫৭ সালের সংগ্রামকে আযাদীর লড়াই না বলে "সিপাহী বিদ্রোহ" রুপে আখ্যায়িত করেন। ভারতীয় উলামাদের জিহাদের ফতোয়াকে তিনি অস্বীকার করেন। উপরন্ত তিনি যে সব উলামা বিদ্রোহে অংশ গ্রহনের দায়ে বৃটিশ সরকারের নির্যাতনের শিকার হন তিনি তা অস্বীকার করেন। এছাড়া তিনি " আসবাবে বাগাওয়াত-এ হিন্দ" নামক পুস্তিকায় (১৮৫৯) এবং লখনৌ ভাষণে (১৮৮৮) মুজাহিদ বাহিনী সম্পর্কে অশোভন উক্তি করেন।[৬২]

বলাবাহুল্য ওহাবী আন্দোলনের মুজাহিদগণ ৫৭ এর পরে ও বিশ্বাস করতেন যে, বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের ধ্বংস সাধন করা কঠিন কিছু নয়। অন্যদিকে স্যার সৈয়দ মনে করতেন যে, শক্তিহীন ও পর্যুদস্ত অবস্থায় আযাদীর জন্য আরো রক্ত ঝরানো মোটেই সম্ভব নয়। কিন্তু তাঁর মনে আযাদীর স্বপ্ন পুষে রেখে ছিলেন, যা তিনি জনৈক ইংরেজ বন্ধুর কাছে একপত্রে ব্যক্ত করেছিলন।[৬৩]

স্যার সৈয়দ নিজেকে ওহাবী পরিচয় দিয়ে ওহাবীদেরকে বৃটিশ বিরোধী না বলে শুধু শিখ বিরোধী বলে দুনিয়ার সামনে তুলে ধরেন। ফলে এতে মনে হয় তাঁর অন্তরে দেশ প্রেম ও আযাদীর স্পৃহা নেই বরং তাকে বৃটিশ সরকারের তোষামুদ লোক মনে হয়।

Dhaka University Institutional Repository

কিন্তু ব্যাপারটা তা নয়। আযাদী আন্দোলনের যোগ্যতা অর্জনের জন্য যে সময়ের প্রয়োজন সে সময়টুকু তিনি ভারতে বৃটিশ সরকারের অস্তিত্ব কামনা এবং আগামী দিনের স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রস্তুতির জন্য বৃটিশ শাসনের দীর্ঘস্থায়িত্ব চান।[৬৪]

স্যার সৈয়দ আহমদ একজন সুন্নী মুসলমান। তাই ইসলাম ধর্মের উপর তাঁর অগাধ বিশ্বাস রয়েছে। ধর্ম স্যার সৈয়দকে বৈপ্লবিক নীতির শিক্ষা দেয়। তবে এই ধর্ম একনায়কত্ব বা রাজতন্ত্র পছন্দ করে না বরং এই ধর্ম জনগণের নির্বাচিত সরকার পছন্দ করে। এছাড়া এই ধর্ম মানুষের সম্পদ একস্থানে কেন্দ্রীভূত হয়ে থাকুক তা গ্রহণ করে না। অথচ ইসলাম ধর্ম নীতি অনুযায়ী সম্পদ যতই বেশী হোক না কেন, তা নিশ্চয়ই দুই পুরুষের পর অনেক ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়তে বাধ্য।[৬৫]

ওহাবী আন্দোলন কাঙ্খিত সফলতা লাভে ব্যর্থ হলেও ভারতীয় মুসলমানদের কে রাজনৈতিক ভাবে সচেতন করে তুলে। এছাড়া রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এটা একটি সর্ব ভারতীয় সংগঠনের গোড়া পত্তন করে এবং বৃটিশ বিরোধী সংগ্রাম অব্যাহত রাখে।[৬৬]

ডাঃ হান্টার "আওয়ার ইন্ডিয়ান মুসলমানস" নামক গ্রন্থে ভারতীয় আলেমদের বৃটিশ সরকারের আনুগত্য পরীক্ষার জন্য শাসন কতৃপক্ষের দিক থেকে একটি প্রশ্ন প্রস্তাব করেন। মূলত প্রশ্নটি ছিলঃ যদি বৃটিশ শাসন অবস্থায় কোন মুসলমান ভারত আক্রমন করে, তবে কি মুসলমানরা বৃটিশ শাসন ত্যাগ করে আক্রমনকারীকে সাহায্য করা তাদের ধর্মীয় কর্তব্য হয়ে দাঁড়াবে?[৬৭]

ইংরেজ লেখক হান্টারের এই প্রশ্নের উত্তরে স্যার সৈয়দ তখন বলেছিলেনঃ ভবিষ্যতে কোন মুসলিম শক্তি বা অন্য কোন দেশ ভারত, আক্রমন করলে তখন মুসলমানরা কি কর্ম পন্থা অবলম্বন করবে, তা আমি এই মুর্হুতে বলতে পারি না। কিন্তু আমার বিশ্বাস মুসলমানরা সে সময় দেশের অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে যেটা ভাল সেটা করবে।[৬৮]

স্যার সৈয়দ একদিকে জাতিকে রাজনীতি থেকে দুরে সরিয়ে আত্মপ্রতিষ্ঠার কাজে মনোনিবেশ করার পরামর্শ দেন, এমনকি পড়াশোনায় আত্মনিয়োগ করে সরকারী চাকরী বাকরী এবং প্রশাসনিক বিভাগে বিশিষ্ট আসন দখল করার উপদেশ দেন, অন্যদিকে বৃটিশ সরকারের অনর্থক মুসলিম জাতির প্রতি বিরুপ মনোভাব পোষণের জন্য দায়ী করেন।[৬৯]

Dhaka University Institutional Repository

স্যার সৈয়দের মনে আযাদীর কামনা স্পষ্ট বুঝা যায় তাঁর ১৮৮৭ সালের লখনৌ ভাষণে। এ ভাষণে তিনি তাঁর মনের আবেগ কিছুটা প্রকাশ করেন এবং বলেনঃ

> আমর বয়স এখন ৭০ এর উর্ধ্বে। তাই আমি জাতিকে এমন এক আসনে দেখতে চাই, তা আমার জীবদ্দশায় দেখা সম্ভব না হলে এসভায় উপস্থিত বন্ধুরা একদিন স্বজাতিকে সুখ-শান্তি ও উচ্চ আসনে প্রতিষ্ঠিত দেখতে পাবেন।[৭০]

বলাবাহুল্য, স্যার সৈয়দের যুগে "আযাদী" করা মানে নিজেকে, জাতিকে এবং দেশকে ধ্বংস করে দেওয়া। কিন্তু স্যার সৈয়দ আহমদ সক্রিয় আযাদী আন্দোলন করেন নি বরং তার জন্য উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করেন। কেননা তাঁর লখনৌ ভাষণের স্বপ্ন বাস্তবায়িত হয় ১৯৪৭ ও ১৯৭১ সালে। এছাড়া তিনি জীবন উৎসর্গ করেন আগামী দিনের স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য জাতিকে যোগ্য করে তোলার কাজে।[৭১]

মোটকথা, স্যার সৈয়দ ছিলেন যুগের সেরা রাজনীতি ও কুটনীতিক। তিনি জাতীর অতীত ইতিহাসের তোয়াক্কা না করে বরং কুটনীতির মাধ্যমে সৃষ্টি করেন এক নতুন ইতিহাস। বাহ্যত তাঁকে আযাদী প্রেরণার পরিপন্থী বলে মনে হয়। কিন্তু বাস্তবে তা নয়। কেননা যুগের প্রয়োজন ও জাতীর বৃহত্তর লক্ষ্যে তিনি এমন কিছু কাজ করেছিল, যা আযাদী পরিপন্থী মনে হয়। এক ইংরেজ কর্মচারী মাওলানা শওকত আলীর নিকট স্যার সৈয়দ সম্পর্কে মন্তব্য করে বলেছিলেন, তিনি সব চাইতে বড় রাজভক্ত হলেও আসলে তিনিই হলেন মূলতঃ বৃটিশ রাজত্বের চরম বিদ্রোহী।[৭২]

জাতীয়তাবাদ ঃ

ভারতবাসীর রাজনৈতিক চেতনা বিকাশের মূলে পাশ্চাত্য শিক্ষা ছাড়া আরো কয়েকটি বিষয় সক্রিয় ছিল। যেমন- স্বদেশী পন্ডিতের গবেষণার ফলে ঐতিহ্য চেতনা জাগ্রত হয়। আবার পাশ্চাত্য সভ্যতা ও ধর্মনীতির বিরুদ্ধে কেশব সেন ও স্বামী বিবেকানন্দের মতো উচ্চ শিক্ষিত ব্যক্তি বিদ্রোহ ও দেশ বাসীর মনকে গভীর ভাবে আলোড়িত করে।[৭৩]

Dhaka University Institutional Repository

মূলতঃ দেশে জনমত গঠনের প্রয়োজনীয়তা বোধ থেকে প্রতিষ্ঠিত হয় সুরেন্দ নামের ইন্ডিয়ান এসোসিয়েশন ও শিশির কুমারের ইন্ডিয়ালীগ। আর সে কাজকে আরো বড় আকারে সম্পন্ন করার জন্য তৎকালীন হিন্দু সমাজ ১৮৮৫ তে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা করেন।[৭৪]

আগে মুসলমানরা কোরআনের আলোকে ধর্মীয় জাতীয়তাবাদ বিশ্বাস করতো। ফলে স্যার সৈয়দের পূর্বে "কওম" শব্দটি বলতে সাধারণত সৈয়দ, মোঘল ও পাঠানকে বুঝানো হতো। আর পবিত্র কোরআনের ভাষায় "কওম" গোত্র ও মিল্লাত কে বুঝাতো। কিন্তু স্যার সৈয়দ আহমদ সর্ব প্রথম "কওম" শব্দটি জাতি অর্থে ব্যবহার করেন।[৭৫]

স্যার সৈয়দ ১৮৮৩ সালের পূর্বে কখনো স্বতন্ত্র্য জাতীয়তাবাদ প্রচার করেননি। কারণ ১৮৬৭ সাল পর্যন্ত তিনি যুক্ত জাতীয়তাবাদ এর সমর্থক ছিলেন। কেননা ১৮৬৪ সালে "সায়েন্টিফিক সোসাইটি" গঠনের মাধ্যমে তিনি হিন্দু-মুসলিম ও ইংরেজদের মধ্যে বন্ধুত্ব স্থাপনে চেষ্টা করেন। এছাড়া আলীগড় কলেজ হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের জন্য খোলা ছিল।[৭৬]

ভারতে দ্বিজাতি তত্ত্বের সূচনা হয় ১৯৬৭ সালে উর্দু-হিন্দি বিবাদের ফলে। এর আগ পর্যন্ত স্যার সৈয়দ সব সময় হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের উপর বেশী জোড় দিয়ে ছিলেন। ফলে কয়েক শতাব্দী ভারতে হিন্দু মুসলিম ঐক্য বজায় ছিল।[৭৭]

ভারতের হিন্দু সমাজের উর্দু বিরোধিতার লক্ষ্য করে ফারসী প্রাচ্য ভাষাবিদ গারসিঁ-ডি-ট্যাসী বলেছিলেন "মূলত উর্দু-হিন্দু বিবাদের অপর নাম হলো শিক্ষিত হিন্দু-মুসলমানদের অনৈক্য"। এছাড়া তিনি হিন্দু আন্দোলনের নায়ক শিব প্রসাদকে উর্দু বিরোধিতার জন্য হীনমন্যতা বলে অভিহিত করেন।[৭৮]

এমন পরিস্থিতিতে স্যার সৈয়দ ১৮৬৭ সালে মিঃ সেক্সপীয়ারের সাথে মুসলমানদের শিক্ষা সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেছিলেনঃ

> আমার ধারনা হিন্দু-মুসলমান দুই জাতি কোন কাজ আন্তরিকতার সাথে করতে পারবে না। এখনতো বিরোধ কমই। তবে এ বিরোধ দিন দিন

Dhaka University Institutional Repository

বাড়তেই থাকবে। ফলে যারা বেঁচে থাকবেন তারা দেখতে পাবেন। উত্তরে সেক্সপীয়ার বলেছিলেনঃ "যদি এই বাণী সত্যি হয়, তবে তা হবে দুঃখজনক ব্যাপার, স্যার সৈয়দ তখন বলেনঃ "আমি সুনিশ্চিত, তবে এর জন্য আমিও দুঃখিত"।[৭৯]

তবে লক্ষনীয় বিষয় যে, স্যার সৈয়দ ১৮৮৭ সালের পূর্বে কখনো মুসলিম জাতিকে ভিন্ন জাতি বলে জনসমক্ষে ঘোষনা করেননি। আবার ১৮৮৪ সালে তিনি "লাহোর ইন্ডিয়ান এসোসিয়েশনের" এক সভায় "কওম" বলতে হিন্দু মুসলিম উভয় সম্প্রদায়কে বুঝান। অর্থাৎ "কওম" শব্দটি "ন্যাশন" অর্থে ব্যবহার করেন।[৮০]

যেহেতু স্যার সৈয়দ আহমদ বিশ্ব মুসলিম জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী। সেহেতু তিনি যেমন-তুরস্ক, মিসর প্রভৃতি মুসলিম দেশের মুসলমান ভাইদের দুঃখে মর্মাহত এবং সুখে আনন্দ অনুভব করেন। যদিও তিনি কখনো প্রত্যক্ষ ভাবে স্বতন্ত্র নির্বাচনের দাবী করেন নি, কিন্তু মুসলমানদের জন্য আসন সংরক্ষণের দাবী করেন। কিন্তু আবার ১৮৮৭ সালের লখনৌ ভাষণে হিন্দু ও মুমলমান দুটি আলাদা জাতি বলে ঘোষণা করেন।[৮১]

ভারতীয় মুসলমানদের স্বার্থে যাতে কোন আঘাত না লাগে, সে জন্য তিনি প্যান ইসলাম বাদ আন্দোলনে যোগ দান করেননি এবং জামাল উদ্দীন আফগানীর ডাকে ও সাঁড়া দেননি। কিন্তু তিনি বিশ্ব মুসলিম জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী ছিলেন। বরং যতদিন পর্যন্ত বৃটিশ সরকারের বৈদেশিক নীতি তুরস্কের পক্ষে ছিল, তত দিন পর্যন্ত তিনি তুরস্ককে সমর্থন করেন।[৮২]

স্যার সৈয়দের মতে, ধর্ম ও রাজনীতি এক নয়। তাই তিনি তুরস্কের খলিফাকে ধর্মীয় নেতা হিসাবে গ্রহণ করেননি। কারণ তাঁর মতে, অনেক আগেই খেলাফতের অবসান ঘটেছে। বরং তিনি তুর্কী পোষাককে তাঁর কলেজের ইউনিফরম হিসাবে গ্রহণ করে বিশ্ব মুসলিম জাতীয়তাবাদের প্রতি সমর্থন প্রকাশ করেন।[৮৩]

Dhaka University Institutional Repository

মোটকথা, ভারতীয় রাজনীতিতে স্যার সৈয়দের ভূমিকা কি ছিল তা শিবলী নোমানীর বক্তব্য থেকে বুঝা যায়। তিনি লখনৌর "মুসলিম গেজেটে" বলেনঃ

> "স্যার সৈয়দ ছিলেন সকল সম্প্রদায়ের শিরোমণি। শুধু পরিবেশ ও পরিস্থিতির কারণে মুসলমানদেরকে রাজনীতি থেকে দূরে থাকার কথা বলেন। কিন্তু কেন এরকম করা হলো তার উত্তর দেয়া ক্ষতিকর। বরং আজ ইজতেহাদ করা এবং "তকলীদ" এর উর্ধ্বে উঠার সময় আসন্ন"।[৮৪]

সে সময় কোন কোন মহল স্যার সৈয়দের প্রতি সাম্প্রদায়িকতার অভিযোগ করেছেন বাস্তবে তা ঠিক নয়। কিন্তু তিনি কংগ্রেসের বিরোধিতা করলে ও আজীবন হিন্দু-মুসলিম ঐক্য কামনা করেন। তবে তিনি ১৮৯৭ সালের ১১ জুন "ইনস্টিটিউট গেজেটে" বলেনঃ কংগ্রেস মুসলমানদের স্বার্থ বিরোধী। তাই তিনি মুসলমানদের এই প্রতিষ্ঠানে যোগদান নিষেধ করেন। [৮৫]

ইংরেজদের ভারতে বৃটিশ রাজত্ব প্রতিষ্ঠার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল আর্থিক স্বার্থ হাসিল করা। কিন্তু স্যার সৈয়দ আহমদ কোন রকম সহায়তা করেননি তাদের উদ্দেশ্য পূরনের ক্ষেত্রে। বরং তিনি তাঁর লেখা ও বক্তৃতায় সোচ্চার ছিলেন। যেমন ১৮৮৮ সালের ঐতিহাসিক মীরাট ভাষণের কথা বলা যাক।[৮৬]

১৮৯৭ সালের ১১ জুন স্যার সৈয়দ আহমদ "ইনস্টিটিউট গেজেটে" হিন্দু মুসলিম সম্পর্ক শীর্ষক এক প্রবন্ধে বলেনঃ

> হিন্দু-মুসলিম এই উভয় জাতি রাজনৈতিক বিষয়ে একমত। তাই কংগ্রেসের সমর্থকগণ রাজনীতির ক্ষেত্রে যে নীতি গ্রহণ করে, তাতে হিন্দুরা সমর্থন করে। কিন্তু মুসলমানরা সে নীতির বিরোধী।[৮৭]

বস্তুত জাতীয় কংগ্রেস সম্পর্কে স্যার সৈয়দ মনে করতেন যে, কংগ্রেস যেহেতু হিন্দু প্রাধান্য। তাই এতে যোগদান করা মানে হিন্দুদের গোলামী মেনে নেওয়া। তাই তিনি ঐতিহাসিক মীরাট ভাষণে বলেছিলেনঃ হিন্দুরা চাইলে এক ঘন্টার মধ্যেই আমাদের ধ্বংস করে দিতে পারে।[৮৮]

Dhaka University Institutional Repository

বাংলা বিশ্বকোষ এর কোন এক প্রবন্ধকার স্যার সৈয়দের মুসলিম স্বাত্যন্ত্রর প্রতি কটাক্ষ করে বলেনঃ

> "স্যার সৈয়দ মুসলমানদের বৈশিষ্ট্য ও স্বার্থ রক্ষার জন্য শিক্ষা ও রাজনীতির দিক দিয়া সাময়িক ভাবে কতকটা স্বার্থক প্রচেষ্টা চালান, তা অবশেষে ভারত বিভাগ ও পাকিস্তানের বীজ বপন করে আবার পাকিস্তান সৃষ্টির ২৫ বৎসরে মধ্যে স্বাধীন বাংলাদেশের উদ্ভব এতে স্যার সৈয়দের মুসলিম সাম্প্রাদায়িক স্বার্থ রক্ষার একনিষ্ঠ অপচেষ্টার অসার্থকতাই হয়তো সাময়িকভাবে ব্যক্ত করে থাকে যা ফ্রাঙ্কলিন প্রকাশিত (ঢাকা) বাংলা বিশ্বকোষে কেউ কেউ মত প্রকাশ করেন।" [৯০]

আসলে সমাজ সংস্কার ও সমাজোন্নয়নের প্রয়াস থেকেই জেগে উঠেছে " মুসলিম জাতীয়তাবাদ"।[৯১]

রাম গোপাল স্যার সৈয়দকে অসাম্প্রদায়িক রুপে আখ্যায়িত করে সত্য কথাই বলেছেন। কারন বৃটিশ আনুগত্য স্যার সৈয়দের লক্ষ্য ছিল না, বরং তা ছিল লক্ষ্যে পৌছার একটি উপায় মাত্র। এই প্রসঙ্গে শান মুহাম্মদ বলেন ঃ To him loyalty to the sarkar was one of the means to achieve the end which was education. [৯২]

Dhaka University Institutional Repository

জাতীয় জাগরণে বিশেষ মনীষীগন ঃ

যেমন-

স্যার সৈয়দ আহমদ খান (১৮১৭-১৮৯৮)

নওয়াব আবদুল লতীফ (১৮২৮-১৮৯৩)

সৈয়দ আমীর আলী (১৮৪৯-১৯২৮) ঃ

যেহেতু স্যার সৈয়দ, নওয়াব আবদুল লতীফ ও সৈয়দ আমীর আলী ছিলেন সমসাময়িক সর্ব ভারতীয় মুসলিম নেতা। সেহেতু এরা সবাই ছিলেন বিচারক, সমাজ সেবক, রাজনীতিকও আইন পরিষদের সদস্য এবং এদের লক্ষ্য ছিল এক ও অভিন্ন। এদের প্রত্যেকেই বুঝতে সক্ষম হন যে, বৃটিশ সরকারের সাথে সহযোগিতা ও ইরেজী শিক্ষা ছাড়া মুসলিম জাতি দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুদের সাথে প্রতিযোগিতায় পেরে উঠতে পারেনা এবং তাদের রাজনৈতিক চেতনাও জাগ্রত হতে পারে না।

তবে সৈয়দ আহমদ ও আবদুল লতিফের চিন্তাধারা ও কার্যক্রমের মধ্যে কিছুটা পার্থক্য দেখা যায়। যেমনঃ স্যার সৈয়দের শিক্ষা নীতি ছিল ইউরোপ ধর্মী, আর নওয়াব আবদুল লতিফের শিক্ষা নীতি তেমটা নয়। তিনি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য শিক্ষার সমন্বয় সাধন করতে চেয়েছিলেন। কারণ তাঁর লক্ষ্য ছিল নিজ জাতির ধর্ম, ঈমান ও আকীদা ঠিক রেখে মাদ্রসা শিক্ষা তথা আরবী ফার্সী শিক্ষার সাথে ইংরেজী শিক্ষার বিস্তার করা। আবার স্যার সৈয়দ ইউরোপীয় তহযীব-তমদ্দুন এ দেশে আমদানী করতে চেয়েছিলেন কিন্তু নওয়াব আবদুল লতীফ ও সৈয়দ আমীর আলী ধর্মীয় ও প্রাচ্য ঐতিহ্য বজায় রেখে ইউরোপের আধুনিকতা বরণ করার শিক্ষা দেন।[৯৩]

জাতীয় জাগরনে উত্তর ভারতে যেমন স্যার সৈয়দ আহমদ নতুন চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে মুসলমানদের পাশ্চাত্য শিক্ষা গ্রহণ, ইংরেজী চর্চা ও জ্ঞান সাধনার দিকে আহবান জানিয়ে ছিলেন এবং তাদের সহযোগিতার পথে পদক্ষেপের জন্য অনুপ্রেরণা দিয়েছিলেন, তেমনি বাংলাদেশে নবাব আবদুল লতীফ, সৈয়দ আমীর আলী অগ্রসর মনোভাবের পরিচয় দিয়ে নেতৃত্বের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন।[৯৪]

Dhaka University Institutional Repository

ওহাবী আন্দোলন, খেলাফত আন্দোলন কিংবা অসহযোগ আন্দোলন এর যে কোনটির চরিত্র বৈশিষ্ট্য বিচার করে দেখা যাবে স্বাতন্ত্র্য কিংবা রুপ পার্থক্য স্বরুপ উদঘাটিত হবে। কিন্তু সে সাথে এ সত্য সুপ্রতিষ্ঠিত হবে যে, সব কয়টি আন্দোলনের মূল লক্ষ্যই ছিল উপমহাদেশে মুসলিম পূর্ণ জাগরণকে সুপ্রতিষ্ঠিত করা এবং পরিনামে স্বাধীনতা অর্জনের পথে এগিয়ে যাওয়া পরবর্তী কালে মুসলিম জাগরণ আন্দোলনে ধর্মীয় আদর্শের প্রেরণা এতখানি স্পষ্ট ছিল না, বরং সে সব আন্দোলনে মুসলিম স্বাতন্ত্র্যের কথাই বিশেষ ভাবে ঘোষিত হয়েছে।[৯৫]

নওয়াব আবদুল লতীফের লক্ষ্য ছিল আরবী ফার্সীর সাথে ইংরেজী শিক্ষার ব্যবস্থা করা, কিন্তু স্যার সৈয়দের লক্ষ্য ছিল ইংরেজী শিক্ষার সাথে ধর্মীয় শিক্ষার ব্যবস্থা করা। ফলে আবদুল লতীফের চেষ্টায় হুগলী ও কলিকাতা মাদ্রাসা উন্নতি লাভ করে এবং তাঁর পরামর্শে কলিকাতা মাদ্রাসায় "এ্যাংলো ফার্সিয়ান" বিভাগ খোলা হয় এমনকি তাঁর কর্মের ফলে মুহসিন ফান্ডের অর্থে ঢাকা, চট্রগ্রাম ও রাজশাহীতে একটি করে মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হয়।

মোটকথা, আবদুল লতীফের সমাজ সেবাই স্যার সৈয়দের মনে সমাজ সেবার প্রেরণা যুগিয়েছে। কারণ উপমহাদেশে আবদুল লতীফেই ছিলেন প্রথম ব্যক্তি যিনি ইংরেজ ও নীলকরদের বিরুদ্ধে কথা তুলেন এবং তাদের অত্যাচার থেকে গরীব অসহায় কৃষকদের রক্ষার ব্যবস্থা করেন। স্যার সৈয়দ আহমদ "মোহামেডান সিভিল সার্ভিস ফান্ড" গঠন করেন উচ্চ শিক্ষার্থীদের সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা দেবার সুবিধার্থে কিন্তু লতীফ "মুহসিন ফান্ড" এর অর্থ বৃটিশ সরকার থেকে আদায় করেছিলেন শুধু মাত্র সাধারণ ও গরীব মুসলমান ছাত্রদের শিক্ষাখাতে ব্যয়ের জন্য।

তবে স্যার সৈয়দ আহমদ বিভিন্ন রচনাবলীর মাধ্যমে সাহিত্য, ইতিহাস ও রাজনীতিতে বহু মুখী অবদান রেখেছে যা আবার আবদুল লতিফ রেখে যেতে পারেন নি। স্যার সৈয়দের শিক্ষা ও সংস্কার আন্দোলনের অনেক আগেই আবদুল লতীফের শিক্ষা অভিযান ও সমাজ সেবা শুরু হয়। যেমনঃ ১৮৫৩ সালে আবদুল লতীফ "মুসলমান ছাত্রদের ইংরেজী শিক্ষার উপকারিতা" শীর্ষক একটি রচনা প্রতিযোগিতার আয়োজন করেন। অন্যদিকে এই কাজ স্যার সৈয়দ ১৬-১৭ বছর পর শুরু করেন "ভারতীয় মুসলমানদের শিক্ষোন্নয়ন" শীর্ষক রচনা প্রতিযোগিতার মাধ্যমে ১৮৭০ সালে।

Dhaka University Institutional Repository

এছাড়া ও আবদুল লতীফ মুসলমানদের শিক্ষা সাহিত্য ও সামাজিক অগ্রগতির জন্য ১৮৬৩ সালে কলিকাতায় "মোহামেডান লিটায়ারী সোসাইটি" প্রতিষ্ঠা করেন। অর্থাৎ আবুল লতীফের শিক্ষা প্রচেষ্ঠা সাধারণ লোকেরই বেশী লাভবান হয়। কারণ তিনি প্রাথমিক শিক্ষার উপর বেশী জোড় দিয়েছিলেন।[৯৬]

বস্তুত এইভাবে আবদুল লতীফ ও তাঁর সহযোগীরা প্রথমে "মোহামেডান এসোসিয়েশন (১৮৫০) এবং পরে "মোহামেডান লিটারারী সোসাইটির (১৮৬৩) গঠন সমাজের ক্ষয়িষ্ণু অভিজাত শ্রেণীকে এবং শহরের মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে সংঘবদ্ধ করেন এবং ইংরেজী ভাষা ও পাশ্চাত্য জ্ঞান বিজ্ঞান শিক্ষার কথা প্রচার করেন।[৯৭]

সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের রাজনৈতিক সংগঠন "ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের" (১৮৮৫) যোগদানের ব্যাপারে হিন্দু মুসলমানের মধ্যে ভেদ ও তিক্ততা সৃষ্টি হয়। সে সময় আবদুল লতীফ ও সৈয়দ আমীর আলী কংগ্রেসে যোগাদান করেননি। কারন তাঁদের ধারনা হয়েছিল যে, কংগ্রেসে যা আলোচিত হয় এবং যে সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়, তাতে মুসলিম সমাজের স্বার্থ রক্ষিত হয় না। ফলে ১৮৮৫ সালে কংগ্রেসের দ্বিতীয় বার্ষিক অধিবেশনে যোগদানের আমন্ত্রন পেয়ে আবদুল লতিফ মোহামেডান লিটারারী সোসাইটির পক্ষ থেকে লিখেন ঃ

"This committee of Muhammadan Liteary Society of calcutta regret their inability to accept your invitation as they not anticipate any benefit to be derived from further discussion of the difficultt and momentous questions likely to occupy the deliberations of the congress"

অন্য দিকে সৈয়দ আমীর আলী "সেন্ট্রাল ন্যাশনাল মোহামেডান এসোসিয়েশনের" পক্ষ থেকে প্রায় একই মনোভাব ব্যক্ত করে বলেন ঃ " This committee that no possible advantage will result either to their community or the country at large by assuming attitude of uneasiness to wards the Government and the steps it has taken and inteds to tlke" [৯৮]

Dhaka University Institutional Repository

যেহেতু বিংশ শতাব্দীর বৈশিষ্ট্য হলো হিন্দু মুসলমানের মধ্যে জাতীয় চেতনা উন্মেষ, কিন্তু তা ভারতীয় না হয়ে হয়েছে হিন্দু জাতীয়তা বোধ ও মুসলিম জাতীয়তাবোধ।[৯৯]

পশ্চিম ও মধ্য ভারতে স্যার সৈয়দ যেমন সক্রিয় তেমনি বাংলার মাটিতে আবদুল লতীফের আধুনিক শিক্ষা ও সমাজ উন্নয়নে অধিকতর সক্রিয়। স্যার সৈয়দ তাঁর আন্দোলনকে শক্তিশালী করার পিছনে একদল দুরদর্শী চিন্তাবিদ ও কবি সাহিত্যিকের সহযোগিতা পেয়েছিলেন। কিন্তু বাংলায় আবদুল লতীফকে কেন্দ্র করে সেরুপ কোন বুদ্ধি জীবী শ্রেণী ও রাজনৈতিক দল গড়ে উঠেনি।

আবার অন্যদিকে সৈয়দ আলীর আলী স্যার সৈয়দের পথ ধরেই ১৮৬৯ সালে বিলাত গমন করেন। স্যার সৈয়দ ও আমীর আলী উভয়ই ছিলেন, চিন্তাবিদ, জ্ঞান সাধক ও ঐতিহাসিক। ফলে তাঁরা উভয়ই পাশ্চাত্য দুনিয়ার সামনে ইসলামের মাহাত্য ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করার প্রয়াস পান। স্যার সৈয়দ যেমন "খুতুবাতে আহমদিয়ার" ইংরেজী সংস্কার " Essays on the life of Mohammad" লিখে উইলিয়াম মিউর রচিত "Life of Mohammad" (১৮৬১) এর জবাব দেন এবং ইসলাম ধর্মকে দুনিয়ার সামনে শ্রেষ্ঠত্বের সাথে তুলে ধরেন। অন্যদিকে সৈয়দ আমীর আলী ও লন্ডনে অবস্থান কালে স্যার সৈয়দের "খুতুবাতে আহমদিয়ার" অনুসরণে " A critical Examination of the life and teachings of Mohammad" নামক একটি নবীচরিত গ্রন্থ রচনা করেন।

এছাড়া সৈয়দ আমীর আলীর "The Spirit of Islam" নামক গ্রন্থটি সমগ্র পাশ্চাত্য ও মুসলিম জগতে বিশেষত তুরস্ক ও মিসরে ইসলামী সমাজ ব্যবস্থার শ্রেষ্ঠত্বের ব্যাখ্যা রুপে স্বীকৃতি লাভ করে। তিনিও স্যার সৈয়দের মত পাশ্চাত্য মূল্যবোধের আলোকে ইসলামের বুদ্ধি সম্মত ব্যাখ্যা প্রদান করেন। ফলে স্যার সৈয়দ ও আমীর আলী একাধিক বিবাহ, দাসত্বপ্রথা, মুজিযা এবং ওহী সম্পর্কে একই মত প্রকাশ করেন। মিউর রচিত" Life of Mohammad" এর চার খন্ডের মধ্যে মাত্র এক খন্ডের উত্তর স্যার সৈয়দ তাঁর "খুতুবাতে আহমদিয়াতে" লিপিবদ্ধ করেন। অর্থাৎ এতে শুধু মাত্র হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর জীবনের মাত্র প্রথম বার বছরের ইতিবৃত্ত রয়েছে। অপরদিকে আমীর আলীর "The spirit of Islam" একটি পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ।

Dhaka University Institutional Repository

মোটকথা, খ্রীষ্টান লেখকদের অভিযোগরে বিরুদ্ধে স্যার সৈয়দের উত্তর ছিল আত্মরক্ষা মূলক। কেননা তিনি ও তাঁর কোন কোন সহযোগী ইসলামের বিধান সমূহকে পাশ্চাত্য ভাবধারা সম্মত করে দেখাবার চেষ্টা করেন। কারণ তাঁদের ব্যাখ্যায় মনে হয় যে, ইসলাম ও খ্রীষ্টান ধর্মের মধ্যে তেমন কোন পার্থক্য নেই। তাই তাঁরা ইসলামের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে ইউরোপীয় ভাবধারাই প্রতিধ্বনি করেন। ঠিক এমনি ভাবে সৈয়দ আমীর আলী ও পাশ্চাত্য মূল্যবোধের আলোকে ইসলামী সমাজ ব্যবস্থার মূল্যায়ন করতে রাজী হননি। অথচ স্যার সৈয়দ ও সৈয়দ আমীর আলী উভয়েই ছিলেন যুক্তিবাদী ও মুতাযিলা ভাবাপন্ন। তবে সৈয়দ আমীর আলী হলেন শিয়া পন্থী এবং স্যার সৈয়দ হলেন সুন্নী পন্থী। কিন্তু তাঁরা উভয়েই ছিলেন মুসলিম স্বাতন্ত্র্যের কর্ণধার এবং রাজনৈতিক মুসলিম জাতীয়তাবাদের উদ্যোগতা। যদিও স্যার সৈয়দ আমীর আলীর চেয়ে আযার্দী প্রিয় ছিলেন, তবুও তিনি বহুদিন পর্যন্ত মুসলমানদেরকে রাজনীতি থেকে দূরে সরিয়ে রেখে অবশেষে জীবন সায়াহ্নে ;রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে ১৮৯৩ সালে "এ্যাংলো মুসলিম ডিফেন্স এসোসিয়েশন" গঠন করেন। কিন্তু আমীর আলী কর্মজীবন থেকেই মুসলমানদের রাজনীতিতে থাকার পক্ষপাতী ছিলেন। ফলে তিনি ১৮৭৭ সালে " সেন্ট্রাল ন্যাশনাল মোহামেডান এসোসিয়েশন" গঠন করেন এবং এটি ছিল ভারতে "মুসলিমলীগ" প্রতিষ্টার পূর্বে মুসলমানদের সর্ব প্রথম রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান। এর মাধ্যমে মুসলমানদের স্বার্থ সংরক্ষণ ও তাদের রাজনৈতিক ট্রেনিং প্রদান করাই ছিল এই সমিতির লক্ষ্য।[১০০]

সৈয়দ আমীর আলী ছিলেন উচ্চ আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত। তাই ইউরোপের অতীত ও বর্তমান ইতিহাস এবং পৃথিবীর বিভিন্ন ধর্ম সম্পর্কে তাঁর জ্ঞান বেশী থাকায় তিনি ইহুদী ও খ্রীষ্টান ধর্মের উপর ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করেন। ১৯০৬ সালে "মুসলিম লীগ" গঠিত হলে আমীর আলীর চেষ্টায় সে সময় লন্ডনে এর একটি শাখা (১৯০৮) প্রতিষ্ঠিত হয়। তিনি ১৮৯৯ সালে কলকাতায় অনুষ্ঠিত "মোহামেডান এডুকেশন্যাল কনফারেন্সে" সভাপতিত্ব করেন।[১০১]

যেহেতু আমীর আলী খেলাফতের একনিষ্ঠ সমর্থক। তাই তিনি ইসলামী ভ্রাতৃত্বে উদ্বুদ্ধ হয়ে তুরস্ক সরকারের বিপদের সময় আর্থিক সাহায্যে এগিয়ে আসেন এবং ইংরেজ সরকারের ভয়ে ভিত না হয়ে ১৯২৩ সালে তুরস্কে খেলাফত রহিত করা হলে তিনি এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেন। কিন্তু স্যার সৈয়দ ইংরেজ সরকারের ভয়ে কোন বাস্তব কর্মপন্থা অবলম্বন করেননি। তবে সহানুভূতি প্রকাশ করে নিজ কর্তব্য পালন করেন।

Dhaka University Institutional Repository

যে সময় সমকালীন মুসলিম নেতা ছিলেন স্যার সৈয়দ আহমদ, সৈয়দ জামাল উদ্দীন আফগানী ও মুফতী মুহাম্মদ। এদের মধ্যে স্যার সৈয়দই ছিলেন উনবিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ মুসলমান। কেননা তিনি জামাল উদ্দীন আফগানী ও মুফতী মুহাম্মাদের চেয়েও ইসলামের জন্য অধিক খেদমত করেছেন।[১০২]

তথাকথিত ওহাবী আন্দোলনের মধ্য দিয়ে উনবিংশ শতাব্দীতে এই উপমহাদেশে মুসলমানদের জাগরনের সূচনা হয় বলা যেতে পারে। এছাড়া ওহাবীদের সংস্কার মূলক কার্যাবলীকে ইংরেজরা ভারতবর্ষের মুসলমানদের কাছে বিকৃতভাবে উপস্থাপন করে এবং তাদেরকে ইসলাম ধ্বংসকারী ওহাবী সম্প্রদায় হিসাবে চিহ্নিত করে, যাতে ভারতের মুসলমানদের মনে ওহাবীদের সম্পর্কে ঘৃনার ভাব সৃষ্টি হয়।[১০৩]

মোটকথা উনবিংশ বা বিংশ শতাব্দীতে স্যার সৈয়দের মত বিভিন্ন মুখী প্রতিভাবান ব্যক্তিত্ব ও একনিষ্ঠ কর্মী খুব কমই পরিলক্ষিত হয়। তিনি অধঃপতিত মুসলিম জাতিকে যুগের মর্মবাণীর সাথে পরিচয় করিয়ে দেন এবং আধুনিক মুসলিম জাতির ইতিহাস থেকে জানা যায় যে, তিনি ছিলেন আধুনিক মুসলিম উপমহাদেশের মুসলিম জাতির আদিপিতা। এই মহান ব্যক্তিটি জীবন সন্ধ্যাকালে নিজের জন্য কিছুই রেখে যাননি বরং তাঁর দাফন কাফনের কাজ সমাপ্ত করা হয় জনগণের অর্থ দিয়ে।[১০৪]

মূলতঃ মুসলমান সমাজে গোড়া ও সংস্কার পন্থী একটি অংশ ইংরেজী শিক্ষার বিরোধিতা করেছিলেন। ফলে সৈয়দ আহমদ শহীদ এদেশকে "দারুল হরব" ঘোষনা করে "জিহাদ আন্দোলন" শুরু করেছিলেন এবং তাদের মতে, বির্ধমী শাসিত রাষ্ট্রে ধর্ম পালনে বিঘ্ন সৃষ্টি হলে "জিহাদ" বা ধর্ম যুদ্ধ করা ইসলামের নির্দেশ আছে।[১০৫]

সুতরাং উপরোক্ত পর্যালোচনার পর বলা যায় যে, স্যার সৈয়দ আহমদ আলীগড় আন্দোলনের মাধ্যমে মুসলমানদের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনার উন্মেষ ঘটান। এক্ষেত্রে তিনি প্রথম দিকে হিন্দুদের সাথে এক যোগে কাজ করেন। পরবর্তীতে তিনি মুসলমানদের স্বাধীকার ও স্বাধীনতা লাভে অনুপ্রানিত ও সংগঠিত করেন জাতিকে।

Dhaka University Institutional Repository

মোটকথা তাঁর সামাজিক ও রাজনৈতিক আলোচনার প্রেক্ষিতে লক্ষ্যনীয় যে, স্যার সৈয়দ আহমেদ খান সমাজ সংস্কার, সামাজিক আন্দোলন, সচেতনতা সৃষ্টি, শিক্ষার সম্প্রসারন, ধর্মীয় সংস্কার এবং সর্বোপরি সাম্প্রদায়িক সম্প্রতি স্থাপনের মাধ্যমে অধিকার বঞ্চিত ও অত্যাচারিত মুসলমানদের জন্য বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা আদায়ে গুরুত্বপূর্ন ভূমিকা পালন করেন। আলীগড় আন্দোলনের মাধ্যমে তাঁর সংস্কার আন্দোলন সমগ্র ভারত বর্ষে ছড়িয়ে পড়ে এবং পরবর্তী আন্দোলন ও স্বাধীনতা সংগ্রামে তাঁর কার্যক্রম ব্যপকভাবে উৎসাহ উদ্দীপনা যোগায়।

মুসলমানদের নবজাগতির অন্যতম অগ্রদূত স্যার সৈয়দ আহমদ ইংরেজ শাসকের বিরোধিতা না করে নিজস্ব তহযীব তমদ্দুন অনুশীলনের সাথে পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানে শিক্ষালাভের দ্বারা মুসলিম জাতিকে জাতীয় চেতনার উন্মেষে ব্রতী ছিলেন।

অন্যদিকে ভারতের মুসলমানদের রাজনৈতিক অধিকার আদায়ের জন্য সৈয়দ আমীর আলী "ন্যাশনাল মোহামেডান এসোসিয়েশন" গঠন করেন।

Dhaka University Institutional Repository

টিকা ও তথ্য নির্দেশ

০১। শাহ জাহান মনির, বাংলা সাহিত্যে বাঙ্গালী মুসলমানের চিন্তাধারা, ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯৩, পৃ-৩৬।

০২। ড. মুহাম্মদ আবদুল, মুসলিম জাগরনে কয়েকজন কবি সাহিত্যিক, ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ১৯৮০, পৃ-৪৪।

০৩। আলতাফ হোসাইন হালী, স্যার সৈয়দ আহমেদ খান, অনুদিতঃ মুজিবুর রহমান, ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৬৮, পৃ-৬৩

০৪। ড. মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, পূর্বোক্ত, পৃ-৪৫।

০৫। ড. মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, স্যার সৈয়দ আহমদ খার ধর্মীয় ও সামাজিক চিন্তাধারা, ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ১৯৮২, পৃ-৩৫৭-৩৫৮।

০৬। সৈয়দ আবুল মকসুদ, মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী, ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৯৪, পৃ-৩।

০৭। ড. মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, স্যার সৈয়দ আহমদ খান ধর্মীয় ও সামাজিক চিন্তাধারা, পৃ-৩৫৮।

০৮। ড. মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, মুসলিম জাগরনে কয়েকজন কবি সাহিত্যিক, পৃ-৪৮-৪৯।

০৯। পূর্বোক্ত, পৃ-৪৯।

১০। এম, রোজেন থাল, মুসলিম চিন্তাধারা স্বাধীনতা, অনুদিতঃ দরবেশ আলী খান, ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৭৭, পৃ-১৫৯

১১। ড. মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, স্যার সৈয়দ আহমদ খার ধর্মীয় ও সামাজিক চিন্তাধারা, পৃ-৩৬০।

১২। পূর্বোক্ত, পৃ-৩৬০।

১৩। স্যার সৈয়দ আহমদ খান, মাকালাত, ৬ষ্ঠ খন্ড, লাহোরঃ মজলিসে তারাক্কি এ আদব, ১৯৬৫, পৃ-১৬৬।

১৪। পূর্বোক্ত, পৃ-১৬৬-২৩১।

১৫। ড. মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, মুসলিম জাগরনে কয়েকজন কবি সাহিত্যিক, পৃ-৫।

১৬। ড. মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, স্যার সৈয়দ আহমদ খার ধর্মীয় ও সামাজিক চিন্তাধারা, পৃ-৩৬১।

১৭। স্যার সৈয়দ আহমদ খান, ভারতে বিদ্রোহের কারণ ড. মুহাম্মদ আবদুল্লাহ (অনুদিত) ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ১৯৭০, পৃ-৫ (সূচনায়)।

১৮। ড. এনাম-উল-হক, ভারতের মুসলমান ও স্বাধীনতা আন্দোলন, ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৯৩, পৃ-৫৫।

১৯। অনুদিতঃ ড. মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, পূর্বোক্ত, পৃ-ভূমিকা।

Dhaka University Institutional Repository

২০। পূর্বোক্ত, পৃ-১।

২১। সৈয়দ তুফাইল আহমদ, মুসলমানু-ক রওশন মুস্তাকাটল, বাদায়ুলঃ নিমাশী প্রেস, ০৯৩৮, পৃ-১৭৬-১৭৭।

২২। ড. মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, মুসলিম জাগরনে কয়েকজন কবি সাহিতিক, পৃ- ৯-১০।

২৩। ড. এনাম-উল-হক, পূর্বোক্ত, পৃ-৫৭

২৪। অনুদিতঃ মুজিবুর রহমান, পৃ-৮৭

২৫। অনুদিতঃ মুজিবুর রহমান, পূর্বোক্ত, পৃ- ১৩৬-১৩৭।

২৬। এ, কে, এম, আমিনুল হক, ঢাকায় উর্দু ফার্সী সাহিত্যের চর্চা, এম ফিল থিসিস, (অপ্রকাশিত), ঢাকাঃ বিশ্ববিদ্যালয়,২০০২, পৃ-২৪।

২৭। ড. মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, মুসলিম জাগরনে কয়েকজন কবি সাহিত্যিক, পৃ-১৬।

২৮। বাংলা বিশ্বকোয, চতুর্থ খন্ড, ঢাকাঃ নওরোজ কিতাবি স্থান, ১৯৭৬, পৃ-৭৬৩।

২৯। বাংলা বিশ্বকোয, পূর্বোক্ত, পৃ-৭৬৩।

৩০। ড. মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, স্যার সৈয়দ আহমদ খানর ধর্মীয় ও সামাজিক চিন্তাধারা, পৃ-১০৫-১২১।

৩১। আবদুল মওদুদ অনুদিতঃ ইন্ডিয়ান মুসলমান, ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৭৪, পৃ-১০২।

৩২। পূর্বোক্ত, পৃ-১০৩।

৩৩। পূর্বোক্ত, পৃ-১১২।

৩৪। পূর্বোক্ত, পৃ-২০৮।

৩৫। পূর্বোক্ত, পৃ-১৯৪-৯৫।

৩৬। ড. ইমান-উল-হক, পূর্বোক্ত, পৃ-৬৫।

৩৭। ড. ইমান-উল-হক, পূর্বোক্ত, পৃ-৭১।

৩৮। ড. ইমান-উল-হক, পূর্বোক্ত, পৃ-১০।

৩৯। সৈয়দ আবুল মকসুদ, মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী, পৃ-৩

৪০। শাহজাহান মনির, পূর্বোক্ত, পৃ-৩৭-৩৯।

৪১। ড, ইমান-উল-হক, পূর্বোক্ত, পৃ-১০ ।

৪২। ড. এনাম-উল-হক, পূর্বোক্ত, পৃ-৭০।

৪৩। পূর্বোক্ত, পৃ-৭০।

Dhaka University Institutional Repository

৪৪। ড. মুহাম্মদ আবদুল্লা, মুসলিম জাগরনে কয়েজন কবি সাহিত্যিক, পৃ-৪৭।

৪৫। মোহাম্মদ ওয়ালিউল্লাহ, আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৭৮, পৃ-১৭৩।

৪৬। শাহজাহান মনির, পূর্বোক্ত, পৃ-৪০।

৪৭। ড. ওয়াকিল আমহদ, উনিশ শতকে বাঙালী মুসলমানের চিন্তা চেতনার ধারা, ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী ২য় খন্ড, ১৯৮৩, পৃ-১৬১।

৪৮। স্যার সৈয়দ আহমদ খান, মুকাম্মাল মাজমুআ লোকচার্স, লাখের মালেক ফযলুদ্দীন কাকে যাই গং তাজেরান-এ-কওমী কাশমীরী রাজার, ১৯০০, পৃ-৩০৩-৩০৪।

৪৯। পূর্বোক্ত, পৃ-৩০৩-৩০৪।

৫০। ড. এনামউল হক, পূবোর্ক্ত, পৃ-৭০।

৫১। ড. ওয়াকিল আহমদ, পূর্বোক্ত, ২য় খন্ড, পৃ-১৬১।

৫২। মাজমুআ লেকসার্স, পৃ-৩১৫-৩১৬।

৫৩। ড. মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, মুসলিম জাগরনে কয়েকজন কবি সাহিত্যিক, পৃ-৪৭।

৫৪। ড. মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, স্যার সৈয়দ আহমদ খানর ধর্মীয় ও সামাজিক চিন্তাধারা, পৃ-৩৭৩।

৫৫। ড. মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, মুসলিম জাগরনে কয়েকজন কবি সাহিত্যিক, পৃ-৪৭।

৫৬। স্যার সৈয়দ, মাকুতুবাত লাথেরঃ মজলিস-তরক্কী-এ-আদব, ১৯৫৯, পৃ-১৮৭।

৫৭। মাজমুআ লেকচার্য, পৃ-১৪২-১৩৪।

৫৮। আলতাফ হোসাইন হালী, হায়াত-এ-জাবীদ, লাহোর ঃ আইনা-এ-আবদ চওক মীনার, ১৯৬৬, পৃ-২৪৬-২৪৭।

৫৯। মাজমুআ লেকচার্স, পৃ-১৪৩।

৬০। মাজমুআ লেকচার্স, পৃ-২০।

৬১। পূর্বোক্ত, পৃ-১৪২।

৬২। ড. এনাম-উল-হক, পূর্বোক্ত, পৃ-৩৬।

৬৩। ড. মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, স্যার সৈয়দ আমহদ খার ধর্মীয় ও সামাজিক চিন্তাধারা, পৃ-৩৭৮-৩৭৯।

৬৪। পূবোর্ক্ত, পৃ-৪৫-৪৬।

৬৫। মাকতুবাত, পৃ-১৮৭-১৮৮।

৬৬। পূবোর্ক্ত, পৃ-১৮৭-১৮৮।

Dhaka University Institutional Repository

৬৭। ড. এনাম-উল-হক, পূর্বোক্ত, পৃ-৩

৬৮। অনুবাদঃ আবদুল মওদুদ, দি-ইন্ডিয়ান মুসলমানস পৃ-১৩৯।

৬৯। মাকালাত, নবম খন্ড, পৃ-১৯৭।

৭০। ড. মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, মুসলিম জাগরনে কয়েকজন কবি সাহিত্যিক, পৃ-১০০।

৭১। মাজমুআ লেকচার্স, পৃ-৩১০।

৭২। ড. মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, স্যার সৈয়দ আহমদ খানর ধর্মীয় ও সামাজিক চিন্তাধারা, পৃ-৩৮৩।

৭৩। পূর্বোক্ত, পৃ-৩৮৩-৩৮৪।

৭৪। আনিসুজ্জামন, মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য, ঢাকাঃ লেখক সংঘ প্রকাশনী বর্ধমান হাউস, ১৯৬৪, পৃ-৭৮।

৭৫। আনিসুজ্জামান, পূর্বোক্ত, পৃ-৭৯।

৭৬। ড. মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, মুসলিম জাগরনে কয়েকজন কবি সাহিত্যিক, পৃ-৫২।

৭৭। পূর্বোক্ত, ৫২।

৭৮। ড. মুহাম্মদ আবদুল্লাহ সৈয়দ আহমদ খানর ধর্মীয় সামাজিক চিন্তাধারা, পৃ-৩৮৭।

৮৯। পূর্বোক্ত, পৃ-৩৮৭।

৮০। পূর্বোক্ত, পৃ-৩৮৮।

৮১। মাজমুআ লেকচার্স, পৃ-২৩২।

৮২। ইসমাইল পানিপথী, মাকালাত, ১৩ খন্ড, পৃ-৪২৭।

৮৩। পূর্বোক্ত, ১ম খন্ড, পৃ-১৬৮।

৮৪। পূর্বোক্ত, ১ম খন্ড, পৃ-১৬৭।

৮৫। রওশন মুসতাকবিল, ৩২০-৩২১।

৮৬। মাকালাত, ১৫ খন্ড, পৃ-৪৪।

৮৭। মাজমুআ লেকচার্স, পৃ-৩২৪।

৮৮। মাকালাত, ১৫ খন্ড, পৃ-৪৩।

৮৯। মাজমুআ লেকচার্স, পৃ-৩২৪।

৯০। বাংলা বিশ্বকোষ, ঢাকাঃ ১৯৭৬, ৪র্থ খন্ড, পৃ-৬৮২-৮৩।

৯১। ড. ওয়াকিল আহমেদ, পূর্বোক্ত, ২য় খন্ড, পৃ-৫

Dhaka University Institutional Repository

৯২। Shan Muhammad, Political biography of sir Syed Ahmed Khan, Meerut: Meenakshi Prakashani, 1969, P-171.

৯৩। ড. মুহাম্মদ আবদুল্লাহ স্যার সৈয়দ আহমদ খানর ধর্মীয় ও সামাজিক চিন্তাধারা পৃ-৪০৭-৪০৮।

৯৪। মোহাম্মদ মাহফুজ উল্লাহ, বুদ্ধির মুক্তি ওরেনেসাঁ আন্দোলন, বাংলাদেশ ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ১৯৮০, পৃ-৫৩।

৯৫। মোহাম্মদ মাহফুজ উল্লাহ, পূর্বোক্ত, পৃ-১৪১-১৪২।

৯৬। ড. মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, স্যার সৈয়দ আহমদ খানর ধর্মীয় ও সামাজিক চিন্তাধারা, পৃ-৪০৯-৪১১।

৯৭। ড. ওয়াকিল আহমদ, পূর্বোক্ত, ২য় খন্ড, পৃ-১৫৮।

৯৮। ড. ওয়াকিল আহমদ, পূর্বোক্ত, ২য় খন্ড, পৃ-১৬০-১৬১।

৯৯। ড. এনাম-উল-হক, পূর্বোক্ত, (ভূমিকা)।

১০০। বাংলা বিশ্বকোষ, ১ম খন্ড, ঢাকাঃ নওরোজ কিতাবিস্তান, ১৯৭২, পৃ-১৯৬।

১০১। ড. মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, স্যার সৈয়দ আহমদ খানর ধর্মীয় ও সামাজিক চিন্তাধারা, পৃ-৪১৩।

১০২। পূর্বোক্ত, পৃ-৪১৪-৪১৫।

১০৩। ড. এনাম-উল-হক, পূর্বোক্ত, পৃ-৩-৪।

১০৪। ড. মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, পূর্বোক্ত, পৃ-৪১৫।

১০৫। ড. ওয়াকিল আহম্মেদ, পূর্বোক্ত, ১ম খন্ড, পৃ-৫৮।

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম অধ্যায়

স্যার সৈয়দ আহমদ খানের সহকর্মীদের অবদান

১। মাওলানা আলতাফ হোসাইন হালী

(১৮৩৭-১৯১৪)

সূচনা ঃ

মাওলানা আলতাফ হোসাইন হালী ছিলেন স্যার সৈয়দের অন্যতম অকৃত্রিম বন্ধু ও ঘনিষ্ঠ সহযোগী। কারন তিনি স্যার সৈয়দ এবং তাঁর চিন্তা ও কর্মকে যেমন ভাবে লক্ষ্য করেছিলেন, অন্য কেউ তেমন ভাবে লক্ষ্য করেননি।[১] উর্দু সাহিত্যে রাজনৈতিক ভাবধারা প্রবর্তন করে আলতাফ হোসাইন হালী দেশবাসীর আযাদী পথকে সুগম করেন, এবং স্বজাতিকে উদাসীন তার ঘুম থেকে জাগ্রত করে কর্মের পথে পরিচালিত করেন।[২]

মোটকথা উনবিংশ শতাব্দীতে ভারতীয় মুসলমানদের জাতীয় জাগরনে যে সব মহামানবের অবদান রয়েছে তাদের মধ্যে হালী বিশেষ মর্যাদার অধিকারী। তাঁর রাজনীতি, সাহিত্যনীতি, সমাজ ও সংস্কার জাতিকে আলোক বর্তিকা দান করেছিল।[৩]

জন্ম ও বংশ পরিচয় ঃ

১৮৩৭ সালে হালী পানি পথের এক মধ্যবিত্ত পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পিতা-খাজা ইযদ বখশ্ একজন খোদাভীরু লোক ছিলেন।[৪] বংশ পরম্পরায় আনসার বংশের, সে বংশের সাথে তাঁর সম্পর্ক, যারা প্রায় সাত বৎসর যাবত (অর্থাৎ গিয়াস উদ্দীন বলবন এর সময় হতে) পানি পথে বসবাস করে আসছে।[৫]

শিক্ষা ও কর্মজীবনঃ

মাত্র ৯ বছর বয়সে তাঁর পিতা- মারা গেলে বড় ভাই খাজা ইমদাদ হুসাইন তাঁর শিক্ষাদীক্ষার ভার গ্রহণ করেন এবং নিজ গৃহে পবিত্র কোনআন শরীফ মুখস্ত করেন।[৬] অতঃপর সৈয়দ যাফর আলী এবং হাজী ইব্রাহীম হুসাইন আন সারীর কাছে প্রাথমিক পর্যায়ে আরবী ও ফার্সী শিক্ষা লাভ করেন।[৭] তিনি দর্শন ও যুক্তিবিদ্যা এবং হাদীস ও তাফসীরের কিছু কিছু গ্রন্থ অধ্যায়ন করেন। এছাড়া অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ব্যক্তিগত উৎসাহ, অনুশীলনু ও পরিশ্রমের মাধ্যমেই তিনি সাহিত্যে বিশেষ পারদর্শিতা অর্জনে সক্ষম হন।[৮]

Dhaka University Institutional Repository

১৮৫৬ সালে আলতাফ হোসাইন হালী অল্প বেতনে জেলা কালেক্টরীতে চাকরী লাভের মাধ্যমে কর্মজীবন শুরু করেন। কিন্তু ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহ শুরু হলে তিনি চাকরী ছেড়ে দিয়ে বাড়ীতে চলে আসেন। অতঃপর হালী ১৮৬৩ সালে উর্দু কবি নওয়াব মুস্তফা খাঁ শিফতার (১৮০৬-১৮৬৯) সাহচর্য লাভ করে তাঁর গৃহ শিক্ষক নিযুক্ত হন।[৯]

অবশেষে শিফতার মৃত্যুর পর (১৮৭২ খ্রীঃ) হালী পাঞ্জাবে লাহোর সরকারী বুক ডিপোতে চাকরী গ্রহন করেন। সেখানে ইংরেজী হতে উর্দুতে অনুদিত রচনার সংশোধনের দায়িত্ব তাঁর উপর ন্যস্ত হয়।[১০]

অতঃপর চার বছর লাহোরে থাকার পর ১৮৭৫ সালে হালী দিল্লীর এ্যাংলো এ্যারাবিক স্কুলের আরবীর প্রধান শিক্ষক নিযুক্ত হন এবং দীর্ঘ ১২ বছর এ পদে থাকার পর ১৮৮৯ সালে তিনি চাকরী থেকে অবসর গ্রহণ করে পুনরায় পানি পথে জ্ঞান চর্চায় আত্মনিয়োগ করেন।[১১]

রাজনীতি ক্ষেত্রে ঃ

হালীর রাজনীতি স্যার সৈয়দের মত হলেও তবে কিছুটা স্বতন্ত্র ধরনের ছিল। কেননা হালী স্যার সৈয়দের অনেক আগেই বুঝতে সক্ষম হন যে, বৃটিশ সরকার এদেশে বিভেদ সৃষ্টি করে শাসন করার পক্ষে অগ্রগামী। সুতরাং হালী স্যার সৈয়দ ও আবদুল লতিফের মত নিয়মতান্ত্রিক লড়াইয়ের পথ বেছে নেন।[১২] ভারতে আযাদী কামনা করে হালী বৃটিশদের গোলামীর বেড়াজাল থেকে বের হওয়ার জন্য ভারতবাসীকে অনুপ্রাণিত করেন। বরং তিনি আজীবন হিন্দু মুসলিম ঐক্য কামনা করেন এবং ধারনা করেন যে, বৃটিশ সরকার হিন্দু মুসলিম উভয়েরই দুশমন।[১৩]

কেননা তিনি স্বচক্ষে উপমহাদেশের রাজনীতিতে অনেক উত্থান-পতন দেখতে পান। এছাড়া ১৮৫৭ সালের যুদ্ধের পর মুসলিম সমাজের উপর যে ঝড় বয়ে তা দেখে তিনি দুঃখ বোধ করেন এবং জাতিকে এই গভীর সংকট থেকে উদ্ধার করা আপন দায়িত্ব ও কর্তব্য বলে মনে করেন।[১৪]

Dhaka University Institutional Repository

এ লক্ষে তিনি ১৮৭৯ খ্রীঃ স্যার সৈয়দের উৎসাহে "মুসদ্দাস" রচনা করে মুসলমানদের হারানো ঐতিহ্য ও গৌরবের চিত্র অত্যন্ত কার্যকর পন্থায় উপস্থাপন করেন। এমন কি এ রচনায় তিনি ভারতের মুসলমানদের অধঃপতন ও দুর্ভোগের দৃশ্য তুলে ধরেন।[১৫]

রোগ যেমন জীবনের এক সচরাচর ঘটনা তেমন জাতীয় অবস্থার ও ইতিহাসের ও এক পরিচিত ব্যাপার। সুতরাং হালী মনে করেন যে, মুসলমানের অতীত সমুজ্জল, তাই বর্তমানের দুর্দশা সর্ম্পকে সে যদি সচেতন হয়, তবে তার পুনরুজ্জীবন অসম্ভব ব্যাপার নয়। যেহেতু রোগীর চোখে স্বাস্থ্যের সুখ ও নির্মলতার চিত্র তুলে ধরতে হবে, তাহলেই সে বর্তমানের দুঃখ ও গ্লানি থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য আকুল হবে।[১৬]

সামাজিক ক্ষেত্রে ঃ

যেহেতু স্যার সৈয়দের রাজনৈতিক ও সামাজিক আন্দোলনের সহযোগী হয়েই হালী "মুসাদ্দাস" রচনা করেছিলেন। সেহেতু হালী মুসলমানকে তার বর্তমানে দুর্দশা সম্পর্কে অবহিত করতে চেয়েছিলেন প্রধানতঃ তার অতীত মাহাত্ম্যের কথা মনে করিয়ে দিয়ে।[১৭] কেননা হালী বুঝতে সক্ষম হন যে, মানুষ যখন মানুষের অধিকারকে ক্ষুন্ন করে তখনই সমাজে নেমে আসে দুর্দিন। আর সে দুর্দিন গোটা জাতির সমাজ জীবনেই বিস্তৃত হয়।[১৮]

এছাড়া হালী স্যার সৈয়দের "তাহযীবুল আখলাক" (تهذيب الاخلاق) পত্রিকার মাধ্যমে স্যার সৈয়দের মত জাতি ও সমাজ সংস্কারের জন্য চিন্তাভাবনা শুরু করেন। ফলে মুসলিম সমাজে তাঁর জাতীয় কাব্যটি অসাধারন অবদান রাখে।[১৯]

"মুনাজাত-এ-বেওয়াহ" কাব্যটি লিখে হালী তৎকালীন হিন্দু সমাজের এক জঘন্য কুপ্রথা বন্ধ করার চেষ্টা করেন। সমাজে তখন বিধবা বিবাহকে অবৈধ মনে করায় তিনি এটিকে একটি সামাজিক সমস্যা মনে করে সমাজে গঠন মূলক কাজ করেন।[২০]

Dhaka University Institutional Repository

শিক্ষা ক্ষেত্রে ঃ

মোটকথা, আলতাফ হোসাইন হালী ছিলেন স্যার সৈয়দের সংস্কার আন্দোলনের একজন প্রধান সহযোগী।[২১] কাজেই তিনি সাধারন শিক্ষার পাশে বিজ্ঞান ও কারিগরি শিক্ষাকে জাতীর জন্য অতি আবশ্যক বলে মনে করেন। কারন তিনি মনে করতেন, আর্থিক সমস্যার সার্বিক সমাধান নির্ভর করে বিভিন্ন কারিগরি শিক্ষাও শিল্পয়নের উপর। এছাড়া তিনি উনবিংশ শতাব্দীকে বিজ্ঞান ও কারিগরির যুগ বলে আখ্যায়িত করেন।[২২]

স্ত্রী জাতীর শিক্ষা ঃ

নারী জাতির শিক্ষার ব্যাপারে হালী প্রচলিত জনমতের পরোয়া না করে তাদের শিক্ষার জন্য কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করেন এবং শিক্ষা ক্ষেত্রে স্ত্রী জাতিকে পুরুষদের সম অধিকার দেয়ার পক্ষপাতী ছিলেন।[২৩] এরপর তিনি নারী জাতির সংস্কার এবং তাদের প্রাপ্য হক সম্বন্ধে ও অনেক কিছু লিখেছেন যা নারী জাতির জন্য কল্যানকর।[২৪]

ধর্মীয় সংস্কার ঃ

হালীর মতে, ইসলাম হলো একটি সহজ ধর্ম। তাই এর সাথে পার্থিব উন্নতির কোন বিরোধ নেই। বরং "আকায়েদ ও আখলাক" আবার ধর্ম দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। কিন্তু হযরত (সঃ) এর সব কাজকে আবার ধর্মের আলোকে দেখার কোন যুক্তিকতা নেই।[২৫]

এছাড়া হালীর গোটা সাহিত্য প্রচেষ্টাই রসূল (সাঃ) নির্মিত মিল্লাতকে স্ব-প্রকৃতিতে প্রতিষ্ঠিত করার প্রয়াস।[২৬]

স্যার সৈয়দের সাথে পরিচয় ঃ

মূলতঃ দিল্লীতে অবস্থান কালেই স্যার সৈয়দের সাথে আলতাফ হোসাইন হালীর পরিচয় হয় এবং স্যার সৈয়দের সাহর্চযই হালীর নতুন কাব্যোন্দোলনকে স্বার্থক করে তুলেছিল ও তাঁকে প্রর্দশন করেছিল তাঁর লক্ষ্যে। কেননা স্যার সৈয়দের অনুপ্রেরণা ও নিদের্শের অকৃতময় ফল হল তাঁর কালজয়ী বিখ্যাত "মুসাদ্দাস"।[২৭]

Dhaka University Institutional Repository

বস্তুত তাঁর এই রচনাটি ছিল আটাশ শত ছত্র সংবলিত একটি ষটপদী কবিতা বিশেষ। এর আসল নাম " মদ্দ ও জফর-ই-ইসলাম" অর্থাৎ (ইসলামের জোয়ার ভাটা) তবে ইহা সাধারনত মুসাদ্দাস-ই-হালী নামে পরিচিত।[২৮]

নোটকথা, হালীর বিখ্যাত রচনা "মুসাদ্দাস" সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে স্যার সৈয়দ আহমদ বলেন ঃ

> কেয়ামতের দিন আমাকে ইহকালীন সৎকাজ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে আমি বলব যে, হালীকে দিয়ে "মুসাদ্দাস" কাব্যটি লিখিয়েছিলাম। এছাড়া আর কিছুই করিনি।[২৯]

জাতীয়তাবাদ ঃ

হালী স্যার সৈয়দের মত "কওম" বলতে প্রথমে ধর্ম নির্বিশেষে সকল ভারতবাসীকে বুঝিয়েছেন। অর্থাৎ ধর্ম ভিত্তিক জাতীয়তাবাদ বিশ্বাস করতেন। কিন্তু পরবর্তীকালে "মুসাদ্দাস" রচনাতে "কওম" কে বিশ্বের সকল মুসলমানকে বুঝান।[৩০] বরং হালী মনে করেন জাতীয় অবনতির মূল কারন হলো আর্থিক অবনতি। তাই তিনি সাময়িকভাবে জাতিকে বৃটিশ সরকারের প্রতি আনুগত্য স্বীকার করতে বলেন এবং নিজেদেরকে প্রতিষ্ঠা লাভের পথে উৎসাহিত করেন।[৩১]

এছাড়া তিনি জাতীয় সংস্কৃতিকে ভিত্তি করে পাশ্চাত্য জীবনবোধে উদ্বুদ্ধ হওয়ার আহবান জানিয়ে ছিলেন। তাঁর মতে জীবনের বৈষয়িক উন্নতি কাম্যই নয়, তা জাতীয় চরিত্রের মহৎ অবদান ও বটে। সুতরাং পাশ্চাত্য সভ্যতা যে জীবন বাদকে আমাদের ঘরের আংগিনায় এনে হাজির করেছে, তাকে গ্রহণ করা আমাদের কর্তব্য।[৩২]

স্যার সৈয়দ ও হালীর চিন্তাধারার মধ্যে মিল ও অমিল ঃ

যেহেতু হালী ছিলেন স্যার সৈয়দের সংস্কার আন্দোলনের প্রধান সহযোগী। তাই বলে আবার সব ক্ষেত্রে তিনি স্যার সৈয়দের সাথে একমত হতে পারেন নি। যেমন স্যার সৈয়দের মতে, যুক্তিবাদ মুক্তবুদ্ধির প্রথম কথা। কিন্তু হালীর মতে, মুক্তবুদ্ধি প্রধান হলেও প্রধানতম না।[৩৩]

Dhaka University Institutional Repository

স্যার সৈয়দ ঘুমন্ত মুসলমানকে জাগিয়ে ইংরেজদের কর্মময় জীবনাদর্শে উৎসাহিত করেছিলন। অন্যদিকে হালী মুসলমানদেরকে তার বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে সজাগ করেন যা তার অতীত ইতিহাসের কথা মনে করিয়ে দিয়ে।[৩৪]

মোটকথা, স্যার সৈয়দের নীতি ছিল ইংরেজ ও মুসলমানদের মৈত্রী ও সৌহার্দ স্থাপনে চেষ্টা, আত্মনির্ভরশীলতার চেষ্টা ও আধুনিক শিক্ষাদীক্ষার প্রসার ঘটানো আবার অন্যদিকে হালী ও জাতিকে এ শিক্ষাই দিয়েছিলেন।[৩৫]

সাহিত্য রচনা ঃ

"হায়াতে-এ-জাবীদ" (১৯০১ খ্রীঃ) স্যার সৈয়দ আহমদের জীবনের এক পূর্ণ বিবরণী। এতে সৈয়দের জন্মকাল থেকে শুরু করে মৃত্যু কাল পর্যন্ত সকল ঘটনাই এমনি ভাবে সাজানো রয়েছে যে, জীবন্ত ও প্রাণবন্ত মনে হয়।[৩৬] এছাড়া এই গ্রন্থটি মুসলমানদের একশত বৎসরের সাংস্কৃতিক ইতিহাস। এমনকি এই গ্রন্থের মাধ্যমে তৎকালীন যুগের সামাজিক, শিক্ষা, ধর্ম, রাজনীতি ও ভাষা ইত্যাদি প্রশ্নের আলোচনা করা হয়েছে।[৩৭]

হালীর "মুকাদ্দামা-ই-শেরওশায়েরী" (مقدمه شر وشـــاعری) হচ্ছে উর্দুর সমালোচনা মূলক গ্রন্থের প্রথম পুস্তক। এরপর ১৮৯৭ খ্রীঃ রচিত "য়াদগার-ই-গালিব" অর্থাৎ গালিবের জীবনী এবং সাহিত্য কর্মের উপর সমালোচনা গ্রন্থ।[৩৮]

এমনিক উর্দু সাহিত্যে হালী বিশেষ সম্মানের অধিকারী। কারন হালীই প্রথম উর্দু সাহিত্যের দৃঢ় ও প্রকৃত অর্থবোধক গদ্যের প্রবর্তন করেন; যা প্রত্যেক প্রকারের বিষয়ের জন্য উপযুক্ত।[৩৯]

Dhaka University Institutional Repository

শেষ কথা ঃ

মহা-সাধনার পথে স্যার সৈয়দ আহমদের এমনি সহচর ও সহকর্মী লাভ-এও একটা অপ্রত্যাশিত ব্যাপার। যে কিনা তাঁকে মনে প্রাণে সাহায্য করেছে। সুতরাং স্যার সৈয়দের বুদ্ধ সহকর্মীদের তালিকায় আলতাফ হোসাইন এর নাম শীর্ষস্থান অধিকার করে আছে। কাজেই সাহিত্যের ও সমাজের একজন হিতৈষী ও অকপট সেবক হিসাবে হালী চিরকাল সবার শ্রদ্ধা আকর্ষন করবেন নিঃসন্দেহে। স্যার সৈয়দের এই একনিষ্ঠ সেবক ১৯১৪ সালের ৩১ ডিসেম্বর পানি পথে মৃত্যু বরণ করেন।

Dhaka University Institutional Repository

আল্লামা শিবলী নোমানী

(১৮৫৭-১৯১৪ খ্রিষ্টাব্দ)

সূচনা ঃ

১৮৫৭ সালের মাঝামাঝি সময় যখন আযাদী পাগল উপমহাদেশীয় সিপাহীরা আজমগড়ের যিলা বন্দীবাসের দরওয়াজয় হানা দিচ্ছিলো ঠিক সে যুগ সন্ধিক্ষণে আল্লাম শিবলী নোমানীর জন্ম।[৪০] তিনি ছিলেন একাধারে শ্রেষ্ঠ ধর্মবিদ, চিন্তানায়ক, দার্শনিক সংস্কারক, সমালোচক, জীবনীকার, প্রবন্ধকার, আযাদী আন্দোলনের অগ্রনায়ক, বিশিষ্ট ফার্সী ও উর্দু কবি এবং সর্যোপরি একজন গবেষক।[৪১] মূলতঃ স্যার সৈয়দের পর তিনিই প্রথম ব্যক্তি যিনি একনিষ্ঠভাবে নাস্তিক্যের ক্রমবর্ধমান ধারাকে রোধ করার চেষ্টা করেন।[৪২] এছাড়া তিনি ছিলেন আধুনিক যুগের একজন শ্রেষ্ঠ গদ্যকার।[৪৩]

জন্ম ও বংশ পরিচয় ঃ

আল্লামা শিবলী নোমানী ১৮৫৭ সালে আজমগড় জেলার অন্তর্গত বিনদাওল নামক স্থানে জন্ম গ্রহণ করেন।[৪৪] তাঁর পিতা হাবিবুল্লা রাওয়াত-বংশীয় মুসলিম রাজপুত ছিলেন। মাতার দিক দিয়ে শিবলী ইমাম আযম আবূ হানীফা আন-নুমানের বংশধর হিসাবে দাবী করেন।[৪৫] তাঁর পিতা হাবিবুল্লাহ একজন প্রসিদ্ধ উকিল, বড় জমিদার ও শিল্পপতি ছিলেন।[৪৬]

শিক্ষা ও কর্মজীবন ঃ

শিবলী নিজ বাড়ীতে মাওলানা শুকরুল্লাহর নিকট ফার্সী ও আরবীতে প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন। অতঃপর প্রখ্যাত ইসলামী দর্শনিক ও সাহিত্যিক মাওলানা মুহাম্মদ ফারুক চিড়িয়াকুটির নিকট গাজীপুরে আরবী সাহিত্য, যুক্তিবিদ্যা ও দর্শন অধ্যায়ন করেন।[৪৭] এরপর তিনি হাদীস ও ফিকাহ বিদ্যায় শিক্ষা সমাপ্ত করে বন্ধু বান্ধবের অনুরোধে আইন পরীক্ষায় পাশ করে কিছু দিন আজমগড়ে ওকালতি করেন।[৪৮]

শিবলী এই সময় একজন গোঁড়া ও শরীয়তপন্থী হানাফী মুসলিম ছিলেন ফলে তিনি ওহাবীদের উগ্র সংস্কারনীতির তীব্র বিরোধিতা করে তখন গোঁড়া মুসলিম সমাজে বেশ সুনাম অর্জন করেন।[৪৯]

Dhaka University Institutional Repository

অবশেষে আনুষ্ঠানিক শিক্ষা শেষে উনিশ বৎসর বয়সে হজ্জ পালন করে তিনি আমীনরুপে সরকারী চাকুরীতে নিয়োজিত ছিলেন এবং ১৮৮৩ হতে ১৮৯৮ খ্রীৎ পর্যন্ত আলীগড় কলেজে অধ্যাপনা করেন।[৫০]

স্যার সৈয়দের সাথে পরিচয় ঃ

শিবলী নোমানী যখন মক্কা শরীফ থেকে স্বদেশে প্রত্যার্বতন করেন তখন স্যার সৈয়দ আহমদ (১৮১৭-১৮৯৮ খ্রিঃ) মুসলিমদের শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে ঐতিহাসিক পরিবর্তন সাধনে আত্মনিয়োগ করেছেন এবং বিপুল উৎসাহ নিয়ে আলীগড় কলেজ প্রতিষ্ঠা করে মুসলিম ছাত্র সমাজকে ইংরেজী ভাষা ও পাশ্চাত্য শিক্ষা গ্রহণ করতে আগ্রহী করে তুলেন।[৫১]

এমতাবস্থায় শিবলী শরীয়তপন্থী আলিম হয়েও স্যার সৈয়দের যুগ বিপ্লবী সমাজ ও শিক্ষা সংস্কার তাকে আকৃষ্ট করে।[৫২] এখানে শিবলী, স্যার সৈয়দ ও হালী বিশেষ করে প্রফেসর আর্নল্ডের সংস্পর্শে এসে নতুন মানুষ রুপান্তরিত হয়ে যান। কেননা যে আগুন নিভৃতে জ্বলছিল তা এখন মশাল হয়ে দেখা দিলো।[৫৩]

শিক্ষা ক্ষেত্রে অবদান ঃ

শিবলী নোমানী মুসলিম জাতির শিক্ষকের ভূমিকায় অধিষ্ঠিত আলেম সম্প্রদায়কে স্বীয় দায়িত্ব পালনে ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেন।[৫৪] এলক্ষ্যে তিনি অধ্যাপক আরলন্ডের সাথে বিভিন্ন মুসলিম দেশ সফর করেন এবং বিভিন্ন দেশের শিক্ষানীতি ও শিক্ষা পদ্ধতি গভীর ভাবে পর্যবেক্ষণ করে তিনি প্রাচীন ও আধুনিক শিক্ষার সমন্বয় সাধন করেন।[৫৫] ফলে পরবর্তীর্তে তিনি ১৮৯৪ সালে মৌলবী আবদুল গফুরের চিন্তানুযায়ী ভারতে "নদওয়াতুল ওলামা" নামক একটি শিক্ষা সংস্কৃতি মুলক সংস্থা গঠন করেন।[৫৬]

শিক্ষার জন্য তাঁর দ্বিতীয় প্রতিষ্ঠান ছিল আজম গড়ের দারুল মুসন্নেফীস। অর্থাৎ একটি লেখক সংঘ এর মাধ্যমে অতীতের জ্ঞান ভান্ডারকে অর্গলমুক্ত করে মুসলমানকে বর্তমানের গুরুদায়িত্ব পালনে সক্ষম করে তোলাই শিবলীর উদ্দেশ্য ছিল।[৫৭]

Dhaka University Institutional Repository

অতঃপর শিবলীর "নদওয়াতুল ওলামা" এ সমিতির অধীনে, ১৮৯৮ সালে "দারুল উলুম" নামে একটি প্রাথকি পর্যায়ের মাদ্রাসা স্থাপিত হয়।[৫৮] মোটকথা শিবলী নোমানী এ প্রতিষ্ঠানে প্রাচীন ও আধুনিক শিক্ষার সমন্বয় সাধন ঘটিয়ে মুসলিম জাতির জন্য একটি স্বতন্ত্র শিক্ষা ব্যবস্থার ভিত্তি স্থাপন করেন।[৫৯] এমনকি তিনি ইংরেজীকে বাধ্যতামুলক পাঠ্যসূচীর অন্তভূর্ক্ত করেন।[৬০]

সামাজিক ক্ষেত্রে অবদান ঃ

শিবলী নোমানীর একমাত্র সাধনা ছিল উপমহাদেশীয় মুসলিম সমাজকে আধুনিক যুগের মর্মবাণীর সাথে পরিচিত করা এবং যুগ পরিবর্তনের সাথে নিজেদের ও দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন করে আঁধার পথের যাত্রী মুসলিম সমাজকে আলোকোজ্জল এক নয়াপথের সন্ধান দেওয়া।[৬১] তিনি "নাদওয়াতুল ওলমার" এক সভায় আলেম সমাজকে সর্তক করে বলেন, "দর্শকের আড়ালে কুফর ও নাস্তিক্যের যে ধারা ভারতের দিকে বয়ে আসছে, তা রোধ করা আলেম সমাজের কর্তব্য।

তিনি মুসমানদের বিপদগামী হতে দেননি। বরং তিনি সুষ্ঠ বুদ্ধি ভিত্তিক প্রমান দিয়ে, তাদের ধর্মীয় বিশ্বাস সমূহ সমাজে প্রতিষ্ঠিত করেন।[৬২]

অর্থাৎ তিনি যখন "ইলমুল কালাম ও আল কালাম" রচনায় ব্যস্ত ছিলেন, তখন সমাজে মুসলমানরা রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দিক থেকে পর্যুদস্ত ছিল।[৬৩] তাই একজন ধর্মবেত্তা ব্যক্তি হয়েও তিনি ধর্মের গোঁড়ামীকে মোটেই পছন্দ করেতেন না।[৬৪]

সাহিত্য রচনার ক্ষেত্রে ঃ

বিশ শতকের প্রথম দশকের এক বিরাট ব্যক্তিত্ব শিবলী নোমানী। কাজেই উর্দু সাহিত্যে তাঁর সমকক্ষ বহুমুখী প্রতিভা হয়তো আর দ্বিতীয়টি নেই।[৬৫] মোটকথা তিনি ছিলেন একজন খাঁটি সাহিত্য-সাধক পুরুষ। তাঁর সাহিত্য সাধনার শ্রেষ্ঠ পরিচয় পাওয়া যায় "সীরাতুননবী" (سيرات النبي) এবং শেরুল আজম (شعر العجم) রচনার মাধ্যমে।[৬৬]

Dhaka University Institutional Repository

আলীগড়ের পরিবেশে তিনি "মাছনাবী-ই-সুবহ-ই-উম্মীদ" (আমার উষা) ১৮৮৪ খ্রীঃ এবং "মুসলমানু কী গুযাশতাহ, তালীম" (মুসলমানদের অতীত শিক্ষা) ১৮৮৭ খ্রীৎ শীর্ষক প্রবন্ধ রচনা তখনকার সুধী সমাজে আলোড়ন সৃষ্ঠি করে।[৬৭] অতঃপর ১৯০১ খ্রীঃ শিবলী হায়দারবাদে আলগাযালী; আল কালাম, ইলমুল কালাম, (দর্শন বিষয়ক) সাওয়ানিহ মাওলানা রুম (জীবন চরিত্র) মুওয়াযানা-ই-আনীস ও দাবীর (সমালোচনা মূলক) শীর্ষক গ্রন্থ রচনা করেন।[৬৮]

রাজনৈতিক চিন্তারধারার ক্ষেত্রে অবদান ঃ

শিবলী মনে প্রাণে দেশ প্রেমিক ছিলেন। সাম্প্রদায়িকতার নাম মাত্র তাঁর মধ্যে ছিল না: রামবাবু সার্কাসিনা এ মন্তব্যটি যথার্থ ছিল। কেননা শিবলীর চিন্তাধারা ও নেতৃত্ব স্যার সৈয়দ আহমদের চেয়ে ও গভীর ও দূর প্রসারী হয়েছিল মুসলমানদের উপর।[৬৯]

শিবলী উপমহাদেশীয় রাজনীতির বেলায় কংগ্রেস সমর্থক ছিলেন। অর্থাৎ তিনি ধর্ম নির্বিশেষে দেশের সকল মানুষকে একটি জাতি হিসাবে মনে করতেন এবং হিন্দু মুসলিম ঐক্য ছিল তাঁর একমাত্র কামনা।[৭০] আর এ লক্ষ্যে তিনি ত্রুটিবিচ্যুতি ও নীতি পরিবর্তনের জন্য মুসলিম লীগ নেতাদের সমালোচনা করেন। কিন্তু তাঁর মিলনধর্মী রাজনীতির পক্ষপাতী হলে ও তিনি ধর্ম ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে মুসলমানদিগকে একটি স্বতন্ত্র্য জাতি হিসাবে গণ্য করেন নিঃসন্দেহে।[৭১] অথচ আর্ন্তজাতিক ক্ষেত্রে শিবলী ছিলেন জামাল উদ্দীন আফগানীর অনুসারী ও প্যান ইসলাম পন্থী।[৭২]

স্যার সৈয়দ ও শিবলী নোমানীর চিন্তার মধ্যে মিল ও অমিল ঃ

স্যার সৈয়দ আধুনিক পাশ্চাত্যের ছাঁচে ইসলামকে ঢালাই করতে চান, কিন্তু শিবলী ইসলামের পটভূমিতে আধুনিক পাশ্চাত্য জ্ঞান বিজ্ঞানকে চর্চা করতে নির্দেশ দেন। আসলে তিনি ইসলামকে আধুনিক পন্থায় শোধন ও পরিবর্তন করতে চাননি বরং তিনি ইসলামী তাহযীব ও তমদ্দুনের আলোকে উন্নয়ন ও পুনবাসন করার পক্ষপাতী ছিলেন।[৭৩]

Dhaka University Institutional Repository

স্যার সৈয়দ আহমদ ও মাওলানা হালীর মতে, আর্থিক অবনতির জন্য মুসলমানদের জীবনে দুর্গতি এসেছে। কিন্তু শিবলী ধারনা ছিলঃ মুসলমানদের জীবনে যে দুর্গতি এসেছে, তার জন্য ইসলামী আর্দশের প্রতি উদাসীনতাই দায়ী। তিনি তাঁর "ইসলাম অবনতির মূলকারণ" শীর্ষক কবিতায় এ কথা প্রমাণ করেন।[৭৪]

স্যার সৈয়দ পার্থিব উন্নতির উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। কিন্তু শিবলী দীন ও দুনিয়া উভয় দিকের উপর সমানভাবে গুরুত্ব অনুধাবন করে। এছাড়া যুক্তি ও পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের আলোকে কুরআন ও হাদীসের মর্ম অনুধাবন করার চেষ্টা করেন স্যার সৈয়দ । অন্যদিকে শিবলী পূর্ববর্তী ইমামদের ব্যাখ্যাকে ইউরোপের আধুনিক চিন্তাধারার সাথে সমন্বিত করার প্রয়াস পান।[৭৫]

শেষ কথা ঃ

উনিশ শতকের শেষার্ধে ভারতীয় মুসলমানদের পক্ষে একটা সংগ্রামের যুগ। সে যুগেই স্যার সৈয়দ আহমদের আর্বিভাবে এবং তাঁর সহকর্মীদের কল্যাণ সাধনা আজ পর্যন্ত আমাদের পথের ইঙ্গিত হয়ে আছে। আল্লামা শিবলী নোমানী ছিলেন স্যার সৈয়দ আহমদের একজন ঘনিষ্ঠ সহকর্মী। এই মহান মানীষী ১৯১৪ সালে প্রাণ ত্যাগ কবলে জাতির জীবনে অন্ধকার নেমে আসে।

Dhaka University Institutional Repository

৩। নবাব মুহ্‌সিনুল মুল্‌ক

১৮৩৭-১৯০৭

সূচনা ঃ

মুসলিম লীগের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা, জাতীয় জাগরণের অগ্রদূত, বিশিষ্ট রাজনীতিক নওয়াব মুহ্‌সিনুল মূলক মৌলবী সৈয়দ মাহদী আলী ছিলেন স্যার সৈয়দ আহমদের সর্ব প্রধান সহকর্মী।[৭৬] এছাড়া ও তিনি ছিলেন বৃটিশ আমলে ভারতীয় উপমহাদেশে মুসলিম রাজনীতির একনিষ্ঠ সংগঠকদের অন্যতম।[৭৭]

জন্ম ও বংশ পরিচয় ঃ

নওয়াব মুহ্‌সিনুল মূলক ১৮৩৭ খ্রীষ্টাব্দের ৯ ডিসেম্বর এটাওয়ার এক সম্ভ্রান্ত সৈয়দ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা- মীর যামেন আলী। তিনি শিয়া ধর্মালম্বী ছিলেন।[৭৮]

শিক্ষা ও কর্মজীবন ঃ

তিনি প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন তাঁর মাতামহ মাওলানা মাহমুদ আলীর নিকট। পরে এটা ওয়ায় আরবী ও ফার্সী ভাষার প্রাথমিক সাধারণ শিক্ষা লাভের পর ফফুন্দে মাওলানা ইনায়াত হাসায়নের নিকট অন্যান্য পাঠ্যপুস্তক অধ্যায়ন করেন।[৭৯] তিনি অত্যন্ত মেধাবী ও সুশিক্ষিত ছিলেন।[৮০] অতঃপর চাকুরী গ্রহণ করেন সর্বপ্রথম ক্লার্ক, তারপর হেডক্লার্ক ও পেশকার হিসাবে। এরপর ক্রমান্বয়ে সেরেশতাদারী, তহসীলদারী ও ডেপুটি কালেক্টরের পদ পর্যন্ত লাভ করেন।[৮১]

১৮০৬ সালে হায়দরাবাদের প্রধানমন্ত্রী সালারজং তাঁর কর্মদক্ষতায় মুগ্ধ হন। পরে তিনি রাজ্যের রাজস্ব সচিব (সেক্রেটারী) নিযুক্ত হন এবং ১৮৮৪ সালে অর্থ ও স্বরাষ্ট্র বিভাগের সেক্রেটারী পদে অধিষ্টিত হন।[৮২] ১৮৮৮ সালে তিনি সরকারী কাজে লন্ডন গমন করেন এবং সেখানে থাকাকালীন সময় স্যার লেপেল গ্রিফিনের বৃক্তৃতার প্রতিবাদে "Nineteenth Century" নামক পত্রিকায় একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন।[৮৩]

Dhaka University Institutional Repository

অতঃপর বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাঁর কৃতিত্বের প্রতিদান স্বরুপ তাঁকে মুন্সীর নওয়ার জং বাহাদুর? খেতাব ও নওয়াব মুহসনুদ দাওলাঃ মুহসিনুল মুলক খেতাব প্রদান করা হয়।[৮৪] অতঃপর ১৮৯৩ খ্রীঃ ১২ জুলাই তিনি হায়দরাবাদের চাকরী ছেড়ে স্যার সৈয়দের শিক্ষা ও জাতীয় কর্মকান্ডে অংশ গ্রহণ করেন।[৮৫] অবশেষে তিনি ১৮৯৮ খ্রীঃ স্যার সৈয়দ আহমদের স্থলে আলীগড় কলেজের সম্পাদক নিযুক্ত হন।[৮৬]

স্যার সৈয়দের সাথে পরিচয় ঃ

যদিও স্যার সৈয়দের সাথে মুহসিনুল মুলকের সম্পর্ক ছিল বহু দিনের। তথাপি ও তাদের মধ্যে বিরোধিতার মধ্য দিয়ে ১৮৬৩ সালে তাদের পারস্পারিক সাক্ষাত ঘটে। পরবর্তীকালে তাদের এই সম্পর্কটা এতই গভীর ছিল যে, স্যার সৈয়দ মুহসিনুল মুলককে উদ্দেশ্য করে বলতেন, "তোমার মাংস আমার মাংস, তোমার রক্ত আমার রক্ত।"[৮৭] তাই নওয়াব মুহসিনুল মুলককে স্যার সৈয়দের খলিফা বলা হয়ে থাকে।[৮৮]

রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ঃ

নওয়াব মুহসিনুল মুলককে স্যার সৈয়দের রাজনৈতিক আন্দোলনের অন্যতম প্রধান স্তম্ভ বলে মনে করা হতো।[৮৯] কারণ তাঁরই আয়োজিত ইতিহাস খ্যাত সিমলা ডেপুটেশন হলো সর্বপ্রথম রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান এবং এর মাধ্যমেই প্রতিষ্ঠিত হয় ধর্মভিত্তিক স্বতন্ত্র নির্বাচনের ভিত্তি।[৯০] কেননা তিনি স্যার সৈয়দের মত ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেসের সাথে ভিন্নমত পোষণ করেন ও মুসলমানদের রাজনৈতিক দাবি দাওয়া প্রশ্নে ১৯০৬ সালে সিমলায় মিলিত হয়ে মুসলমানদের জন্য পৃথক নির্বাচন ও অন্যান্য সুবিধা আদায়ের জন্য সেক্রেটারী নির্বাচিত হন এবং ঐ বৎসরই তিনি মুসলিম এডুকেশন্যাল কনফারেন্সর বিশেষ অধিবেশন আহবান করে "মুসলিম লীগের" ভিত্তি স্থাপন করেন।[৯১]

মূলতঃ সিমলা ডেপুটিশনের পর থেকেই মুহসিনুল মুলক একটি মুসলিম রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার জন্য উদ্যোগী হয়ে উঠেন। অর্থাৎ সিমলা ডেপুটিশনের স্থাপতি এবং মুসলিম লীগের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা রুপে তাঁর নাম মুসলিম ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখা থাকবে। নিঃসন্দেহে।[৯২]

Dhaka University Institutional Repository

শিক্ষা ক্ষেত্রে ঃ

নওয়াব মুহসিনুল মুলককে স্যার সৈয়দের জাতীয় ও শিক্ষা আন্দোলনের দক্ষিণ হস্ত ও একনিষ্ঠ সহচর বলা হয়। কারণ তিনি "সায়েন্টিফিক সোসাইটি" (১৮৬৪) এর সদস্য ছিলেন, "খাস্তগার তালীমে মুসলামান" কমিটি ও "খাযীনাতুল-বাদাআর" কমিটির উদ্যেমী সদস্য ছিলেন এবং মাদরাসাতুল উলুম, আলীগড় এর ট্রাস্টি ও তাহযীবুল আখলাক এর উৎসাহী লেখক ও ছিলেন।[৯৩] এছাড়া ও তিনি পুনরায় (১৮৯১ খ্রীঃ) আলীগড় ইন্সটিটিউট গেজেট, আলীগড়ে একটি মহিলা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত এবং মুসলিম এডুকেশন্যাল কনফারেন্সের অগ্রগতি সাধন করেন।[৯৪]

বরং তিনি স্যার সৈয়দের মৃত্যুর পর আলীগড় কলেজের নেতৃত্ব গ্রহণ করে কালেজের ছাত্র সংখ্যা তিনশ থেকে আটশতে উন্নতি করান। এছাড়া শুধু "তাহযীবুল আখলাক" পত্রিকার লেখার মাধ্যমেই নয় বরং স্যার সৈয়দের শিক্ষা কর্মসূচীর সমর্থক হিসাবে খ্যাতি অর্জন করেন।[৯৫]

সুতরাং নওয়াব মুহসিনুল মুলক প্রকৃতপক্ষে স্যার সৈয়দের কাঁধের জোয়াল নিজ কাঁধে তুলে নিয়েছেন এবং মুসলমানগণ ও পরবর্তী সময়ে ও তাকে সে দৃষ্টিতে দেখেছেন, যে ভাবে স্যার সৈয়দকে দেখতেন।[৯৬]

ধর্মীয় ভাবধারার ক্ষেত্রে ঃ

নওয়াব মুহসিনুল মুলক স্যার সৈয়দের ধর্মীয় চিন্তাধারার সাথে একমত হতে পারেনি। ফলে "তাবয়ীনুল কালাম" সম্পর্কে এবং পরবর্তীতে "তাফসীরুল কুরআন" সম্পর্কে তাঁর আপত্তি প্রকাশ করেন।[৯৭] কেননা আধুনিক শিক্ষায় সাধারণ শিক্ষিত শ্রেণীর মধ্যে অতি দ্রুত যে ধর্মীয় অসচেতনতা সৃষ্টি করেছিল, তিনি তা অপছন্দ করেন এবং ১৮৭০ সালে রচিত তাঁর "আয়াত-ই-বায়্যিনাত" গ্রন্থটি শিয়া সুন্নী সম্পর্কের ক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ।[৯৮]

যদিও স্যার সৈয়দের ধর্মীয় ভাধারায় ডক্টর নযীর আহমদ এবং আল্লামা শিবলী প্রত্যক্ষভাবে প্রভাবান্বিত হন। কিন্তি মুহসিনুল মুলকের মত এরা ও স্যার সৈয়দের চরম যুক্তিবাদকে সমর্থন করেননি।

Dhaka University Institutional Repository

ফলে পরবর্তীকালে ধর্মের যাবতীয় ব্যাখ্যায় নযীর আহমদ ও শিবলী ছাড়া ও সৈয়দ সুলায়মান নাদভী, মাওলানা আবুল কালাম আজাদ, ড. ইকবাল, সৈয়দ আবুল আলী মওদুদী নওয়াব মুহসিনুল মুলকের পথ অনুসরণ করে চলেন।[৯৯] কারণ ধর্মীয় সংস্কারের ব্যাপারে তিনি নমনীয় ও ভারসাম্যপূর্ণ ছিলেন। ফলে তখনকার আলেম সমাজ তাঁর প্রতি তেমন কঠোর মনোভাব পোষণ করতেন না।[১০০]

সমাজ জীবনে ইউরোপীয় সভ্যতা গ্রহণের ব্যাপারে ঃ

নওয়াব মুহসিনুল মুলক সমাজ জীবনে ইউরোপীয় সভ্যতা গ্রহণের ক্ষেত্রে স্যার সৈয়দের ন্যায় ততটা পছন্দ করতেন না। তবে জাতিকে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান ও পাশ্চাত্য জীবন ব্যবস্থায় গড়ে তোলার শিক্ষা দেন এবং পাশাপাশি পাশ্চাত্য তহযীব তমদ্দুনের খারাপ দিকগুলির প্রতি কঠোর দৃষ্টিপাত করেন। উপরন্ত তিনি আধুনিক শিক্ষার প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে বলেনঃ

> এটা সত্য যে, পাশ্চাত্য সভ্যতা, আধুনিক যুগ ও ইউরোপীয় সমাজ ব্যবস্থা আমাদের মুসলিম সমাজে একটি নতুন রোগের সৃষ্টি করেছে, যা সংস্কার, অজ্ঞতা ও অনুকরণের চাইতে ও বেশী ভায়াবহ। যদি ও ইংরেজী শিক্ষা, পাশ্চাত্য সভ্যতা আমাদের পূর্বে পার্থিব জীবনে মুসলমানদের খারাপ থাকলেও জ্ঞান-গরিমায় তাদের অবস্থা নিচু থাকলে ও তাদের ইসলাম তখনো মজবুত ছিল। এখন মুসলমানের যদি ইমাম আবু হানিফা (রাঃ) ও ইমাম শাফেয়ী (রাঃ) অনুসরণ ত্যাগ করে অন্ধ অনুকরণে ভারইন ও তাঁর "ব্রেড্‌ল" অনুসারী হয়, তাতে তাদের লাভ কি? [১০১]

সাহিত্য রচনায় ঃ

যদিও উর্দু সাহিত্যের ঐতিহাসিকগণ তাকে একজন লেখক হিসাবে হালী, শিবলী ও নযীর আহমদের পর্যায় ভুক্ত গণ্য করেন না। কিন্তু স্যার সৈয়দের আন্দোলনে তাঁর ব্যক্তিত্ব ও রচনাবলী তা উপেক্ষা করেনা। বরং তাঁর রাচনায় এ যুগের চারু-বিজ্ঞান এবং ইবনে খালদুনের "ইতিহাস দর্শন" ও ইমাম গাযালীর নৈতিক দর্শনকে "সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করেছেন।[১০২]

Dhaka University Institutional Repository

উর্দুর মর্যাদা সংরক্ষণ ঃ

যেহেতু "হিন্দী-উর্দু" বির্তক ভারতে অনেক পুরাতন বির্তক। ফলে যখন ১৯০০ সালে ১৮ এপ্রিল যুক্ত প্রদেশের গভর্ণর বিহারে উর্দুর পরিবর্তে হিন্দী ভাষা ভাষা চালূ করেন। তখন নওয়াব মুহসিনুল মুলক একটি উর্দু সংরক্ষণ সমিতি গঠন করে গভর্ণরের কর্মকান্ডের বিরুদ্ধে বিভিন্ন স্থানে প্রতিবাদ সভার আয়োজন করেন।[১০৩]

এরই ফলশ্রুতিতে তিনি ১৯০৩ সালে মুসলিম এডুকেশন্যাল কনফারেন্স এর শাখা স্বরুপ দিল্লীতে "আঞ্জুমান-এ-তরক্কী-এ-উর্দু" (অর্থাৎ উর্দু উন্নয়নে সমিতি) গঠন করেন এবং তাঁর প্রচেষ্টায় ১৯২০ সালে এই আঞ্জুমানটি একটি স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠানের রুপ ধারণ করে উর্দু ভাষা ও সাহিত্যে যে অবদান রাখে তা বলা বাহুল্য।[১০৪] এমনকি উর্দু প্রবন্ধ সাহিত্যে মুহসিনুল মুলক অনেক নতুন ভাবধারা আমদানী করেন এবং তাঁর রচনাবলীর বদৌলতে "তাহযীবুল আখলাক" পত্রিকাটি এবং স্যার সৈয়দের অগ্রযাত্রা অনেকটা খ্যাতি লাভ করেন। এজন্যই হালী তাঁর কবিতায় মুহসিনুল মুলকের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করে বলেনঃ

> মুহসিনুল মুলক ছিলেন জনগণের হিতাকাঙ্খী, মুসলিম জাতির দরদী। বিজয় লাভের পরেই তিনি জাতির রণাঙ্গণে বরণ করলেন শাহাদাত।[১০৫]

মিল ও অমিল ঃ

মৌলবী চেরাগ আলীর পর মুহসিনুল মুলকের সাথে স্যার সৈয়দের ধর্মীয় ভাবধারায় বেশী মিল পাওয়া যায়। তবে মুহসিনুল মুলক প্রকৃতি এবং বিবেকের উপর গুরুতব আরোপ করলে ও স্যার সৈয়দের মত প্রকৃতি এবং বিবেকের পুঁজারী ছিলেন না। আবার দেখা যায় যে, স্যার সৈয়দ 'তাফসীরুল কুরআন" লেখার সময় বেশী চরম পন্থী হয়ে উঠেন। অর্থাৎ তখন তিনি কেবল কুরআনকেই ইসলাম ধর্মের উৎস হিসাবে বর্ণনা করেন। কিন্তু অন্যদিকে মুহসিনুল মুলক হাদীসের বর্ণনাকে বাদ দেননি। বরং তিনি বর্ণনা ও বিবেকের মধ্যে সামঞ্জস্য ও সম্পর্ক সৃষ্টির চেষ্টা করেন।[১০৬]

Dhaka University Institutional Repository

অতএব জাতীয় জাগরণের অগ্রদূত নওয়াব মুহসিনুদ দৌলাহঃ মুহসিনুল মুলক মৌলবী সৈয়দ মাহদী আলী খাঁ মুনীর, নওয়াব জং ছিলেন স্যার সৈয়দের সর্ব প্রধান সহকর্মী। তিনি অত্যন্ত বুদ্ধিমান ও দূরদর্শী লোক ছিলেন। তিনি কংগ্রেসের নেতৃস্থানীয় মুসলমান সদস্যকে মোহামেডান এডুকেশন্যাল কনফারেন্সের প্রতি আকৃষ্ট করার অপ্রাণ চেষ্টা করেন। এই মহান মনীষী ১৯০৭ সালের ১৬ অক্টোবর সিমলায় ইনতেকাল করেন এবং স্যার সৈয়দের পাশে তাঁকে সমাহিত করা হয়।

Dhaka University Institutional Repository

৪। ডক্টর নযীর আহমেদ
(১৮৩৬-১৯১২)

সূচনা ঃ

পাক ভারতের মুসলমানরা যে সময় বিদেশী শাসকদের রোষানলে চরম দুরবস্থার মধ্যে জীবন যাপন করছিলেন এবং সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক জীবনে পদে পদে বিপর্যয়ের মুখে ঠিক সে সময়ই স্যার সৈয়দ আহমদের আবির্ভাব।[১০৭] এমন সময় মহা-সাধনার পথে স্যার সৈয়দ আহমদের বন্ধু, সহচর ও সহকর্মীদের তালিকায় ডক্টর নযীর আহমদের নাম শীর্ষস্থান অধিকার করে আছে।[১০৮]

জন্ম ও বংশ পরিচয় ঃ

মুসলিম রেনেসাঁর অন্যতম অগ্রনায়ক ও সমাজ সংস্কারক শাসসুল ওলামা খান বাহাদুর মৌলবী নযীর আহমদ ১৮৩৭ সালের ডিসেম্বর মাসে বিজনৌর জেলার রেহাড় নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন।[১০৯] তাঁর পিতার নাম মৌলবী সায়াদাত আলী। "হায়াতুন নাযীর" গ্রন্থের রচিয়তার মতে, দুঃখ দৈন্য ভরা পরিবারে নযীর আহমদের জন্ম।[১১০]

শিক্ষা ও কর্মজীবন ঃ

সে যুগের রীতি অনুসারে মৌলবী সাহেব তাঁর প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন মক্তবে।[১১১] অতঃপর তিনি দিল্লী কলেজ হতে আরবী, দর্শন ও গণিত শাস্ত্রে শিক্ষা লাভ করেন। এমনকি তদানীন্তন অধ্যক্ষ টেলারের উৎসাহে তিনি কতদিন ইংরেজী ও শিক্ষালাভ করেন ছিলেন।[১১২] এছাড়া তিনি আরবী ও ফার্সীর পন্ডিত ছিলেন।[১১৩] তদানীন্তন অন্যান্য শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের ন্যায় তাঁর ও চাকরী জীবন শুরু হয় পাঞ্জাবের কোন স্কুলের সাধারণ শিক্ষক হিসাবে কর্মজীবন শুরু করেন এবং মাদ্রাসা বিভাগের ডেপুটি ইনসপেক্টর পদে উন্নতি লাভ করেন।[১১৪]

তিনি বৃটিশ সরকারের অধীনে তহশীলদার এবং ডিপুটি কালেক্টর পদে চাকরী করেন। ডেপুটি কালেক্টর রুপে হায়দরাবাদে আগমণ করে তিনি আপন যোগ্যতা আর কর্মদক্ষতা গুণে প্রতিষ্ঠা অর্জন করেন এবং পদোন্নতির ধাপে ধাপে আরোহণ করে তিনি এখানে রেভিনিউ বোর্ডের মেম্বার নিযুক্ত হয়।[১১৫]

Dhaka University Institutional Repository

১৮৭৭ সালে তাঁর সুখ্যাতি ছড়িয়ে পড়লে তদানীন্তন প্রধান মন্ত্রী সলার জংতাকে ৮০০ টাকা বেতনে তথাকার "সেটেলমেন্টে" অফিসার নিযুক্ত করেন এবং জ্ঞান সাধনার স্বীকৃতি স্বরুপ ১৮৯৭ সালে সরকার তাকে "শামসুল ওলামা" খেতাবে ভূষিত করেন।[১১৬] এই মহান মনিষী অর্ধ শতাব্দী কাল ব্যস্ত জীবন যাপন করে ১৯১২ সালে ইহকাল ত্যাগ করেন। ইন্নালিল্লাহির ওইন্নালিহির রাজিউন।[১১৭]

ধর্মীয় ক্ষেত্রে ঃ

মৌলবী নযীর আমহদ ইসলামী মূল্যবোধের প্রতি অপরিসীম শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। কারণ তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, পতিত ও পরাভূত মুসলমানকে যদি মানুষের জীবন যাপন করতে হয়, তবে তাকে সর্বাগ্রে চরিত্র শক্তির অধিকারী হতে হবে, যে চরিত্র ইসলামী মূল্যবোধের প্রতিষ্ঠার দ্বারা সম্ভব।[১১৮] ধর্ম সংক্রান্ত গ্রন্থ সমূহের মধ্যে নবীর আহমদের কুরআনের অনুবাদ সুপ্রসিদ্ধ। কারণ এর ফলে তিনি মুসলিম জনগনের কাছে পরিচিত হন। এছাড়া তাঁর "অল-হকুক ও অল ফরায়িজ" গ্রন্থটি ব্যাপক। এতে তিনি আকায়েদ, আখলাক, মারিফত ও শরীঅতের বিধি বিধানের উপর ব্যাপক আলোচনা করেন।[১১৯]

এছাড়া আহমদ শাহ্ নামে ধর্মান্তরিত খৃষ্টান ধর্মযাজক কর্তৃক লিখিত "আম্মহাতুল মৌমিনীন" এর তীব্র প্রতিবাদ করেন নযীর আমহদ।[১২০] প্রতিবাদ স্বরুপ "উম্মাহাতুল উম্মাহ" নামক একটি গ্রন্থ রচনা করে নমীর আহমদ প্রমাণ করেন যে, নৈতিক প্রয়োজন হযরত (সাঃ) একাধিক বিবাহ করেছেন, কোন আয়েশের মনোবৃত্তি নিয়ে নয়। এছাড়া ও তাঁর অন্যান্য গ্রন্থ যেমনঃ- আদ্ইয়াতুল, কুরআন, দাহ্সূরাহ, মৎলবুল-কুরআন, জনগণের খেদমতের পর্যায়ভূক্ত।[১২১]

সাহিত্য রচনায় ঃ

ডক্টর নযীর আহমদ সাহিত্য রচনার মাধ্যমেই আদর্শ পরিবার ও আদর্শ সমাজের নকশা এঁকে ছেন। কেননা তাঁর রচনাবলীতে উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়াংশের পরিবর্তনশীল সামাজিক চিন্তাধারা ও মানসিকতার চিত্র ফুটে উঠেছে। কারণ তিনি ছিলেন একজন সমাজ সংস্কারক।[১২২]

Dhaka University Institutional Repository

মূলতঃ তিনি গল্প সৃষ্টির মাধ্যমে একটি বাস্তবধর্মী সমাজ গড়ে তোলার প্রয়াসপান। কেননা তাঁর সৃষ্ট গল্প গুলো আজও মুসলিম সমাজ সংস্কারের জন্য ফলপ্রসূ। অর্থাৎ আজ ও আমাদের সমাজের জন্য তাঁর "মেরআতুল আরুস" ও বানাতুল নাআশ" এর প্রয়োজন রয়েছে।[১২৩]

পরিচিত হয়েও তাঁর উপন্যাসের চরিত্রগুলি হয়ে উঠেছে রক্ত মাংস বিবর্জিত আদর্শের পুতুল মাত্র। তারা হাসতে জানে না, কাঁদতে জানে না। তেমনি তাঁর প্রথম উপন্যাস"মিরআতুল উরুস" (নববধুর আয়না)।[১২৪]

"মিরঅতুল উরুস" (১৮৬৯) এই গল্পের প্রধান চরিত্র "আসগরী" যান্ত্রিক ও প্রাণহীন বুদ্ধির একটি পুতুল। তাকে মানবী না বলে "ফেরেশতা" বললে অতুক্তি হয় না।[১২৫] ঘটনা ক্রমে এই পুস্তক খানি তদানীন্তন ডি, পি, আই, মিঃ কম্পসন সাহেবের হাতে পড়ে। তিনি গ্রন্থখানি অত্যন্ত পছন্দ করেন এবং তারই সুপারিশে সরকার গ্রন্থ রচয়িতাকে এক হাজার টাকা নগদ ও একটা ভালো ঘড়ি উপহারদেন।[১২৬]

"বানাতুন নায়াস" (সপ্তর্ষিমন্ডল) ১৮৭৩খ্রীঃ রচিত নযীর আহমদের এই গ্রন্থটি "মেরআতুল উরুস" গ্রন্থের পরিপুরক। তাঁর এই এগল্পের প্রধান চরিত্র "হোসনে আর" আকবরীর চেয়ে ও ডানপিটে।[১২৭] বলা বাহুল্য "মিরাঅতুল উরুস" আর "বানাতুননায়াস" স্ত্রী শিক্ষা সম্বন্ধে প্রথম উপন্যাস।[১২৮]

"তত্তবাতুন নসুহ" (১৮৭৭) মৌলবী সাহেবের সফলতম উপন্যাস। কারণ এই উপন্যাসের মাধ্যমে তিনি সন্তানদের নীতিবোধ ও ধর্ম প্রণেতার শিক্ষা দেন।[১২৯] এছাড়া এই এউপন্যাসে মৌলবী সাহেব ছোটবেলায় ছেলে মেয়েদের চরিত্র গঠনের প্রয়োজনীয় তুলে ধরেন এবং পিতা-মাতার প্রতি অবাধ্য হওয়ার কারনে জীবনে যে অবসাদ নেমে আসে তার ও তিনি প্রমাণ করেন।[১৩০]

Dhaka University Institutional Repository

"ইবনুল ওকত" (যুগ পুরুষ) গ্রন্থের মাধ্যমে মৌলবী নযীর আহমদ ভিত্তিহীন এবং দাসত্ব মনোভাবের চিত্র তুলে ধরেন। অর্থাৎ অন্ধ অনুকরণের বিরুদ্ধে এক জোরালো প্রতিবাদ। তিনি এই উপন্যাসের মাধ্যমে তৎকালীন যুগের রাজনৈতিক পরিস্থিতি, ইংরেজদের মনোবৃত্তি, প্রজাদের ধ্যান ধারণা অত্যন্ত নিখুত ভাবে ফুটিয়ে তোলেন।[১৩১] মোটকথা 'ইবনুল ওকত" এর বিষয়বস্তু হলো যে, পাশ্চাত্য সভ্যতা আমাদের বিপথে পরিচালিত করেছে।[১৩২]

"মুহসেনাত" (ফাসানায়ে মুবতালা) ভক্টর নযীর আহমদের এই উপন্যাসটি বহু বিবাহের দোষ ত্রুটি নিয়ে রচিত হয়েছে।[১৩৩] এটি একজন হতভাগ্য লোকের দাম্পত্য জীবন নিয়ে রচিত। অর্থাৎ গল্পের নায়ক মোবতালার দুই স্ত্রী ছিল। এক গাইয়ত বেগম, দুইঃ হারইয়ালী। এ কাহিনীর মাধ্যমে নযীর আহমদ একাধিক বিবাহের কি অশুভ পরিণতি তা তুলে ধরেন এবং গ্রন্থটির শুরুতে লিখেনঃ

মানুষের বুকে রয়েছে একটি অন্তর এটা দুজনকে ভাগ করে দেওয়া যায় না।[১৩৪]

ভক্টর নযীর আহমদের "আইয়ামা" মূলতঃ উপন্যাসের বিষয় হলো বিধবা বিবাহ।[১৩৫] তিনি এ গল্পের বিধবা জীবনের দুঃখ দুর্দশার চিত্র সমাজে তুলে ধরে বিধবা বিবাহকে শরীঅতের দৃষ্টিতে বৈধ বলে প্রমাণ করেন এবং গল্পের নায়িকা চরিত্র আযাদী বেগম তাঁরই সৃষ্টি।[১৩৬]

"রুইয়ায়ে সাদেকায়" নযীর আহমদের এই গ্রন্থে ধর্মবিশ্বাসের উপর গুরুত্ব আলোচিত হয়েছে।[১৩৭] লেখক এখানে সাদেকা স্বপ্নে যে দৈববাণী লাভ করে সেটি ফুটিয়ে তুলে ধরেছেন।[১৩৮]

উর্দু সাহিত্য রচনায় ঃ

উর্দু সাহিত্যে উপন্যাসের পটভূমি হলো সিপাহী বিদ্রোহ পরবর্তী থিতানো মধ্যবিত্ত সমাজ; যারা সকল মান-অভিমান পরিত্যাগ করে শেষ পর্যন্ত স্যার সৈয়দ ও হালীর পরামর্শে নতুন জীবন গঠনের তাগিদ অনুভব করেছিলেন তাদের মধ্যে নযীর আহমেদ ছিলেন অন্যতম।[১৩৯]

Dhaka University Institutional Repository

তিনি সর্ববাদী সম্মতভাবে উর্দু উপন্যাস সাহিত্যের অগ্রদূত। কারণ তাঁর সৃষ্ট কোন চরিত্র এমনি সজীব ও আকর্ষনীয় যে, তারা উর্দু সাহিত্য স্থায়ী আসন লাভ করে আছে। জাহেরদার বেগ, মানা আযমাত, আসগরী, আকবরী এ চরিত্রগুলি আমাদের জীবনে সজীব আর উর্দু সাহিত্যে বিখ্যাত।[১৪০]

উর্দু উপন্যাস হয়তো পাশ্চাত্য উপন্যাসের উৎকর্ষ অর্জন করেছে। কিন্তু মৌলবী সাহেব রচিত উপন্যাসের মনোহারিত্ব, ভাষা ও ষ্টাইলের লালিত্ব ও প্রাঞ্জুল্য আর বিশেষভাবে তাঁর অসাধারণ প্রাচ্য ভাবধারা, তাঁকে বৈশিষ্ট্যমন্ডিত করেছে। তাই তাঁকে বাদ দিয়ে উর্দু সাহিত্যের পূর্ণাঙ্গ আলোচনা অসম্ভব।[১৪১]

স্ত্রী শিক্ষা ও স্ত্রী জাগরণে ঃ

নারী জাতির শিক্ষা ও নারী জাগরনে নযীর আহমদের ভূমিকা অপরিসীম এবং সমাজে নারী জাতি তাঁর সৃষ্ট নারী চরিত্র আজগরী, সাদেকা ও আযাদী বেগমের ন্যায় নিজেদের গড়ে তোলার প্রয়াস পায়। এছাড়া অশিক্ষা, বহু বিবাহ বা বিধবার পুর্নবিবাহ সম্পর্কে নারীর চোখ খুলে দেয়।[১৪২] বরং নযীর আহমদের উপন্যাসগুলিতে নারী শিক্ষার উপর সে জোড় দেওয়া হয়েছে; তা তাঁর সমসাময়িক এবং পরবর্তী উর্দু আখ্যায়িক লেখকগণের উপর প্রভাব বিস্তার করেছিল।[১৪৩]

শেষ জীবনে নযীর আহমদ মুসলিম কৃষ্টি ও উর্দু সাহিত্য সম্বন্ধে অনেক সংস্কৃতিমূলক সমিতিতে বক্তৃতা বা আলোচনা করেছেন। যেমনঃ "আঞ্জুমানে হমায়েতুল- ইসলামে-লাহোর", মদরসাহে ত্বিব্বিবায়ে দিহলী এবং মোহামেডান এডুকেশন্যাল কন্‌ফারেন্স প্রভৃতির বার্ষিক অনুষ্ঠানে তাঁর ভাষণ উল্লেখযোগ্য।[১৪৪]

জাতীয় জাগরণে ঃ

ড. নযীর আহমদ স্যার সৈয়দের শিক্ষা ও সংস্কার আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন এবং আন্দোলনকে সাফল্য মন্ডিত করার "তাহযীবুল আখলাক" পত্রিকার অনেক প্রবন্ধ প্রকাশ করেন।[১৪৫]

Dhaka University Institutional Repository

কিন্তু এসত্তে ও তাঁর মনের গঠন হালী ও স্যার সৈয়দ থেকে বিলক্ষণ ছিল। তিনি চিন্তার দিক থেকে মসজিদী মোল্লার উর্ধ্বে উঠতে পারেননি। হালী যেখানে মনে করেছেন, মুসলমানের অবনতির মূলে রয়েছে ভাগ্যের প্রতি নরর্থক দৃষ্টি, সেখানে নযীর আহমদ উন্নতি অবনতিকে মানুষের সক্রিয় প্রয়াসের ফল বলে গণ্য করতে নারাজ।[১৪৬]

শেষ কথা উনিশ শতকের শেষার্ধে ভারতীয় মুসলমানদের পক্ষে ছিল একটা সংগ্রামের যুগ। সে যুগেই ড. নযীর আহমদ উন্নতির সাথে পদক্ষেপ গ্রহন করে; আলোক-রেখার চারদিক উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। সে রেখার ঔজ্জ্বল্য এখনও আলো বিতরণ করেছে। মরহুম স্যার সৈয়দ আহমদের আবির্ভাব এবং তাঁর সহকর্মীদের কল্যাণ সাধণা আজ পর্যন্ত আমাদের পথের ইঙ্গিত হয়ে আছে। তাই এই মহাসাধনার পথে স্যার সৈয়দের সহকর্মী হিসাবে ডক্টর নযীর আমহদের নাম শীর্ষস্থান দখল করে আছে।

Dhaka University Institutional Repository

টীকা ও তথ্য নির্দেশ

১। ড. মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ, স্যার সৈয়দ আহমদ খানের ধর্মীয় ও সামাজিক চিন্তাধারা, পৃ-৮।

২। ড. মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ, মুসলিম জাগরনে কয়েকজন কবি সাহিত্যিক, পৃ-৯৪

৩। পূর্বোক্ত, পৃ-৯৮।

৪। পূর্বোক্ত, পৃ-৯৫।

৫। ইসলামী বিশ্বকোষ, ২৫শ খন্ড, বাংলাদেশঃ ইসলামিয়ক ফাউন্ডেশন, ১৯৯৬, পৃ-৫১৭।

৬। ড. মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, মুসলিম জাগরনে, কয়েকজন কবি সাহিত্যিক, পৃ-৯৫।

৭। পূর্বোক্ত, পৃ-৯৫।

৮। ইসলামী বিশ্বকোষ, পুর্বোক্ত, পৃ-৫১৭।

৯। ডঃ মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, মুসলিম জাগরনে কয়েকজন কবি সাহিত্যিক, পৃ-৯৬।

১০। ইসলামী বিশ্বকোষ, পূর্বোক্ত, পৃ-৫১৭।

১১। ড. মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, পূবোর্ক্ত, ৯৭-৯৮।

১২। পূবোর্ক্ত, পৃ-১০৫-১০৬।

১৩। পূবোর্ক্ত, পৃ-১০৮-১১০।

১৪। পূর্বোক্ত, পৃ-৯৯-১০০।

১৫। ইসলামী বিশ্বকোষ, পূবোর্ক্ত, পৃ-৫১৭।

১৬। ড. মুহাম্মদ আবদুল্লাহ মুসলিম জাগবলে কয়েকজন কবি ও সাহিত্যিক, পৃ- ১০১-১০২।

১৭। পূবোর্ক্ত, পৃ-৩৪৬-৩৪৭।

১৮। পূবোর্ক্ত, পৃ-২৫১।

১৯। ড. মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, মুসলিম জাগরনে কয়েকজন, কবি, সাহিত্যিক, পূবোর্ক্ত, পৃ-১০১-১০২।

২০। পূবোর্ক্ত, পৃ-১১৫-১১৬।

২১। মুনিরউদ্দীন ইউসুফ, পূর্বোক্ত, পৃ-৩৫২।

২২। ড. মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, পূবোর্ক্ত, পৃ-১১২-১১৩।

Dhaka University Institutional Repository

২৩। পূর্বোক্ত, পৃ-১১৫।

২৪। ইসলামী বিশ্বকোষ, পূর্বোক্ত, পৃ-৫১৭-৫১৮।

২৫। ডঃ মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, পূর্বোক্ত, পৃ-১১৭।

২৬। মুনির উদ্দীন, পূর্বোক্ত, পৃ-৩৪৭।

২৭। পূর্বোক্ত, পৃ-২৫৪।

২৮। বাংলা বিশ্বকোষ, ৪র্থ খন্ড, ঢাকাঃ নওরোজ কিতাবিস্তান, ১৯৭৬, পৃ. ৯১

২৯। ড. মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, মুসলিম জাগরণে কয়েক জন কবি সাহিত্যিক, পৃ. ৯৭

৩০। ড. মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, পূর্বোক্ত, পৃ-১১০।

৩১। পূর্বোক্ত, পৃ-১০৫।

৩২। মুনির উদ্দীন ইউসুফ, পূর্বোক্ত, পৃ-২৫৭।

৩৩। পূর্বোক্ত, পৃ-৩৫২-৩৫৩।

৩৪। পূর্বোক্ত, পৃ-৩৪৬-৩৪৭।

৩৫। ডঃ মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, মুসলিম জাগরনের কয়েক জন কবি সাহিত্যিক, পৃ-১০৩।

৩৬। মুনির উদ্দীন ইউসুফ, পূর্বোক্ত, পৃ-৫৩৫।

৩৭। ইসলামী বিশ্বকোষ, পূর্বোক্ত, পৃ-৫১৭।

৩৮। পূর্বোক্ত, পৃ-৫১৭।

৩৯। পূর্বোক্ত, পৃ-৫১৮।

৪০। আবদুল মওদুদ, মুসলিম মনীষা, বাংলাদেশঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ২০০৪, পৃ-২৬০।

৪১। ইসলামী বিশ্বকোষ, ২য় খন্ড বাংলাদেশঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ১৯৮৭, পৃ-৩৮৩।

৪২। ডঃ মোহাম্মদ আবদুল্লাহ, অনুদিতঃ ইসলামী দশন, বাংলাদেশঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ১৯৮১, পৃ-৫।

৪৩। অধ্যাপক শ্রীহরেন্দ্র চন্দ্র পাল, উর্দু সাহিত্যের ইতিহাস, কলকাতাঃ সাদানি প্রেস, ১৯৬২।

৪৪। অনুদিত ড. মোহাম্মদ আবদুল্লাহ, পূর্বোক্ত, পৃ-১।

৪৫। আবদুল মওদুদ, পূর্বোক্ত, পৃ-২৬০।

৪৬। ইসলামী বিশ্বকোষ ২য় খন্ড, পৃ-৩৮৩।

Dhaka University Institutional Repository

৪৭। পূর্বোক্ত, পৃ-৩৮৩।

৪৮। পূর্বোক্ত, পৃ-৩৮৩।

৪৯। আবদুল মওদুদ, পূর্বোক্ত, পৃ-২৬১।

৫০। ইসলামী বিশ্বকোষ, পূর্বোক্ত, পৃ-৩৮৩।

৫১। আবদুল মওদুদ, পূর্বোক্ত, পৃ- ২৬১।

৫২। পূর্বোক্ত, পৃ-২৬১।

৫৩। মনির উদ্দীন ইউসুফ উর্দু সাহিত্যের ইতিহাস, ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৬৮, পৃ-৩৫৭।

৫৪। মুনির উদ্দীন ইউসুফ, পূর্বোক্ত, পৃ- ৩৫৯-৩৬০।

৫৫। ড. মুহাম্মদ আবদুল্লাহ মুসলিম জাগরনে কয়েকজন কবি ও সাহিত্যিক বাংলাদেশেঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ১৯৮০ পৃ-১২৯।

৫৬। পূর্বোক্ত, পৃ-১২৯।

৫৭। মুনির উদ্দীন ইউসুফ, পূর্বোক্ত, পৃ-৩৬০।

৫৮। ড. মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, পূর্বোক্ত, পৃ-১৩০

৫৯। পূর্বোক্ত, পৃ-১৩২।

৬০। ইসলামী বিশ্ব কোষ, পূর্বোক্ত, পৃ-৩৮৩।

৬১। আবদুল মওদুদ, পূর্বোক্ত, পৃ-২৬২।

৬২। অনুদিতঃ ড. আবদুল্লাহ, ইসলামী দর্শন, পৃ-৬।

৬৩। পূর্বোক্ত, পৃ-৭।

৬৪। অধ্যাপক শ্রী হরেন্দ্র চন্দ্রপাল, পূর্বোক্ত, পৃ-২৯০।

৬৫। মনির উদ্দিন ইউসুফ, পূর্বোক্ত, পৃ-৩৫৬।

৬৬। অধ্যাপক শ্রী হরেন্দ্রপাল, পূর্বোক্ত, পৃ-১২৯।

৬৭। ইসলামী বিশ্বকোষ, পূর্বোক্ত, পৃ-৩৮৩।

৬৮। পূর্বোক্ত, পৃ-৩৮৩।

৬৯। মনির উদ্দিন ইউসুফ, পূর্বোক্ত, পৃ-৩৬০।

৭০। ড. মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, মুসলিম জাগরনের কয়েকজন কবি সাহিত্যিক, পৃ-১৩৮।

Dhaka University Institutional Repository

৭১। ইসলামী বিশ্বকোষ, পূর্বোক্ত, পৃ-৩৮৪।

৭২। পূর্বোক্ত, পৃ-৩৮৩।

৭৩। আবদুল মওদুদ, পূর্বোক্ত, পৃ-২৬৩।

৭৪। ড. মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, পূর্বোক্ত, পৃ-১৩৯।

৭৫। ইসলামী বিশ্বকোষ, পূর্বোক্ত, পৃ-৩৮৪।

৭৬। ড. মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, মুসলিম জাগরনের কয়েকজন কবি সাহিত্যিক, পৃ-৬২।

৭৭। বাংলা বিশ্বকোষ, ৪র্থ খন্ড, ঢাকা ঃ নওরোজ কিতাবিস্থান, ১৯৭৬, পৃ-১০৭।

৭৮। ইসলামী বিশ্বকোষ, ২০শ খন্ড, বাংলাদেশ ঃ ইসলামী ফাউন্ডেশন, ১৯৯৬, পৃ-৫৪৯।

৭৯। পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৪৯।

৮০। বাংলা বিশ্বকোষ, পূর্বোক্ত, পৃ-১০৭।

৮১। ইসলামী বিশ্বকোষ, পূর্বোক্ত, পৃ-৫৪৯।

৮১। পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৪৯।

৮২। ড. মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৩।

৮৩। পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৪।

৮৪। ইসলামী বিশ্বকোষ, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৪৯।

৮৫। পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৪৯।

৮৬। বাংলা বিশ্বকোষ, পূর্বোক্ত, পৃ.১০৭।

৮৭। ড. মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৫।

৮৮। ইসলামী বিশ্বকোষ, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৪৯।

৮৯। পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৪৯।

৯০। ড. মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, পূর্বোক্ত, পৃ. ৭১-৭২।

৯১। ইসলামী বিশ্বকোষ, পৃ. ৫৫০।

৯২। ড. মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, পূর্বোক্ত, পৃ. ৭২-৭৪।

৯৩। ইসলামী বিশ্বকোষ, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৪৯।

Dhaka University Institutional Repository

৯৪। পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৫০।

৯৫। ড. এনাম-উল-হক, ভারতের মুসলমান ও স্বাধীনতা আন্দোলন, ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৯৩, পৃ. ৭৪।

৯৬। অনুদিতঃ ড. মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, স্যার সৈয়দ আহমদ খান, পৃ. ৩৫৪।

৯৭। ইসলামী বিশ্বকোষ, পৃ. ৫৪৯।

৯৮। পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৫০।

৯৯। ড. মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, পৃ. ৭৭-৭৮।

১০০। ইসলামী বিশ্বকোষ, পৃ. ৫৫০।

১০১। ড. মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, পূর্বোক্ত, পৃ- ৭৭।

১০২। ইসলামী বিশ্বকোষ, পৃ- ৫৫০-৫৫১।

১০৩। ড. এনাম-উল-হক, পূর্বোক্ত, পৃ- ৭৪-৭৫।

১০৪। ড. মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, পূর্বোক্ত, পৃ- ৭১।

১০৫। পূর্বোক্ত, পৃ- ৭৮-৭৯।

১০৬। পূর্বোক্ত, পৃ-৭৬।

১০৭। আলতাফ হোসাইন হালী, স্যার সৈয়দ আহমদ, অনুদিতঃ মাওলানা মজিবুর রহমান, ঢাকা ঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৬৮, পৃ- ভূমিকা।

১০৮। তাওবাতুন নাসুহ, ড. নযির আহম্মেদ, অনুদিতঃ আব্দুল হাফিজ, বাংলাদেশ ঃ ইসলামী ফাউন্ডেশন, ১৯৫৬, পৃ-৫।

১০৯। ড. মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, মুসলিম জাগরনে কয়েকজন কবি সাহিত্যিক, পৃ- ৮০।

১১০। অনুদিত ঃ আবদুল হাফিজ, পূর্বোক্ত, পৃ-৫।

১১১। পূর্বোক্ত, পৃ-৫।

১১২। অধ্যাপক শ্রী হরেন্দ্র চন্দ্র পাল, পূর্বোক্ত, ১৯৬২, পৃ-২৮৩।

১১৩। মুনির উদ্দিন ইউসুফ, পূর্বোক্ত, পৃ-৩৭৬।

১১৪। অধ্যাপক শ্রী হরেন্দ্র চন্দ্র পাল, পূর্বোক্ত, পৃ-২৮৩।

১১৫। অনুদিত ঃ আবদুল হাফিজ, পূর্বোক্ত, পৃ- ৫।

Dhaka University Institutional Repository

১১৬। ড. মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, পূর্বোক্ত, পৃ-৮২-৮৩।

১১৭। পূর্বোক্ত, পৃ-৮৩।

১১৮। মনির উদ্দিন ইউসুফ, পূর্বোক্ত, পৃ-৩৭৬-৩৭৭।

১১৯। ড. মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, পৃ-৮৪।

১২০। অধ্যাপক শ্রী হরেন্দ্র চন্দ্র পাল, পূর্বোক্ত, ১৯৬২, পৃ-২৮৪-২৮৫।

১২১। ড. মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, পূর্বোক্ত, পৃ- ৮৪।

১২২। পূর্বোক্ত, পৃ- ৮৫।

১২৩। পূর্বোক্ত, পৃ- ৮৬।

১২৪। মনির উদ্দিন ইউসুফ, পূর্বোক্ত, পৃ- ৩৭৬-৩৭৭।

১২৫। পূর্বোক্ত, পৃ- ৩৭৮।

১২৬। অনুদিত ঃ আবদুল হাফিজ, পূর্বোক্ত, পৃ-৬।

১২৭। ড. মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, পূর্বোক্ত, ৮৭।

১২৮। অনুদিত ঃ আবদুল হাফিজ, পূর্বোক্ত, পৃ-৭।

১২৯। পূর্বোক্ত, পৃ- ৭।

১৩০। ড. মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, পৃ- ৮৮-৮৯।

১৩১। পূর্বোক্ত, পৃ- ৮৯।

১৩২। অনুদিত ঃ আবদুল হাফিজ, পূর্বোক্ত, পৃ-৭।

১৩৩। পূর্বোক্ত, পৃ-৭।

১৩৪। ড. মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, পূর্বোক্ত, পৃ- ৯০।

১৩৫। অনুদিত ঃ আবদুল হাফিজ, পূর্বোক্ত, পৃ- ৭।

১৩৬। ড. মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, পূর্বোক্ত, পৃ- ৯০- ৯১।

১৩৭। অনুদিত ঃ আবদুল হাফিজ, পূর্বোক্ত, পৃ-৭।

১৩৮। ড. মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, পূর্বোক্ত, পৃ- ৯১।

Dhaka University Institutional Repository

১৩৯। মনির উদ্দিন ইউসুফ, পূর্বোক্ত, পৃ- ৩৭৬-৩৭৭।

১৪০। অনুদিত ঃ আবদুল হাফিজ, পূর্বোক্ত, পৃ- ৭।

১৪১। পূর্বোক্ত, পৃ- ৮।

১৪২। ড. মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, পূর্বোক্ত, পৃ-৯২।

১৪৩। মনির উদ্দিন ইউসুফ, পূর্বোক্ত, পৃ-৩৭৯- ৩৮০।

১৪৪। অধ্যাপক শ্রী হরেন্দ্র চন্দ্র পাল, পূর্বোক্ত, পৃ- ২৮৫।

১৪৫। ড. মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, পূর্বোক্ত, পৃ- ৯৩।

১৪৬। মনির উদ্দিন ইউসুফ, পূর্বোক্ত, পৃ- ৩৭৯-৩৮০।

Dhaka University Institutional Repository

উপসংহার

সম্রাট আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর হীনমন্যতায় আক্রান্ত, মুসলিম সমাজ প্রাচ্যের ইমাম শাহ ওয়ালী উল্লাহর সংস্কার মূলক কর্মসূচীর দ্বারা সম্বিত ফিরে পায়। কারন শাহ ওয়ালী উল্লাহ দিল্লীর অধিবাসী হওয়াতে তিনি অর্ধমৃত জাতির কানে জীবনের মহামন্ত্রটি শুনিয়ে দেওয়ার প্রয়োজন অনুভব করেন। তখনো ইংরেজ সরকার ভারতের রাজনৈতিক রংগমঞ্চে নায়কের ভূমিকা গ্রহন করেননি। সুতরাং শাহওয়ালি উল্লাহর সংস্কার প্রচেষ্টা রাজনীতি নয়, জ্ঞানের পথ ধরেই অগ্রসর হয়েছিল। পরবর্তীতে এটিকে কাজে লাগান শাহ সাহেবের সুযোগ্য পুত্র ও দিল্লীর মুহাদ্দেস শাহ আবদুল আজীজ। প্রথমতঃ তাঁর শিষ্য-সৈয়দ আহমদ শহীদের শিখ বিরোধী প্রত্যক্ষ সংগ্রামের মধ্য দিয়ে এটি আপাময় মুসলিম জনগনের সমর্থনে বৃটিশ বিরোধী এক রক্তক্ষয়ী আন্দোলনে পর্যবসিত হয়।

অপরদিকে সংস্কারের ঢেউ জাগে মুসলিম মানসে। তাঁরা আত্মসচেতন হয় এবং নিজেদের স্বকীয়তা অক্ষুন্ন রেখে ভারতবর্ষকে বৃটিশ শাসন মুক্ত করতে সচেষ্ট হয়। কিন্তু ইংরেজদের আধুনিক অস্ত্রের মুখে মুসলিম সমাজ পেরে উঠতে পারেনি। তাই মুসলমাদের প্রতি ইংরেজ প্রবর্তিত আধুনিক শিক্ষা ও সুযোগের সদ্ব্যবহার করার আহবান জানিয়ে এগিয়ে আসেন ভারতের স্যার সৈয়দ আহমদ খান। তাঁর এই আহবান ছিল ইংরেজদের আনুগত্যের আহবান। তিনি মুসলিম জাতিকে এক নতুন দিক দর্শন প্রদান করেন। এতে করে ধীরে ধীরে মুসলমানরা ইংরেজ বিরোধী আন্দোলন, পরবর্তীতে এভাবে ১৯৪০ সাল, ১৯৪৭ সাল এবং ১৯৭১ সালে স্বাধীন সর্বভৌম বাংলাদেশ রুপে আত্মপ্রকাশ করে।

মোটকথা জীবনের সকল দিকের উপরই স্যার সৈয়দ তাঁর দৃষ্টি নিক্ষেপ করে চলেন। যাতে করে জাতির সামাজিক, নৈতিক, ধর্মীয়, রাজনৈতিক ও সাহিত্যিক কোন দিক বাদ না পড়ে। ভারতীয় মুসলমানদের কে ইংরেজী শিক্ষার প্রতি আগ্রহ সৃষ্টির লক্ষ্যের যে আন্দোলন তিনি শুরু করেন তা ইতিহাসে "আলীগড় আন্দোলন" নামে পরিচিত। তাঁর এই আন্দোলনে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে পাশে এসে দাঁড়ালেন তাঁর একনিষ্ঠ সহকর্মী হিসাবে নওয়াব মুহসিনুল মূলক, শিবলী নোমানী, আলতাফ হোসাইন হালী, ড. নযীর আহমদ, ভীকারুল মূলক, মৌলবী চেরাগ আলী প্রমুখ বিশিষ্ট্য ব্যক্তিগণ।

Dhaka University Institutional Repository

পশ্চাৎপদ মুসলিম সমাজের ভাগ্যোন্নয়নে মুসলিম জাগরনের মহানায়ক স্যার সৈয়দ আহমদ কর্তৃক পরিচালিত সমাজ সংস্কার আন্দোলনই আলীগড় আন্দোলন নামে খ্যাত। ইংরেজদের রোষানল থেকে রক্ষা, মুসলমানদের ইংরেজী শিক্ষা ও পাশ্চাত্য সংস্কৃতি বর্জন, মুসলমানদের হতাশা, বঞ্চনা ও নির্যাতন, হিন্দুদের উন্নতি এবং মুসলমানদের সাংস্কৃতির অনগ্রসরতা ও গোঁড়ামির প্রেক্ষাপটে সৈয়দ আহমদ সমঝোতামূলক উপায়ে আলীগড় আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটান।

কেননা তৎকালীন ভারতীয় উপমহাদেশে ইসলাম ও মুসলিম জাতি সত্তার আলোর দিশারী হিসাবে আবির্ভাব ঘটে বিশ্ববিখ্যাত মনীষী স্যার সৈয়দ আহমদ খান ও তাঁর সহকর্মীদের। তাঁদের বিস্ময়কর প্রতিভা, সুমহান ব্যক্তিত্ব, সীমাহীন ত্যাগ ও সাধণা মুসলিম জাতিকে উজ্জীবিত করেছিল: দিয়েছিল মুক্তির দিশা। তাঁরা উপমহাদেশের মুসলমানদের দুরাবস্থা ও অধঃপতনের কারণ এবং তাঁদের প্রতিটি জীবন সমস্যার উপর গভীর ও মুজতাহিদের দৃষ্টি নিবদ্ধ অনুসন্ধানী করে এর থেকে মুক্তি ও উত্তরণের পথ নিদের্শ করেন। মুসলমানদের ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান, প্রত্যয়-বিশ্বাসে পুঞ্জীভূত বিদআত, শিরক ও নানাবিধ সামাজিক কুসংস্কারের রাস্তা থেকে তাদের পরিত্রাণের পথ প্রদর্শন করেন। নতুন আঙ্গিকে, চিন্তাকর্ষক পন্থায়, যুক্তি ও দর্শনের নিরিখে নবরুপে শরীয়তের বিধি-ব্যবস্থাকে মুসলিম জাতির সামনে উপস্থাপন করেন।

মোটকথা স্যার সৈয়দ আহমদ খান ও তাঁর সহকর্মীগণ ভারতীয় মুসলিম সমাজের অবনতিকে গভীরভাবে উপলব্ধি করে জাতির ধর্মীয়, সামাজিক, রাজনৈতিক ও শিক্ষা পুর্নজাগরনের জন্য এক সুদর প্রসারী সংস্কার কার্যক্রম শুরু করেন। এ লক্ষ্যে তাঁদের অক্লান্ত সাধনা যথার্থই ফলপ্রসু হয়েছিল। অদ্যাবধি যার প্রভাব উপমহাদেশের মুসলিম জাতি সত্তাকে উজ্জীবিত করে রেখেছে।

যেহেতু উনিশ শতকের শের্ষাধে ভারতের রাজনৈতিক অঙ্গনে স্যার সৈয়দ আহমদ ও তাঁর সহকর্মীদের আবির্ভাব ছিল মুসলমান সম্প্রদায়ের জন্য আশীর্বাদস্বরুপ। সেহেতু পিছিয়ে পড়া মুসলিম জাতিকে বহুবিধ অবদানের মাধ্যমে তাঁরা আলোর পথের সন্ধান দেন। তাই ভারতীয় মুসলমানদের পুর্নজাগরণে স্যার সৈয়দ আহমদ খান ও তাঁর সহকর্মীদের অবদান চিরস্মরনীয় হয়ে থাকবেন।

Dhaka University Institutional Repository

অন্যদিকে বাংলার মুসলমানদেরকে নব জাগরণে নওয়াব আবদুল লতিফের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এক্ষেত্রে তাঁর বড় অবদান ছিল ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে "মোহামেডান লিটারারী সোসাইটি" প্রতিষ্ঠা এবং বিভিন্ন সমাজ সেবা মুলক কাজের জন্য বাংলার মুসলিম সমাজের কাছে চিরস্মারনীয় হয়ে থাকবেন।

তা ছাড়াও সৈয়দ আমীর আলী দুর্দশায় নিপতিত বাংলার মুসলিম সমাজকে আলোর পথে টেনে তুলতে অগ্রনী ভুমিকা পালন করেন। তিনি ১৮৭৭ সালে "সেন্ট্রাল ন্যাশণাল মোহামেডান এসোসিয়েশন" নামে একটি সংগঠন গড়ে তোলেন। মোট কথা সৈয়দ আমীর আলীই প্রথম ব্যক্তি যিনি মুসলমুনদের এক জাতি হিসাবে আখ্যায়িত করেন।

উপরিউক্ত গবেষণাধর্মী আলোচনার প্রেক্ষিতে তাই একথা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, সত্যিকার অর্থেই স্যার সৈয়দ আহমদ খান ও তাঁর সহকর্মীগণ ছিলেন উপমহাদেশের মুসলিম সমাজের একজন দরদী অভিভাবক। মুসলমানদের পার্থিব ও পারলৌকিক কল্যাণ ও মুক্তিই তাদের জীবন-সাধণা। আত্মভোলা, অবহেলিত ও অধঃপতিত মুসলিম জাতির সার্বিক উন্নয়নে তাদের বহুমুখী অবদান তাদেরকে ইসলামের ইতিহাসে চিরঅমরত্ব দান করেছে।

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থপুঞ্জী

অতুল চন্দ্র রায় ও প্রণব কুমার চট্টপাধ্যায় ঃ ভারতের ইতিহাস, প্রাচীন যুগ, কলিকাতা ঃ ১৯৯৯

এ, কে, এম, শাহ নেওয়াজ ঃ ভারত উপমহাদেশের ইতিহাস, প্রাচীন যুগ ঢাকা ঃ ১৯৯৯

ড. নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য ঃ ভারত বর্ষের রাজনৈতিক ইতিহাস ১ম খন্ড কলিকাতা ঃ ১৯৭০

সুরজিত দাস গুপ্ত ঃ ভারত ও ইসলাম কলিকাতা ঃ ১৩৮৩

ড. মুশতাক আহমদ ঃ শায়খুল ইসলাম, সৈয়দ হোসাইন আহমদ মাদানী ইসলামিক ফাউন্ডেশন ঃ ২০০১

ড. আব্দুল করীম ঃ ভারতীয় উপমহাদেশে মুসলিম শাসন, ঢাকা ঃ ১৯৬৯

ড. সৈয়দ মাহমুদুল হাসান ঃ ইসলামের ইতিহাস, ঢাকা ঃ ১৯৮৫

" ঃ ভারত বর্ষের ইতিহাস, ২য় খন্ড, ঢাকা ঃ ১৯৯৪

ড. এ, কে, এম, আব্দুল আলীম ঃ ভারতে মুসলিম রাজত্বের ইতিহাস, ঢাকা ঃ ১৯৬৯

Dhaka University Institutional Repository

হাসান আলী চৌধুরী ঃ ভারতীয় উপমহাদেশের ইতিহাস,
ঢাকা ঃ
১৯৯৩

সৈয়দ হাশেমী ফরিদাবাদী ঃ তারিখ-এ মুসলমাননে পাকিস্তান ওয়া ভারত,
করাচী ঃ
১৯৫২

শেখ সৈয়দ লুৎফর রহমান ঃ ইসলাম, রাষ্ট্র ও সমাজ,
ঢাকা ঃ
১৯৭৭

শৈলেন্দ্র বিশ্বাস ঃ সংসদ বাঙ্গালা অভিধান,
কলিকাতা ঃ
১৯৯০

স্যার সৈয়দ আহমদ খান ঃ আসবাব-এ-বাগাওয়াত-এ-হিন্দু,
দিল্লী ঃ
১৯৯৫

ঃ মাকালাত,
লাহোর ঃ
" ১৯৬৫

" ঃ সীরাত-এ-ফরীদীয়্যাহ,
লাহোর ঃ
১৯৬৪

" ঃ তাফসীরুল কোরআন,
লাহোর ঃ
১৯৮২

" ঃ তাহযীবুল আখলাক, (পত্রিকা)
লাহোর ঃ
১৮৯৫

Dhaka University Institutional Repository

,,	ঃ মুকাম্মল মাজমুআ লেকচার্স, লাহোর ঃ ১৯০০
,,	ঃ মাকতুবাত, লাহোর ঃ ১৯৫৯
অধ্যাপক আব্দুল গফুর	ঃ আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রাম, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ঢাকা ঃ ১৯৮৭
আব্দুল মওদুদ	ঃ মুসলিম মনীষা, ঢাকা ঃ ১৯৭০
ড. মুহাম্মদ এনাম-উল-হক	ঃ ভারতের মুসলমান ও স্বাধীনতা আন্দোলন, ঢাকা ঃ ১৯৯৩
আকবর উদ্দীন	ঃ পথের দিশারী, ঢাকা ঃ ১৯৬৬
ড. মোহাম্মদ আব্দুর রহীম	ঃ বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস, ঢাকা ঃ ১৯৮৯
রইছ আহমদ জাফরী	ঃ বাহাদুর শাহ জাফর আওর উনকা আহদ, লাহোর ঃ ১৯৬৯
মোহম্মদ আব্দুল হাই ও সৈয়দ আলী হাসান	ঃ বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, ঢাকা ঃ ১৯৬৪

Dhaka University Institutional Repository

আনিসুজ্জামান	ঃ মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য, ঢাকা ঃ ১৯৬৪
অধ্যাপক ড. মিলন দত্ত ও অধ্যাপক অমলেন্দু মুখোপাধ্যায়	ঃ শব্দ শঞ্চায়িতা, কলিকাতা ঃ ১৯৯৫
শেখ মোহাম্মদ ইকরাম	ঃ আব-এ-কাউসার, দিল্লী ঃ ১৯৯১
আলতাফ হোসাইন হালী	ঃ হায়াত-এ-জাবীদ, লাহোর ঃ ১৯৫৭
,,	ঃ স্যার সৈয়দ আহমদ খান, অনুদিত ঃ মুজিবুর রহমান ঢাকা ঃ ১৯৬৮
ড. মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ	ঃ স্যার সৈয়দ আহমদ খার ধর্মীয় ও সামাজিক চিন্তাধারা, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ঢাকা ঃ ১৯৮২
	ঃ মুসলিম জাগরনে কয়েক জন কবি সহিত্যিক ইসলামিক ফাউন্ডেশন ১৯৮০
	ঃ বাংলাদেশের দশ দিশারী ইসলামিক ফাউন্ডেশন ১৯৯১
	ঃ মাওলানা ওবায়দুল্লাহ সহ্‌রাওয়ার্দী ইসলামিক ফাউন্ডেশন ১৯৮৪

Dhaka University Institutional Repository

ড. মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ	ঃ ভারতের বিদ্রোহের কারন (অনুদিত) ইসলামিক ফাউন্ডেশন ১৯৭০
	ঃ ইসলামি দর্শন ১ম ও দ্বিতীয় খন্ড (অনুদিত) ইসলামিক ফাউন্ডেশন
"	১৯৮১
আমেদ হাসান কাদেরী	ঃ দাস্তান-এ-তারীখ উর্দু, আগ্রাই ঃ ১৯৪১
ইসলামী বিশ্বকোষ	ঃ ৩য় খন্ড, ইসলামিক ফাউন্ডেশন ঢাকা ঃ
	ঃ ১৭শ খন্ড ইসলামিক ফাউন্ডেশন
"	
	ঃ ২৫শ খন্ড ইসলামিক ফাউন্ডেশন
"	১৯৯৬
	ঃ ২য় খন্ড ইসলামিক ফাউন্ডেশন
"	১৯৮৭
	ঃ ২০শ খন্ড ইসলামিক ফাউন্ডেশন
"	১৯৯৬
আহমদ সাইদ	ঃ হুসুলে পাকিস্তান, লাহোর ঃ ১৯৮৫
শেখ মোহাম্মদ একরাম	ঃ মওজ কাওছার, দিল্লী ঃ ১৯৯১

Dhaka University Institutional Repository

ইশতিয়াক হোসেন কুরাইশী ঃ বাবর-এ-আজীম পাক ওয়াহিদ কী মীল্লাত-এ-ইসলামিয়া, করাচী ঃ ১৯৬৭

সৈয়দ ইকবাল আজীম ঃ সাতসেতারে, ঢাকা ঃ

গোলাম সাকলাইন ঃ বাংলায় মরছিয়া সাহিত্যে, ঢাকা ঃ ১৯৬৯

আতিক আহমদ সিদ্দীকি ঃ স্যার সৈয়দ বায-এ-ইয়াফত, আলীগড় ঃ ১৯৯০

ড. শাহজাহান মুনির ঃ বাংলা সাহিত্যে বাঙ্গালী মুসলমানের চিন্তাধারা, ঢাকা ঃ ১৯৯৩

ভূদের মুখোপাধ্যায় ঃ ভূদেব রচনা সম্ভার, কলিকাতা ঃ ১৩৬৯

খুরশিদ আলম ঃ পরিবেশ সমাজ ও সামাজিক বিকাশ, ঢাকা ঃ ২০০১

সায়্যিদ আমির আলী ঃ দি স্পিরিট অব ইসলাম, অনুদিতঃ মোহাম্মদ দরবেশ আলী খান ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ঢাকা ঃ

শহীদ হোসাইন রায় খাকী ঃ স্যার সায়্যিত আওর ইসলঅহ এ মুআসারাহ লাহোর ঃ ১৯৬৩

সৈয়দ তুফায়েল আহমদ ঃ রওশন মুসতাকবিল, বাদায়ুন ঃ ১৯৩৮

Dhaka University Institutional Repository

আল কোরান — ঃ সুরাতুল মায়িদাহ
আয়াত ঃ ৫

মাওলানা মুহাম্মদ আকরাম খান — ঃ মুস্তফা চরিত্র
ঢাকা ঃ
১৯৯৮

ড. মুশতাক আহমদ — ঃ স্যার সৈয়দ কী নছরী খেদমত,
দিল্লী ঃ
১৯৯৩

মুহাম্মদ ওয়ালী উল্লাহ — ঃ আমাদের মুক্তির সংগ্রাম,
ঢাকা ঃ
১৯৭৮

মুহাম্মদ আব্দুর রহীম — ঃ ইসলামে জিহাদ,
ঢাকা ঃ
১৯৮৬

বাংলা বিশ্বকোষ — ঃ ৪র্থ খন্ড,
ঢাকা ঃ
১৯৭৬

" — ঃ ১ম খন্ড,
ঢাকা ঃ
১৯৭২

কে আলী — ঃ পাক ভারতের মুসলমানদের ইতিহাস
ঢাকা ঃ
১৯৬৯

" — ঃ ভারতীয় উপমহাদেশের ইতিহাস,
ঢাকা ঃ

" — ঃ ভারতের মুসলমান ও স্বাধীনতা আন্দোলন
ঢাকা ঃ
১৯৫৫

Dhaka University Institutional Repository

প্রফেসর মুহাম্মদ খলীলুল্লাহ ঃ তাহরীক এ পাকিস্তান,
করাচী ঃ
১৯৮২

প্রফেসর খলীফ আহমদ নেজামী ঃ স্যার সৈয়দ আওরা আলীগড় ও তাহরীক,
আলীগড় ঃ
১৯৮২

ড. আব্দুল হক ঃ স্যার সৈয় আহমদ খান হালাত ও আফকায়,
পাকিস্তান ঃ
১৯৫৯

ড. ওয়াকিল আহমেদ ঃ উনিশ শতকে বাঙ্গালী মুসলমানের চিন্তা
চেতনার ধারা, ১ম ও ২য় খন্ড
ঢাকা ঃ
১৯৮৩

এম, এ, রহিম ঃ বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস (১৭৫৭-১৯৪৭)
ঢাকা ঃ
১৯৭৬

সৈয়দ আবুল মকসুদ ঃ মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী,
ঢাকা ঃ
১৯৯৪

এম, রোজেন খান ঃ মুসলিম চিন্তাধারা স্বাধীনতা
অনুদিতঃ দরবেশ আলী খান
ঢাকা ঃ
১৯৭৭

ডাঃ হান্টার ঃ ইন্ডিয়ান মুসলমান;
অনুদিতঃ আবদুল মওদুদ
ঢাকা ঃ
১৯৭৪

মোহাম্মদ মাহফুজ উল্লাহ ঃ বুদ্ধির মুক্তি ও রেনেসাঁ আন্দোলন
ইসলামিক ফাউন্ডেশন
ঢাকা ঃ
১৯৮০

Dhaka University Institutional Repository

মুনির উদ্দীন ইউসুফ ঃ উর্দু সাহিত্যের ইতিহাস
ঢাকা ঃ
১৯৬৮

অধ্যাপক শ্রীহরেন্দ্র চন্দ্র পাল ঃ উর্দু সাহিত্যের ইতিহাস,
কলিকাতা ঃ
১৯৬২

ড. নযীর আহমেদ ঃ তাওবাতুল নাসুহ
অনুদিতঃ আযদুল হাফিজ ইসলামিক ফাউন্ডেশন,
ঢাকা ঃ
১৯৫৬

কাজী নজরুল ইসলাম ঃ সওগাত, (পত্রিকা)
১০ম সংখ্যা

T. P. Sinha : Systematic History of India
Patna :
1944

H. H. Dod well : The cambridge History of India,
Vol,
IV New Delhi :
1963

The New Encylopeadia Britanica : Vol, 9

Mahmud Hossain : A History of the freedom
Movement Vol. 11
Karachi :
1957

G.F.I. Graham : The life and work of Sayed Ahmed
Khan,
Delhi :
1974

Dhaka University Institutional Repository

Ram Babu Sakse-na	: A History of urdu Literature.
Firoz Uddin	: Urdu Encyclopadia, Lahore : 1968
Sayed Ahmed Khan Bahadow C.S.I.	: Series of eassay on the life of Mohammad Eassay on the pedigree of Mohammad Delhi: 1981
Haroon Khan Sherwani	: Studies in Muslim Political through and Admitration.
The New Encyclopedia Britannica Micropedia Vol,1	: Chicago: Vol. 1, 1984
Shan Muhammad	: Political biography of sir Syed Ahmed Khan, Meerut : 1969